ইতিবৃত্তিকা

(আধুনিক যুগ — অষ্টম শ্রেণী)



বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Written according to the New Syllabus Published by the Board of Secondary Education West Bengal on Histoty for Class VIII for all Schools of West Bengal.
[Vide Circuler No. Syll/81/2 Dated 30.4.81 and Vide Circuler No. Syll/82/5 Dated 21.9.82]

ইতিবৃত্তিকা

সভ্যতার ইতিহাস ঃ আধুনিক যুগ

অষ্টম শ্রেণীর জন্য

RECOMMENDED
Vide Submission No. syll/H/VIII/81/65
Dated 10..12.81 *And Vide revised Circuler No. Syll/82/5 Dated 21.9.82 By The W. B. B. S. E.*

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দি পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস্ • পুস্তক প্রকাশক
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৮১
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৩
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৪
পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ১৯৮৭

প্রচ্ছদ ঃ সঞ্জয় দে
অন্যান্য চিত্র ঃ রঞ্জিত দাস

মূল্য ঃ পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
৩৪ নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

ভূমিকা

মধ্য যুগের সভ্যতার ইতিহাস ছিল সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য। তখনকার সমাজ ধর্ম অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মোটামুটি পরিচয় হয়েছে। এখন আধুনিক যুগের সূত্রপাত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাস পড়তে হবে। এত দীর্ঘকাল ধরে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য জগতে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তন ও উন্নতির কাহিনী আয়ত্ত করা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু তথ্য ও ঘটনাবহুল ইতিহাস পড়া ও পড়ানো নতুন পাঠক্রমের লক্ষ্য নয়। রাষ্ট্র-ইতিহাসে যা ঘটেছে তার চেয়ে ভিতর থেকে যে সব সামাজিক শক্তি কাজ করেছে ও বিভিন্ন দেশে সমাজ ও অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছে, সেগুলি প্রথমে স্বতন্ত্র, শেষে সমগ্রভাবে, উপস্থাপিত করাই তার আসল উদ্দেশ্য।

প্রথম চারটি অধ্যায় সেই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রেনেশাঁস, ভৌগোলিক আবিষ্কার, পাশ্চাত্ত্য জগতের সীমাবিস্তার, রিফর্মেশন প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরস্পর অন্বিত। এইগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পরিষ্কার হওয়া দরকার মনে করে বিষয়গুলির কিছু বিশদ ব্যাখ্যা ও পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। উনিশ বিশ শতকে এবং হাল আমলেও যত গণজাগরণ আন্দোলন ও বিপ্লব ঘটেছে, স্থানীয় পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে যে মিল আছে এবং সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যে ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার উপরই বেশি নজর দিতে হয়েছে। তাই বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি যথাসাধ্য সরলভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছি।

বিনা ভূগোলে ইতিহাস পড়া ও বোঝা যায় না। সেইজন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে আরও বেশি মানচিত্র দেওয়া হয়েছে এবং য়ুরোপের ও ভারতের শিল্পকলার অনেকগুলি বিখ্যাত নমুনা একত্রভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে চাক্ষুষ পরিচয়ের অভাব মেটে। অনুশীলনীতে প্রচুর বিষয়গত প্রশ্নাবলী যুক্ত হয়েছে, যাঁরা পড়াবেন তাঁদের সুবিধার জন্য। আর শিক্ষার্থীরা যাতে খুঁটিয়ে পড়ে ও বুঝতে শেখে, সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি বইয়ের ত্রুটি ও অভাবগুলির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহলে উপকৃত হব। প্রকাশকের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। কুমারী অঙ্কিতার পরোক্ষ সাহায্য এখানে স্বীকার করে রাখি।

বালিগঞ্জ **বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**

সূচীপত্র

দুই একটি ছবি ও মানচিত্র ব্যবহারের জন্য আমরা এন. সি. আর. টির কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করি।

১ আধুনিক যুগ



মধ্যযুগে সামন্ত প্রথাকে ভিত্তি করে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল এবং পাঁচ ছয় শো বছর ধরে পাশ্চাত্য য়ুরোপের আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে চালিত করেছিল, তার বিশেষ লক্ষণগুলির কথা তোমরা পড়ে এসেছ, যেমন ম্যানর প্রথা, জমির ভোগদখল পাওয়া, সেবা ও সাহায্য দান ইত্যাদি। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে সম্পর্ক কায়েম হয়েছিল, তা প্রধানতঃ জমি নিয়ে একটি আর্থিক সম্পর্ক। এখন এই রকম বিধি ব্যবস্থা বেশিদিন চলল না। সামন্ত-সমাজের রীতি-নীতিগুলির পরিবর্তন হতে থাকল এবং কালক্রমে ঐ সমাজের অবসান পরিস্ফুট হয়ে উঠল। যে সব কারণে মধ্যযুগের শেষ পর্বে এই সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙ্গন শুরু হল সেগুলি জমি-চাষের ব্যবস্থা, ভূমিদাস প্রথা, ধর্মযুদ্ধের ফলাফল, নগরের উৎপত্তি শ্রমিক-কারিগর জাতীয় শ্রেণীর উদ্ভব এবং বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের প্রসার—এই বিষয়গুলি মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ফিউডাল বা সামন্ত যুগের ভূমিদাস প্রথা ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল দেখা গেল, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই বেশি। জমিদার ও ভূস্বামীরা বুঝল জন-মজুর ভাড়া করে কাজ করালে বেশি কাজ পাওয়া যায়। তাই আগে যে সব 'ভিলান' ও 'সার্ফ' বেগার খাটত, এখন তাদের কাছ থেকে নগদ খাজনা নিয়ে তাদের রেহাই দেওয়া শুরু হল। অনেক ভিলান স্বাধীনতা কিনে নিল আর যাদের সংস্থান ছিল না, তারা শহর অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে নতুন জীবিকা খুঁজে নিল। এইভাবে জমির মালিকরা চাপে পড়ে ও আয়বৃদ্ধির জন্য সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ মেনে নিতে বাধ্য হল। চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি 'ব্ল্যাক ডেথ' নামে ভীষণ মহামারীর ফলে চাষী-শ্রমিকদের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক কমে গিয়েছিল। তাই পনেরো শতকের গোড়ায় সামন্ত যুগের ভূমি ও কৃষি ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ল। তা হলে বলা যায় যে আধুনিক যুগের সূচনায় পুরানো সমাজের কাঠামো ও অর্থব্যবস্থার চেহারা বদলে যাচ্ছিল।

মধ্য যুগের শেষ ভাগেই এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। পনেরো-ষোল শতকে য়ুরোপের অনেক রাজ্যেই, বিশেষ করে ইংলণ্ডে জমি-চাষ, ফসল বাড়ানো, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি নিয়ে ভাবনা শুরু হয়েছিল। জমি ও চাষী, উভয়কেই রক্ষা করা দরকার। আধুনিক যুগের আরম্ভে এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন প্রচুর অর্থ আসে, তেমনি তার ঝুঁকিও অনেক। শাসকদল, অভিজাত সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র জমিদার—এদের অনেকেরই নজর ছিল ফসল ও খাজনা বৃদ্ধির দিকে। যারা নতুন বড়লোক হয়ে উঠছে, তারাও তাদের অর্থের অনেক অংশ জমিতে লগ্নী করা নিরাপদ মনে করল। বেশি ফসলে বেশি লাভ। অতএব চাষের ও চাষীর উন্নতি

করতে হলে চাষ-পদ্ধতি ও ফসলের রকমফের করা প্রয়োজন। ভালো ও বেশি ফসল তুলতে হলে ক্ষেতকে আরও গভীর করে খুঁড়ে চাষ করা দরকার। তার জন্য পুরানো কাঠের লাঙ্গলের বদলে দরকার আরও মজবুত লোহার তৈরি লাঙ্গলের ফলা, জমিতে নিয়মিত সেচ ও সার দেওয়া এবং ভালোভাবে বীজ বপন করা। শস্য ফলনের উন্নতির জন্য এখন নতুন ধরনের লাঙলের ব্যবহার শুরু হল, যদিও গ্রামের কৃষকরা পুরানো রীতিতে জমি চাষ ছাড়তে চায় নি।

যাই হোক, ধীরে ধীরে পরিবর্তন চলতে থাকল এবং কয়েকটি নতুন ফসলের চাষও শুরু হল। এর মধ্যে আমদানি আলু ও তামাকই প্রধান। ক্রমে, য়ুরোপের এই দুটি মুখ্য ফসল হয়ে দাঁড়াল। বিদেশ থেকে আনা ; বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি সবজির চাষ আরম্ভ হল। তার মধ্যে টোমাটো, গাজর ও কপি এবং সবচেয়ে মূল্যবান শস্য ভুট্টার নাম করতে হবে। এ ছাড়া চেরি ও পীচ ফল এবং চিনির জন্য আখ ও মেপ্‌লের চাষ বেশ লাভজনক হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে য়ুরোপে টাকার বাজার তৈরি হওয়াতে শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দিল। জমিদার ও বণিকদল যে সব শস্যের বাজারে চাহিদা আছে সেই ফসল উৎপাদনের দিকে আকৃষ্ট হল। এতে দুনো লাভ— খাজনা বৃদ্ধি এবং কেনা বেচায় লাভ। কাজেই, ক্ষেতের উর্বরতা বাড়ানো, চাষের জমির সীমানা বাড়িয়ে নেওয়া এবং উন্নত রীতিতে কৃষির কাজ চালানো, এই তিনটি এক সূত্রে বাঁধা।

শ্রমশিল্পেও নতুন ব্যবস্থার আয়োজন শুরু হল। একটি শিল্পের কথা বলি, এটি পশম। পশমের ব্যবসা মধ্যযুগেও ছিল কিন্তু এর চাহিদা ইংলণ্ডে এবং হল্যাণ্ডের ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে ক্রমেই বাড়ছিল। জমির মালিকরা দেখল, মেষপালন ও বেশি পশম উৎপাদন করলে আরও অনেক লাভ। ক্ষেত-জমি বাদ দিয়েও যা উদ্বৃত্ত থাকত, বিশেষ করে পতিত ও মেঠো জমি, সেগুলিকে ঘিরে ফেলে এখন বেশি করে মেষপালন শুরু হল। ভেড়ার লোম থেকে পশম সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীরা সেই পশম সূক্ষ্ম করে চিরে নিয়ে বয়নের উপযোগী করে তুলতে লাগল। ফলে উন্নত পদ্ধতিতে তৈরি পশমের রপ্তানি অনেক বেড়ে গেল। তাতে দেশের সম্পদও বৃদ্ধি পেল। এই সূত্রে একটি বিশেষ শ্রমশিল্পের কথা বলতে হবে। খনি থেকে তামা, রুপা ও টিন প্রভৃতি ধাতু পদার্থ বার করে এনে ধাতব দ্রব্য উৎপাদন এবং ঢালাই কাজ একটি বড় শিল্পে পরিণত হল।

এতদিন ধরে মধ্যযুগে যে সব ছোট ছোট শিল্পের চলন ছিল, সেগুলি ছিল গিলড-পরিচালিত স্থানীয় শিল্প। রপ্তানির জন্য যথেষ্ট উৎপাদন হত না। পনেরো শতকের পর থেকে ঐ সব শিল্প কারখানায় অনেক বেকার শ্রমিক কারিগর এসে জুটলে সম্মিলিত উদ্যমে উৎপাদনের মাত্রা যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি মাল দেশের অন্যান্য জায়গায় এবং বিদেশেও চালান যেতে লাগল। ফলে আরও কিছু কিছু নতুন শিল্প কারখানায় নানা রকম জিনিস তৈরি হতে থাকল।

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযানের ফলে নতুন দেশগুলির সঙ্গে সওদাগরী শুরু হয়। দেশবিদেশের রপ্তানি-আমদানি কারবারে আরও বেশি নৌকা-জাহাজের প্রয়োজন দেখা দিল। নৌকা ও জাহাজ-নির্মাণ মধ্যযুগেও হত, কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এটি এক

বড় শিল্প হয়ে দাঁড়াল। তাই কাঠের কারবার ফেঁপে ওঠায় বিভিন্ন জায়গায় কারখানা গড়ে উঠল। কাষ্ঠশিল্পের সঙ্গে প্রস্তর-শিল্পেরও যথেষ্ট প্রসার হতে লাগল। কারণ নব যুগের আরম্ভে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি দেখা গেল ইটালি, হল্যাণ্ড জার্মানি ও ফ্রান্সে। বাষ্পশক্তির আবিষ্কারের আগে, অর্থাৎ পনেরো থেকে সতেরো শতকের মধ্যে এই যে সব পরিবর্তন ঘটছিল, য়ুরোপের অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থার ওপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে এবং ক্রমেই বাড়তে থাকে।

এক নজরে

* মধ্যযুগে সামন্ত প্রথাকে ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা পাঁচ ছয়শ' বছর ধরে পাশ্চাত্য য়ুরোপের আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে চালিত করেছিল।
* সামন্ত-যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক গ্রাম নির্ভর সরল অর্থনীতি।
* মধ্যযুগের শেষ পর্বে জমিচাষের ব্যবস্থা, ভূমিদাস প্রথা, ধর্ম যুদ্ধের ফলাফল, নগরের উৎপত্তি, শ্রমিক-কারিগর জাতীয় শ্রেণীর উদ্ভব এবং বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের প্রসার ইত্যাদি কারণে মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন শুরু হয়।
* পনর শতকের গোড়ায় সামন্ত যুগের ভূমি ও কৃষিব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে।
* আধুনিক যুগের সূচনায় শস্য ফলনের উন্নতির জন্য নতুন ধরনের লোহার লাঙলের প্রবর্তন, উন্নতমানের বীজের ব্যবহার এবং নিয়মিত সেচ ও সারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।
* মধ্যযুগের শেষ দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, ফলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়তে থাকে। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার আবিষ্কারের ফলে পূর্ববর্তী উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। তার পরিবর্তে নতুন শিল্প কারখানায় নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে থাকে।
* ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযানের ফলে নতুন নতুন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হয়। দেশবিদেশে আমদানি-রপ্তানি কারবারের জন্য নৌকো-জাহাজের প্রয়োজনের তাগিদে বৃহদায়তনের জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়ে ওঠে। কাষ্ঠ-শিল্পেরও প্রসার ঘটে। বাষ্পশক্তির আবিষ্কার ও য়ুরোপের অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।
* এভাবে য়ুরোপের কৃষি, শিল্প সব কিছুরই এক আমূল পরিবর্তন ঘটল। জন্ম নিল আধুনিক যুগ। মানুষের জীবনযাত্রার মান, রুচিজ্ঞান, অর্থ-নৈতিক অবস্থা, এমনকি, ক্রমে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ও এক ব্যাপক রূপান্তর ঘটল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কিসের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ?
* চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চাষী শ্রমিকের সংখ্যা কি কারণে কমে গিয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

* বিদেশ থেকে আনা কোন দুটি ফসলের চাষ য়ুরোপে শুরু হয় ?
* কয়েকটি আমদানিকৃত ফল ও সব্জির নাম বল।
* জমি চাষে উন্নতির জন্য কি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় ?
* পশমের চাহিদা য়ুরোপের কোন কোন দেশে প্রসার লাভ করেছিল ?
* মেষ-পালনের জন্য জমি কি ভাবে পাওয়া গেল ?
* পশম শিল্পে উন্নতির কারণ কি ?
* জাহাজ তৈরির কারখানা কেন বাড়তে লাগল ?
* উৎপাদন বাড়িয়ে সমাজের কোন কোন শ্রেণী লাভবান হলো ?
* আধুনিক যুগের সূচনায় কোন কোন ধাতুশিল্পের প্রচলন হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। আধুনিক যুগের শুরুতে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল ?
২। য়ুরোপের অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিভাবে সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়েছিল ?
৩। আধুনিক যুগে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এসেছিল ?
৪। সামন্তযুগের শেষ দিকে কেন শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল ?
৫। জমির মালিকরা সামন্তপ্রথার লোপ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল কেন ?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। মধ্যযুগের শেষভাগে সামন্ত সমাজের পরিবর্তন ও ক্রমিক অবসান কিভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল সংক্ষেপে বিবৃত কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) জমির মালিকরা চাপে পড়ে ও আয়বৃদ্ধির জন্য —— উচ্ছেদ মেনে নিতে বাধ্য হলো।

(খ) য়ুরোপে টাকার বাজার তৈরি হওয়াতে —— ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা গেল।

(গ) খনি থেকে তামা, রূপা ও টিন প্রভৃতি ধাতু পদার্থ বার করে এনে —— দ্রব্য উৎপাদন এবং —— কাজ একটি বড় শিল্পে পরিণত হলো।

(ঘ) ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযানের ফলে নতুন দেশগুলির সঙ্গে —— শুরু হলো।

(ঙ) নব যুগের আরম্ভে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি দেখা গেল ঃ ——, ——, —— ও ——।



রেনেশাঁসের প্রকৃতি ঃ য়ুয়োপে রেনেশাঁস অর্থাৎ নবজীবনের আবির্ভাব একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘকাল, প্রায় তিনশো বছর ধরে, য়ুরোপে জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চিত হতে থাকে। মধ্যযুগের ইতিহাসে বিদ্যাপীঠগুলির প্রতিষ্ঠা, 'স্কুল মেন'দের জ্ঞান-চর্চা, শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলন, ধর্ম ও দর্শন চর্চায় বুদ্ধি ও বিচারের প্রতি আগ্রহ, শিল্পকলার বিকাশ, এই বিষয়গুলি পড়েছ। তাই পনেরো শতকে য়ুয়োপের বিভিন্ন দেশে জীবনের নানা দিকে, জ্ঞানে ও কর্মে যে আশ্চর্য উদ্দীপনা দেখা দেয়, তা বিভিন্ন ঘটনা নয়। নবজীবনের স্পন্দন বারো তেরো শতকেই ধরা যায়। রোজার বেকন, পিটার অ্যাবেলার্দ, অ্যালবার্ট ম্যাগনাস, টমাস অ্যাকুইনাস প্রভৃতি জ্ঞানী মনীষীরা রেনেশাঁসের সূচনা করে যান।

পনেরো-ষোল শতকে য়ুরোপে এই রেনেশাঁস বা নবজীবনের সূত্রপাত থেকে আধুনিক কালের আরম্ভ বলা হয়। এতদিন ধরে যা চলে এসেছে—যে সব বিশ্বাস ও সংস্কার তৈরি হয়েছে, প্রাচীন বই ও ধর্মপুস্তকে যা লেখা আছে, তা প্রামাণ্য বা শেষ কথা বলে না মেনে, এখন থেকে মানুষের মনে জিজ্ঞাসা জাগল, কারণ সন্ধানের প্রবৃত্তি ও কৌতূহল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পোপের কর্তৃত্ব, ধর্মের দাসত্ব, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠে স্বর্গপ্রাপ্তি, এই সব পরলোক-চিন্তায় মানুষের মন আর আবদ্ধ থাকতে চাইল না। "কেমন করে হল", তার চেয়ে "কেন এটা হয়"? এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে উঠল। জানবার ইচ্ছা, অফুরন্ত আগ্রহই ছিল প্রাচীন যুগে গ্রীকদের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে য়ুরোপের পণ্ডিতরা সেকালের গ্রীস ও রোমের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি যখন আবিষ্কার করে পড়তে লাগলেন, তখন তাঁরা যেন নতুন এক জগতের পরিচয় পেলেন যা বহুদিন লুপ্ত হয়েছিল। তাঁরা বুঝলেন, চোখের সামনে জগতে যা কিছু হচ্ছে ও ঘটছে, তা সবই প্রাকৃতিক শক্তির ফল। ঈশ্বরের কর্ম বা দৈব ব্যাপার নয়।

য়ুরোপে আধুনিক যুগের সূচনা-কাল মোটামুটিভাবে ১৪৫৩ সাল বলে ধরা হয়। কারণ ঐ বছরে ওসমানী তুর্কীদের আক্রমণে কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপ্‌লের পতন এবং পূর্ব খৃস্টান সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটে। যখন ১৪৫৩ খৃস্টাব্দে সম্রাট জ্যাস্টিনিয়নের তৈরি সেই বিশ্ববিখ্যাত সেণ্ট সোফিয়া গির্জার গম্বুজে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড়ল, তখন তার ফলাফল বিচার করে পণ্ডিতরা মনে করলেন, এইখানে মধ্যযুগের অবসান আর বর্তমান যুগের সূত্রপাত হল। সেদিক থেকে কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপ্‌লের পতন সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ য়ুরোপে পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপ মুসলিম অধিকারে এলে গ্রীক পণ্ডিতরা সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁদের অমূল্য গ্রন্থ,

পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি নিয়ে দলে দলে ইটালিতে চলে আসতে লাগলেন। গ্রীক পাণ্ডিত্যের ঘাঁটি সরে এল পশ্চিম দিকে।

ইটালির বড় বড় নগর রাষ্ট্রে ঐ সব পণ্ডিত ছড়িয়ে বসলেন। সেখানকার অভিজাত শাসকরা তাঁদের সমাদর করে আশ্রয় দিলেন। এ বিষয়ে ফ্লোরেন্স শহরের রাষ্ট্রনেতারা, যেমন মেদিচি বংশের কোসিমো ও লোরেঞ্জো তাঁদের বিশেষ অনুগ্রহ দেখালেন এবং নানাভাবে দেশের সাহিত্য ও শিল্প-কলাকে পুষ্ট করতে লাগলেন। এঁদের কথা পরে আবার বলা হবে। এখন জ্ঞানী-গুণীদের মনে যে সংশয় ও সমালোচনার ভাব জাগল, তাতে ক্যাথলিক চার্চ অর্থাৎ পোপের অধীন সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠান প্রমাদ গুণল। বুঝল, সব কিছু খুঁজে দেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে কোন তত্ত্বকে যাচাই করার আগ্রহ মানুষের মনকে মুক্ত ও স্বাধীন করে তুলবে, যা এতদিন প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। এবং তার ফলে বিরুদ্ধতা জন্মাবে ধর্মের মাহাত্ম্য বজায় থাকবে না। শেষ কালে তাই হল। পণ্ডিতদের নতুন ধ্যান ধারণা মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে, ছাপাখানার দৌলতে ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষদের চোখ খুলে দিল। তারা প্রথম দেখল, প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসের অন্ধকারে তারা কিভাবে এতকাল ডুবে ছিল।

ইটালিতে রেনেশাঁসের জন্ম ঃ এই পুনরুজ্জীবনের প্রথম প্রকাশ দেখা গেল ইটালিতে। কেন ইটালিতেই তা সম্ভব হল, তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ ইটালিতে সামন্ত প্রথা তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এখানে রোমান সভ্যতার ঐতিহ্যস্মৃতি অনেক দিন ধরে বলবৎ ছিল। তা ছাড়া, ভূমধ্যসাগরের মধ্যস্থলে অবস্থানের ফলে ইটালি এক বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং বাইজ্যানটাইন ও আরব সংস্কৃতির নিকট সংস্পর্শে আসে। সেইজন্য প্রাচীন গ্রীকদের পুঁথিপত্র ও জ্ঞানীদের সমাবেশ হয়েছিল ইটালিতেই প্রথম। এর ওপর নানাবিধ পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা বিস্তারের ফলে ইটালির স্বয়ং-শাসিত নগররাষ্ট্রগুলি খুব সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই নতুন পাওয়া অর্থ সম্পদের অনেক অংশ সাহিত্য, চারুশিল্প ও কারুশিল্পের উন্নতির পিছনে নিযুক্ত হয়। প্রাচীন গ্রীস দেশে আথেন্স প্রভৃতি স্বাধীন নগররাষ্ট্রের মত ইটালিতে ভিনিস মিলান জেনোয়া ফ্লোরেন্স প্রভৃতি স্বাধীন শহরগুলিতে রাজনৈতিক সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

ইটালিতে রেনেশাঁসের প্রথম আবির্ভাব হলেও তা ক্রমশ আল্‌পস পর্বত পার হয়ে উত্তর য়ুরোপে জার্মানি হল্যাণ্ড বেলজিয়ম ও ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখানকার শিল্পকলা, সাহিত্য ও চিন্তাকে খুব প্রভাবিত করে। দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্রান্স, পোর্তুগাল ও স্পেন দেশেও রেনেশাঁসের প্রকাশ হয়। তাই বলা যায়, পশ্চিম য়ুরোপের প্রতিটি দেশ রেনেশাঁসে অংশগ্রহণ করে। অবশ্য ইটালিই ছিল উৎস।

[এক] **হিউম্যানিজম ঃঃ সাহিত্যের নবজন্ম ঃঃ** এ যুগে বুদ্ধি ও ভাব জগতে যে উজ্জীবন দেখা যায়, তা রেনেশাঁসের একটি প্রধান মৌলিক লক্ষণ। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যকে **ক্লাসিক্‌স** বলা হয় এবং সেই ক্লাসিকাল সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা বেড়ে যায় পনেরো শতকে। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলন মধ্যযুগে যথেষ্ট ছিল কিন্তু

এখন থেকে ল্যাটিনের চেয়ে গ্রীক ভাষা সাহিত্যের প্রতি মনীষীরা আকৃষ্ট হলেন। কারণ গ্রীকরা য়ুরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি জনক। ক্রমে দেখা গেল এ সব রচনা যেমন গ্রীসের মহাপণ্ডিত **অ্যারিস্টটলের** লেখা বইগুলি অধিকাংশ আরবীয় পণ্ডিতদের দ্বারা অনুবাদ। অনুবাদে অনেক জায়গায় ভুল থেকে যায়। তাই রেনেশাঁস-যুগের পণ্ডিতরা মূল রচনার খোঁজ করতে লাগলেন এবং প্রাচীন পুঁথিগুলির পুনরুদ্ধারে যত্নবান হলেন। এইসব ক্লাসিক্‌স ও লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও চর্চাকে বলা হয় **হিউম্যানিজম**। আর যে সব পণ্ডিত এ কাজে নিযুক্ত থেকে বুদ্ধি ও ভাবজগতে নতুন দিক উন্মুক্ত করলেন, তাঁদের বলা হয় '**হিউম্যানিস্ট**'। এই রকম বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞান অন্বেষণের ফলে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন এবং মানসিক উৎকর্ষই হল হিউম্যানিজম-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাহিত্য ঃ রেনেশাঁস-এর সময়ে ইটালিতে শুধু গ্রীক-রোমান সাহিত্যের চর্চাই হয়নি, দেশী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ইটালির দেশী ভাষাকে মার্জিত করে সাহিত্যের নানা বিভাগে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়। **দান্তে** ইতিপূর্বেই তার মহাকাব্য "**ডিভাইন কমেডি**' মাতৃভাষায় রচনা করে যান। আজও এই অপূর্ব কাব্যটি বিশ্ব সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে সমাদৃত হয়। তারপর এলেন **পেত্রার্ক** (১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ অব্দ) যিনি আধুনিকতার অগ্রদূত। তিনি শুধু প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ আর অধ্যয়ন করেই সময় কাটান নি। তিনি ছিলেন মস্ত কবি, স্বদেশী ভাষায় চতুর্দশপদী (সনেট) কবিতার স্রষ্টা। পনেরো শতকে ইটালিতে আরও কয়েকজন বিখ্যাত লেখক গ্রন্থ রচনা করেন। **অ্যারিওস্তো** লেখেন তাঁর কাব্য **অর্ল্যান্দো ফিউরিওসো**, আর **ম্যাকিয়াভেলি** লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '**দ্য প্রিন্স**'। এ বইয়ে তিনি স্বৈরতন্ত্রের রূপ নির্ণয় ও সুবিধাবাদের ব্যাখ্যা করেন। বহুদিন ধরে সেটি রাজনীতি-তত্ত্বের অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ বলে গণ্য ছিল। আর এক অগ্রণী সাহিত্যিক ছিলেন **বোক্কাচিও**। ইটালিয়ান ভাষায় লেখা তাঁর গল্পগুলি য়ুরোপীয় কথাসাহিত্যের প্রথম উজ্জ্বল নমুনা যার পাঠক সংখ্যা আজও কম নয়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি **তাসো** এবং প্রথম উপন্যাস লেখক **ব্যান্দেলো**। তাঁর লেখা ছোট ছোট উপন্যাস '**নোভেলা**' থেকে 'নভেল' শব্দটির উৎপত্তি।

ইংলণ্ডে রেনেশাঁসের জন্ম ঃ পৃথিবী ও প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে বড় করে দেখা, মানুষ ও তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল আর জীবনকে উপভোগ করার ইচ্ছা—এই সব প্রবৃত্তি রেনেশাঁস যুগে লেখকদের রচনায় সুস্পষ্ট হয়ে দেখা যায়। যেমন বোক্কাচিওর লেখায় ধর্ম, নীতিজ্ঞান ও পাপপুণ্যের চেয়ে ইহ-লোকের জীবনচিত্র দেখানোই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর গল্পগুলি পড়ে ইংরেজ কবি **চসার** তাঁর বিখ্যাত '**ক্যাণ্টারব্যারি টেলস্**' লেখেন। সে যুগে অনেক লোক ক্যাণ্টারব্যারি প্রভৃতি তীর্থস্থানে যেত। চসারের কাব্যে কয়েকজন যাত্রী এই ভাবে গল্প করতে করতে চলেছে, তাঁদের মধ্যে কবি নিজেও আছেন। গল্পগুলি খুব সুন্দর ও মজার, চসারের পর ইংলণ্ডে রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে, কয়েকজন বড় কবি ও নাট্যকার ইংরেজি সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। এঁদের মধ্যে কবি

স্পেন্সার (Spenser), **মার্লো** (Marlowe) এবং **বেকন** (Sir Francis Bacon) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বেকনের খ্যাতি মূলত সুপণ্ডিত, আইনজ্ঞ ও বিচারপতি হিসাবে। কিন্তু তিনি ইংরেজি গদ্য সাহিত্যেরও পথিকৃত ছিলেন। অমূল্য প্রবন্ধাবলী (Essays) তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। বিজ্ঞান-প্রসঙ্গে তাঁর অবদানের কথা আবার বলতে হবে। স্পেন্সারের বিখ্যাত গ্রন্থ **'ফেয়ারি ক্যুইন'** (Faerie Queene) কল্পনায় মেশা একটি উৎকৃষ্ট রূপক কাব্য, যার মধ্যে ভাষা ও ছন্দের নতুন সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। মার্লো ছিলেন এক প্রতিভাধর। অল্প বয়সে মারা গেলেও এই উচ্চ শিক্ষিত কবি ও নাট্যকার এমন চারটি নাটক লিখে গেছেন যার মধ্যে রেনেশাঁসের প্রধান লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। মানুষের উচ্চাশা, দুঃসাহসিকতা, অসীম শক্তি পাওয়ার সাধনা, আবার জীবনের দুঃখ গ্লানি আশ্চর্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। তাঁকে বিশ্বকবি শেক্সপীয়রের পূর্বসূরী বলে চিহ্নিত করা হয়।

আর **শেক্সপীয়র** এত বড় কবি যে তাঁর তুলনা বিরল। তাঁর নাটকে মানুষের মনের বিচিত্র রূপ ও প্রকৃতি, বিভিন্ন জীবনের গতি ও পরিণতি কি অসামান্য দক্ষতায় উদ্ঘাটিত হয়েছে! **ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিং লিয়ার ও হ্যামলেট** তাঁর চারটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি (বিয়োগান্ত নাটক)। এর মধ্যে মানুষের উচ্চ আশা রাজ্যলোভ, ঈর্ষা, বঞ্চনা, দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের ব্যর্থতা প্রভৃতি মনের যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও সূক্ষ্ম অনুভূতি অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত হয়েছে। নানা চরিত্র ও ঘটনা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম, জীবনের মহত্ত্ব ও দৈন্য ইত্যাদি কত বিভিন্ন দিক শেক্সপীয়র দেখিয়েছেন। তাই ভারতের মহাকবি **কালিদাস**, জার্মানির মহাকবি **গয়টের** সঙ্গে তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত হয়। তাই ইংলণ্ডের রেনেশাঁস যুগকে 'শেক্সপীয়রের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।

হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনদেশে রেনেশাঁসের জন্ম ঃ উত্তর য়ুরোপে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মকে একত্রভাবে নেদারল্যাণ্ডস বলা হত। এর মধ্যে হল্যাণ্ডের **ইরাস্‌মাস্‌** (Erasmus) ছিলেন (১৪৬৬-১৫৩৬ খ্রীঃ অব্দ) পনেরো শতকের এক শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট। প্রচলিত ধর্মের পণ্ডিত সমালোচক হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনিই প্রথম বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ নিউ টেস্টামেন্টের গ্রীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। রেনেশাঁস যুগে ফরাসী ও স্পেনীয় সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ফ্রান্সের **রাবেলে** (Rabelais) (১৪৮৩-১৫৫৩) সনাতন শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে এক বিরাট গ্রন্থ লেখেন তা নাম 'গার্গান্তুয়া' (Gargantua)। আর একটু হলে এই অপরাধের জন্য শাস্তি হিসাবে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হত। আর দুজন বড় ফরাসী লেখক হলেন—কবি **ভিলঁ** (Villon) যিনি **'চোর কবি'** বলে আখ্যাত এবং বিশিষ্ট প্রবন্ধকার **মঁতায়েঁ** (Montaigne) যাঁর রচনায় উদার মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্পেনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ লেখক হলেন **সারভানতিস্‌** (Cervantes, ১৫৪৭-১৬১৬)। তাঁর বিখ্যাত বই **'ডন কুইকসোট'** তাতে পুরানো দিনের বীরত্বের মোহকে তিনি প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছেন। এই প্রসঙ্গ শেষে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। উত্তর য়ুরোপে (যেমন

জার্মানি হল্যাণ্ড এবং কিছু পরিমাণে ইংলণ্ডেও) চিরায়ত (ক্লাসিকাল) সাহিত্যের চেয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার ওপর বেশি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। **ইরাসমাসের** কথা আগেই বলেছি। ইংলণ্ডে **কোলেট** (Colet) ও মোরের নাম (Sir Thomas More ; ১৪৭৮-১৫৩৫) বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ **য়ুটোপিয়া** (Utopia) হল এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ পরিকল্পনা। প্রচলিত ধর্মমত ও সমাজ নীতির এই রকম সমালোচনা থেকেই 'রিফর্মেশন' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের জন্ম হয়।

[দুই] শিল্পকলায় রেনেশাঁস ঃ এখন শিল্পকলার বিকাশের কাহিনী বলি। আগেই বলেছি, কোনও দেশে সাহিত্য ও শিল্পের বিস্ময়কর উন্নতির পিছনে থাকে অর্থ আর অবকাশ। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে হয় প্রচুর অর্থাগম, পরিতৃপ্ত জীবনে মেলে অনেক সময়। এই দুটি উপকরণ একত্রে মিললে জাতীয় সাহিত্য আর শিল্পকলার সম্পদ বৃদ্ধি হয়। রেনেশাঁসের জন্মভূমি ইটালিতেই শিল্পকলার নতুন সৃষ্টিরূপ লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগেও শিল্পকলার যথেষ্ট চর্চা ছিল। অনেক প্রাসাদ ইমারৎ ও গির্জা ঐ সময়ে যে পদ্ধতিতে তৈরি হত, সেই **গথিক শিল্পরীতির** কথা তোমরা পড়ে এসেছ। এখন ঐ স্থাপত্য রীতির পরিবর্তন ঘটতে লাগল। শিল্পীরা তাঁদের নির্মাণশিল্পে সৌন্দর্য সরলতা ও সামঞ্জস্য আনার জন্য পরীক্ষা শুরু করলেন। ফলে যে শিল্পরীতির উদ্ভব হল, তাকে '**রেনেশাঁস স্টাইল**' বলে চিহ্নিত করা হল। গির্জার অভ্যন্তর দৃশ্যের ছবিতে ঐ রীতির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। রেনেশাঁস যেমন বহুমুখী, শিল্পকলারও তেমনি নানা বিভাগ ও প্রকারভেদ ছিল—যেমন চারুশিল্পের মধ্যে চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আর কারু-শিল্পের মধ্যে ধাতব শিল্প এবং ঢালাই কাজ। এ সব ক্ষেত্রেই রেনেশাঁস-শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্মে এমন কীর্তি রেখে গেছেন যা আজও দর্শকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উদ্রেক করে। রেনেশাঁস যুগে শিল্পীদের কাছে মানুষ ও প্রকৃতিই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই তাঁদের সৃষ্টির কাজে কৃত্রিমতার বদলে যা সহজ স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ সেই দিকেই ঝোঁক পড়ল। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে শিল্পীরা এই নতুন শিল্পরীতি অবলম্বন করে কি রকম সৃষ্টির কাজে এগিয়ে গেলেন, তা সংক্ষেপে বলি।

ইটালিতে ঃ ইটালির বিভিন্ন শহরে শিল্পকলার পরম আশ্চর্য বিকাশ দেখা যায়। **ফ্লোরেন্স** শহরটি ছিল জাতীয় শিল্পকলার লীলাভূমি। একা ফ্লোরেন্স শহরে শিল্পের যে বিচিত্র সুন্দর নমুনা ছড়িয়ে আছে তা দেখতে দেখতে মানুষ দিশাহারা হয়ে যায়। এখানে কত গুণী শিল্পীর যে সমাবেশ হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। সাহিত্যে মহাকবি **দান্তে, পেত্রার্ক** এবং **বোক্কাচিও** ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। আর শিল্পীদের মধ্যে **দোনাতেলো, ফ্রা এঞ্জেলিকো, মাসাচিও, বত্তিচেলি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মিচেল** বা **মাইকেল এঞ্জেলো, চেলিনি** প্রভৃতি কত মহৎ শিল্পী ফ্লোরেন্সের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন। এর প্রধান কারণ ফ্লোরেন্সের দুই বিখ্যাত নগর-পতি, মেদিচি বংশের **কোসিমো** ও তাঁর নাতি মহামহিম **লোরেঞ্জো**। বড় বড় শিল্পীদের উৎসাহ ও আনুকূল্য দিয়ে জাতীয় শিল্পকলাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যান। ইটালিয়ান শিল্পের **চার প্রধান** হলেন ঃ

[এক] **লিওনার্দো দা ভিঞ্চি** (১৪৫২-১৫১৯) : যিনি একাই একশো, রেনেশাঁস যুগের সর্বোত্তম প্রতিনিধি। বিভিন্ন বিষয়ে ছিল তাঁর অফুরন্ত জিজ্ঞাসা, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সঞ্চরণ করে তাঁর বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি একাধারে গণিতজ্ঞ, যন্ত্রবিদ্, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী। উদ্ভিদ-বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও অ্যানাটমি অর্থাৎ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট কৌতূহল ও জ্ঞান ছিল। তিনি কয়েকটি যন্ত্রের নক্সাও এঁকেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত '**নোটবুক**' পড়লে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মেলে। তাঁর আঁকা দুটি শ্রেষ্ঠ ছবি হল, দেয়াল চিত্র '**দ্য লাস্ট সাপার**' (যীশুর শেষ ভোজন) আর '**মোনালিসা**'—যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ছবিতে মহিলাটির মুখে যে অপরূপ দুর্জ্ঞেয় হাসির আভাস, (ছবিটি খুঁটিয়ে দেখো, বিশেষ করে দুটি হাত ও ওষ্ঠরেখা) তার নানা ব্যাখ্যা করেছেন শিল্প সমালোচকরা। কেউ বলেন, ইনি এক স্থানীয় ভদ্রমহিলা, আবার কেউ মনে করেন, দা ভিঞ্চির মা। ছেলের কীর্তি গৌরবে বিজয়িনীর তৃপ্ত হাসি। মোট কথা, 'মোনালিসা' এক অপূর্ব সৃষ্টি।

[দুই] **মাইকেল এঞ্জেলো** (১৪৮৩-১৫২০) : আর এক মহৎ শিল্পী। তিনিও একাধারে কবি, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী। গির্জার অভ্যন্তরে, ছাদের নিচে ও দেয়ালে তিনি যে সব ছবি এঁকে যান সেগুলি আকারে প্রকারে বিস্ময়কর। স্থপতি হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ রোমে **সেণ্টপিটার গির্জার** কিউপোলা অর্থাৎ মাথার বিরাট গম্বুজ। আর তাঁর ভাস্কর্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল বীর '**ডেভিড**'-এর দৃপ্ত মূর্তি এবং দুটি সমাধির ওপর অর্ধশয়ান 'ঊষা ও সন্ধ্যা' বা 'দিবা ও রাত্রি'-র দুটি প্রতিমূর্তি। এগুলি ছাড়া তাঁর শিল্পকীর্তির আরও অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা আছে।



মিচেল বা মাইকেল এঞ্জেলোর অঙ্কিত নিজস্ব প্রতিকৃতি

[তিন] **তিতিয়ান** (? -১৫৭৬) : এক বড় চিত্রকর। ছবিতে রঙের ব্যবহার ও বিন্যাসের জন্য তিনি বিখ্যাত। কুমারী মেরী মাতার একটি ছবি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

[চার] **রাফায়েল** (১৪৮৩-১৫২০) : তাঁকে '**ডিভাইন**' বা দৈব প্রতিভাধর বলা হত। অনেকে বলেন রেনেশাঁস চিত্র শিল্প তাঁর হাতে সবচেয়ে সার্থক। তাঁর আঁকা নিজের প্রতিকৃতি আর 'মাদোনা' বা মাতৃমূর্তি জগদ্বিখ্যাত। এখানে বলে রাখি এ যুগের যত প্রসিদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্কর সকলেই শিশু যীশুকে নিয়ে মেরী মাতার অজস্র মাতৃমূর্তি নানা ছাঁদে নানাভাবে তৈরি করে গেছেন।

ভিনিস শহরের চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে **বেলিনি, তিন্তরেত্তো ও পল ভেরোনী**-

জের নাম প্রসিদ্ধ। ইটালিতে বিখ্যাত ভাস্করদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো (যাঁর শিল্পকাজের কথা আগে বলা হল), **ব্রুনেলেশি** ও **গিবার্তি** ছিলেন সবচেয়ে নাম-করা শিল্পী। গিবার্তির তৈরি গির্জার দুটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত দরোজায় এত সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকাজ আছে যে লোকে বলে এ হল 'স্বর্গের প্রবেশ-দ্বার'। **চেলিনি** আর এক প্রসিদ্ধ ভাস্কর। তিনি তাঁর বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের কথা 'আত্মচরিতে' লিখে গেছেন। মিনে-করা সোনায় ও মূল্যবান পাথরে তৈরি তাঁর নিমকদান (লবণ রাখার পাত্র) অপূর্ব এক শিল্পকীর্তি। ধাতুশিল্পের যাবতীয় ঢালাই কাজে ইটালির বাইরেও তাঁর জুড়ি ছিল না। জার্মানির ড্যুরার ও হলবিন, ফ্ল্যাণ্ডার্স প্রদেশের রুবেনস ও ড্যাম ডাইক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছিল। পার্সিউস-এর বিখ্যাত মূর্তিটিও তাঁর সৃষ্টি।

রেনেশাঁস যুগের বড় বড় শিল্পীদের স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন কাজের কয়েকটি ছবি বইতে দেখতে পাবে। মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলি দেখলে এগুলির সৌন্দর্য বৈশিষ্ট্য ধরতে পারবে। বিশেষ করে নজর করো দুয়োমার গির্জার পুরোভাগে চতুষ্কোণ একক টাওয়ারটি। আর ফোয়ারার জল পান করে ঐ ঘোড়াটির মুখে চোখে কি তৃপ্তি ও আনন্দ ফুটেছে দেখো।

বিজ্ঞানে রেনেশাঁস : রেনেশাঁসের দুশো বছর আগে **রোজার বেকন** (১২১৪-৯৪) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মনের পরিচয় দেন। মধ্যযুগে বাস করেও তিনি প্রচলিত সংস্কার বর্জন করে বলেন যে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমেই সত্য আবিষ্কার করা যায়। স্বাধীন মতামতের জন্য তাঁকে পীড়ন করা হয়। কিন্তু রেনেশাঁস যুগে তাঁর আবার কদর হয়। তাঁকে বিজ্ঞানের আদি পুরুষ বলা হয়। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও পরীক্ষার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ছবি আঁকায় এত সময় ও পরিশ্রম দিয়েও তিনি যে বিজ্ঞানের নানা দিকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, সেটা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ।

বিজ্ঞানে রেনেশাঁস প্রবর্তন করলেন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এবং কেপলার। **কোপারনিকাস** (১৪৭৩-১৫৪৩) সৌরজগৎ সম্বন্ধে মধ্যযুগের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে প্রচার করলেন সূর্য স্থিতিশীল, পৃথিবীই তাকে পরিক্রমা করে ঘুরছে। **গ্যালিলিও** (১৫৬৪-১৬৪২) পিসা শহরের হেলানো মিনার থেকে পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করলেন কোপারনিকাসের অনুমান সিদ্ধান্ত সত্য। গতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা গ্যালিলিও 'কোপারনিকাস পদ্ধতি'-কে পাকা করেন এবং নানা নির্যাতন ভোগ করেও তাঁর মত ও সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, চার্চের গোঁড়া সমর্থকরা তাঁকে যথেষ্ট নিপীড়ন করে তাঁর মতবাদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন। তবু কোপারনিকাস নাকি বলতে থাকেন। 'কিন্তু পৃথিবী নড়ছে!' পৃথিবীর গতিশীলতা ঘোষণা করার জন্য **ব্রুনোকে** পুড়িয়ে মারা হয় (১৬০০ খ্রীঃ অব্দ)। তৃতীয় বৈজ্ঞানিক হলেন **কেপলার** (১৫৭১-১৬৩০) গতি-বিজ্ঞানের তিনটি বিখ্যাত নিয়ম তাঁর আবিষ্কার। গাণিতিক জ্যোতি-বিজ্ঞান তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলণ্ডের **ফ্রান্সিস বেকন** হলেন চতুর্থ ব্যক্তি (১৫৬১-

১৬২৬)। 'সাধারণীকরণ রীতি (**ইনড্যকটিভ মেথড**) নামে অভিহিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা হিসেবে তাঁর মস্ত পরিচয়। এই পদ্ধতি দিয়ে 'বিশেষ থেকে সাধারণ' অর্থাৎ জানা থেকে অজানায় পৌঁছান যায়। বিজ্ঞানচর্চার মূল ভিত্তি হল—চোখে দেখা ঘটনা ও তথ্যকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যাচাই ও বিশ্লেষণ করা এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বাদ দিয়ে কার্য-কারণ সূত্র সন্ধান করে একটি সিদ্ধান্ত খাড়া করা। ষোল শতক থেকে বিজ্ঞানচর্চায় বেকন-প্রবর্তিত এবং পদ্ধতির ব্যবহার ও প্রয়োগ চলতে থাকে। বিজ্ঞানের প্রসার আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর বীজ বপন হয়েছিল রেনেশাঁস যুগে এবং তার চর্চা সার্থক ও কার্যকর হল **নিউটনের** আমলে। তাঁর পর থেকে বিজ্ঞান নতুন পথে অগ্রসর হতে থাকল।

রেনেশাঁস-যুগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অভাবিত সাড়া জেগেছিল, তার প্রভাব ও ফলাফল যেমন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, তেমনি তার তুলনাও বিরল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে কয়েকটি বিখ্যাত যুগের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপের এই রেনেশাঁস যেমন সর্বত্রগামী , বহুমুখী আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল তেমনটি কোথাও দেখা যায় না। অর্থ ও সমাজ-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তনের কথা গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন শিল্প, সাহিতা ও বিজ্ঞানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টার কথা বলা হল, তাই বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়।

এ যুগে বিজ্ঞানের দুটি বড় অবদান হলঃ **গোলা বারুদ** এবং **মুদ্রাযন্ত্রের** উদ্‌ভাবন। চীন দেশে সম্ভবতঃ বারুদের ব্যবহার ও ছাপার কাজ জানা ছিল। তবে য়ুরোপে বারুদের ব্যবহার পনের ষোল শতক থেকে বাড়তে থাকে। তার ফলে যুদ্ধ করার পদ্ধতি একেবারে বদলে গেল। বর্ম, শিরস্ত্রাণ-পরা 'নাইট' ও 'ব্যারন'দের উপর নির্ভর না করে কামান বন্দুক চালনায় দক্ষ সৈন্যদল নিযুক্ত হতে লাগল। স্পেন যে আমেরিকায় মেক্সিকো ও পেরু জয় করে নিল, তার কারণ ঐ কামান.বন্দুকের ব্যবহার। আবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শক্তিশালী স্পেনের নৌবাহিনী যে বিধ্বস্ত হয়ে গেল (১৫৭৮ খৃঃ অব্দে), তারও কারণ ইংরেজ নৌবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে আরও সুদক্ষ ছিল।

পনেরো শতকের মাঝামাঝি মুদ্রণশিল্পের প্রচলন শুরু হল য়ুরোপে। প্রথমে খোদাই করা ও সাজানো কাঠের ব্লক ব্যবহার হত ছাপার কাজে। অনুমানিক ১450 খৃস্টাব্দে মেইঞ্জ শহরের অধিবাসী **জন গুটেনবার্গ** সর্বপ্রথম ধাতু থেকে কাটা টাইপ তৈরি করলেন। এই টাইপগুলি সরিয়ে সরিয়ে বসানো যেত। ফলে এক সঙ্গে অনেকখানি ছাপা চলত। এই নতুন পদ্ধতির ব্যবহারে মুদ্রণ কাজে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল। ইটালিতে একা ভিনিস শহরেই প্রায় দুশো ছাপাখানা তৈরি হওয়ার ফলে বই ছাপার কাজ দ্রুত বাড়তে থাকল। ইংলণ্ডে **উইলিয়ম ক্যাক্সটন** ১৪৭৬ সালে লণ্ডন শহরে তাঁর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং মুদ্রণ পদ্ধতির উদ্‌ভাবন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এতদিন চার্চ বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের কর্তাদের হাতে ছিল বিদ্যাশাস্ত্রের চাবিকাঠি। যাজকরাই লেখাপড়া করতেন, শেখাতেন। এ যাবৎ বিদ্যাপীঠগুলিতে পুরানো শাস্ত্র-পুঁথি নকল করে পড়াশুনোর কাজ চলত। এখন ছাপাখানর দৌলতে নানা গ্রন্থ প্রকাশ হতে

লাগল। সে সব বইয়ে কি আছে অর্থাৎ সত্য কথাগুলি সাধারণ মানুষের হস্তগত হল এবং জ্ঞান চর্চায় এক বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হল। তখন নানা স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা-রীতি ও পাঠ্য বিষয়েরও পরিবর্তন দেখা দিল। ফ্লোরেন্স শহরে 'আকাদেমি' স্থাপিত হওয়ায় নবলব্ধ জ্ঞান-বিদ্যার প্রসার ত্বরান্বিত হল। মধ্যযুগের সামন্ত প্রথার অবসান, পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্যবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন, চার্চের কর্তৃত্ব এবং পোপের মাহাত্ম্য-হ্রাস, জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসার, '**রিফর্মেশন**' অর্থাৎ ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের সূচনা-আর আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত—এই কয়টি হল রেনেশাঁসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল।

এক নজরে

* ফরাসী শব্দে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ বলতে বোঝায় মধ্যযুগীয় অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আন্দোলন।
* রেনেশাঁসের প্রথম প্রকাশ দেখা যায় ইটালিতে। তারপর তা ক্রমশ আল্পস পর্বত পার হয়ে উত্তর য়ুরোপে জার্মানি, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম ও ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছয় এবং সেখানকার শিল্পকলা, সাহিত্য ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্স, পোর্তুগাল ও স্পেন দেশ রেনেশাঁসে অংশ গ্রহণ করে।
* রেনেশাঁস আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার মানবতাবাদ (হিউম্যানিজম্)। মানবতাবীদের রচনাতেই প্রথম মানুষের কথা, মানুষের প্রশস্তি স্থান লাভ করেছিল। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছিল সাহিত্য, শিল্পভাস্কর্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানে।
* ইউরোপের মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে পেত্রার্ক, অ্যারিওস্তো, ম্যাকিয়াভেলি, বোক্কাচিও, তাসো, ব্যান্দোলো, চসার, স্পেন্সার, শেকসপীয়ার, ইরাসমাস, রাবেলে, সারভানতিস প্রমুখ সমধিক উল্লেখযোগ্য।
* স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদিতে মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় যাঁরা রেখে গেছেন তাঁরা হলেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলো প্রভৃতি।
* বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেশাঁসের প্রবর্তন করলেন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এবং কেপলার।
* এই যুগে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং মুদ্রণ পদ্ধতির উদ্ভাবন এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* রেনেশাঁস বা নবজাগরণ কাকে বলে ? * রেনেশাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ? * আধুনিক যুগের সূচনাকাল মোটামুটি কখন থেকে ধরা হয় ? * ক্লাসিক্স কাকে বলে ? * ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আদি জনক বলতে কাদের বোঝাতো ? * হিউম্যানিজম কাকে বলে ? * হিউম্যানিস্ট কাদের বলা হতো ? * ডিভাইন কমেডি কি ? এর রচয়িতা কে ? * স্বদেশী ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতার (সনেট) স্রষ্টা কে ? তাঁর আবির্ভাব কাল কত ? * ম্যাকিয়াভেলি রচিত বিখ্যাত গ্রন্থখানার নাম কি ? * বোক্কাচিও রচিত কোন গ্রন্থখানাকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে মনে করা হয়। * নভেল শব্দের উৎপত্তি কি ভাবে হয়েছে ? * ক্যাণ্টারব্যারি টেলস কি ? এর রচয়িতা কে ? * ইংলণ্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্বকালে যে সব কবি ও নাট্যকার ইংরেজী সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কে কে ? * ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের পথিকৃৎ বলতে কাকে বোঝায় ? * স্পেন্সারের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থখানার নাম কি ? * শেক্সপীয়র রচিত বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটকগুলি কি কি ? * ইরাসমাস কে ছিলেন ? তিনি কখন কোথায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ? * কোন ফরাসী লেখক 'চোর কবি' বলে অখ্যাত ছিলেন ? * 'ডন কুইকসোট'-এর লেখক কে ? তিনি কোন দেশের লোক ? তাঁর আবির্ভাব কাল কত ? * লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কেন বিখ্যাত ? তাঁর আঁকা বিখাত ছবি দুখানি কি কি ? * বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে মাইকেল এঞ্জেলোর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির উদাহরণ দাও। * বিজ্ঞানের আদি পুরুষ বলতে কাকে বুঝায় ? * সূর্য স্থিতিশীল, পৃথিবী তাকে পরিক্রমা করে ঘুরছে—এই সত্য-কে প্রচার করেছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। রেনেশাঁস বা নবজাগরণ বলতে কি বোঝ ? এর প্রকৃতি আলোচনা কর।

২। য়ুরোপে আধুনিক যুগের সূচনাকালে মোটামুটি ভাবে ১৪৫৩ সাল বলে ধরা হয় কেন ?

৩। কনস্টাণ্টিনোপলের পতনের গুরুত্ব কি ?

৪। রেনেশাঁস সৃষ্টিতে ইটালি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কি কারণে ?

৫। ইটালীর নবজাগরণ পরবর্তিকালে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়ে ?

৬। মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম বলতে কি বোঝায় ? ইউরোপে মানবতাবাদ দেখা দিয়েছিল কেন ?

৭। রেনেশাঁস যুগের সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৮। নাট্যকার ও সাহিত্যিক শেক্সপীয়র সম্পর্কে যা জান লেখ। ইংলণ্ডের রেনেশাঁস যুগকে শেক্সপীয়রের যুগ বলে অভিহিত করা হয় কেন ?

৯। ইরাস্‌মাস্‌ কে ছিলেন? তার সম্পর্কে যা জান লেখ।
১০। রেনেশাঁসের যুগে রাবেলের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।
১১। শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূচনা কিভাবে হয়েছিল?
১২। নবজাগরণের যুগের শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
১৩। শিল্পী হিসেবে মাইকেল এঞ্জেলোর কৃতিত্ব বিচার কর।
১৪। রাফেয়েল কে ছিলেন? তাকে 'ডিভাইন' বা দৈব প্রতিভাধর বলা হতো কেন?
১৫। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৬। রোজার বেকন কে ছিলেন? তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদান কি?
১৭। ফ্রান্সিস বেকন কে ছিলেন? তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি ধরনের ছিল?
১৮। পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিকোলাস কোপার্নিকাস কি সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা মেনে নিতে পেরেছিলেন? তিনি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন?
১৯। ইটালীর পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও সম্পর্কে যা জান লেখ।
২০। নবজাগরণের যুগে গোলাবারুদের আবিষ্কার যুদ্ধবিদ্যায় যে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল তা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ কর।
২১। 'পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার রেনেশাঁস যুগেরই অন্যতম অবদান'—এর সত্যতা সংক্ষেপে বিবৃত কর।
২২। গুটেনবার্গ কোন দেশের লোক ছিলেন? তাঁর নাম বিখ্যাত কেন?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। রেনেশাঁস বা নবজাগরণ কথার অর্থ কি? ইউরোপে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ বলতে যা বোঝায় তা কি নবজাগরণ? এটা কি হঠাৎ হয়েছিল না ক্রমশ হয়েছিল? ক্রমশ যদি হয়ে থাকে কিভাবে তা হয়েছিল আলোচনা করে দেখাও।
২। নবজাগরণের বিশেষত্ব কি? মধ্যযুগ থেকে নবজাগরণের পার্থক্য কি কি?
৩। মানবতাবাদ বলতে কি বোঝ? রেনেশাঁস যুগের সাহিত্য, শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে কি ভাবে মানবতাবাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] দু-এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) কনস্টাণ্টিনোপল শহরের পতন হয় কবে?
(খ) ডিভাইন কমেডির লেখক কে?
(গ) দ্য-প্রিন্স গ্রন্থের লেখক কে?

(ঘ) ক্যাণ্টারব্যেরি টেলস গ্রন্থখানি কে লিখেছিলেন ?
(ঙ) ফেয়ারি কুইন কে লিখেছেন ?
(চ) কালিদাস কোন দেশের মহাকবি ?
(ছ) মোনালিসা চিত্রটি কে এঁকেছেন ?
(জ) ফ্লোরেন্সের ডেভিডের মূর্তি কে তৈরি করেছিলেন ?
(ঝ) ইটালির কোন শিল্পীকে ডিভাইন বলা হতো ?
(ঞ) গাণিতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
(ট) ধাতু থেকে কাটা টাইপ সর্বপ্রথম কে তৈরি করেন ?

ব্যবহারিক অনুশীলন

[এক] নিচের ছকের বাঁদিকে রেনেশাঁস যুগের শিল্পীদের চিত্র দেওয়া আছে। ডানপাশের শূন্যস্থানে এদের শিল্পকীর্তির সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ







[দুই] নিচের ছকের বাঁদিকে রেনেশাঁস যুগের বিজ্ঞানীদের চিত্র দেওয়া আছে। ডানপাশের শূন্যস্থানে এদের বৈজ্ঞানিক অবদান লেখ ঃ









[তিন] নিচের চিত্রগুলি দেখ এবং ডানপাশের শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



নাম ------------------------------

জন্মস্থান ------------------------------

আবির্ভাব কাল ------------------------------

লিখিত গ্রন্থ ------------------------------



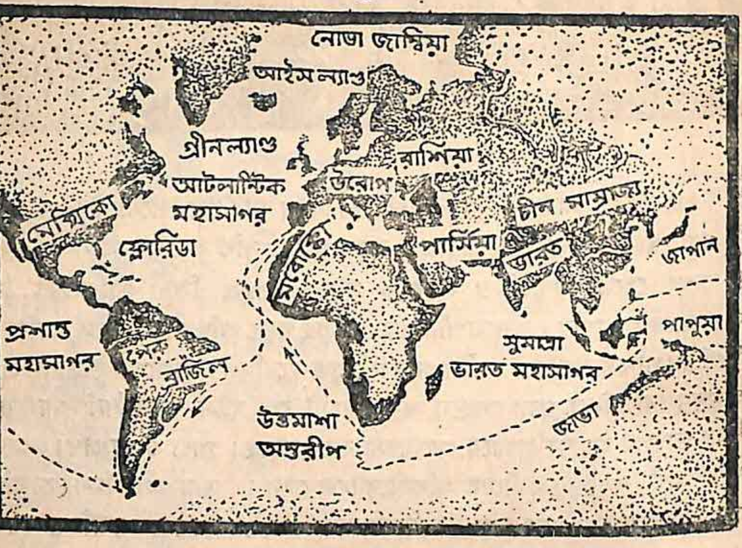
৩ ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান

সূচনা : মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তন আর রেনেশাঁসের উদ্দীপনা, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইতিহাসে আর এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। য়ুরোপ এখন তার পরিচিত জগৎ ছেড়ে অপরিচিত জগতের সন্ধানে বেরুল, কিছু 'অ্যাডভেঞ্চর', কিছু প্রয়োজন ও লাভের আশায়। য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির সমুদ্র অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত নতুন পৃথিবীর (পশ্চিম গোলার্ধে) সীমা অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। য়ুরোপের ইতিহাস এখন থেকে যে নতুন মোড় নিল, তার পেছনে ছিল একটি বড় ঘটনা—কনস্ট্যাণ্টিনোপ্‌লের পতন ; যার তাৎপর্য আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের সংযোগস্থলে এই শহরটি তুর্কীদের অধিকারে চলে গেল। তার ওপর মিশর দেশটিও যখন তুর্কীরা দখল করল তখন আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর এবং সেখান থেকে লোহিত সাগর দিয়ে পূর্ব দেশে আসার জলপথটিও রুদ্ধ হল।

মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে মানুষের মন প্রাচ্য-দেশগুলির চেনবার জন্য উৎসুক হয়েই ছিল। এখন রেনেশাঁসের যুগে সেই আগ্রহ আরও তীব্র হয়ে ওঠায় ভৌগোলিক আবিষ্কারের পালা শুরু হয়। অজানা উন্মুক্ত সমুদ্রপথে অভিযান করতে হলে চাই উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম। নানারকম স্রোতের টান, ঝড়ে, দুর্যোগে জাহাজডুবির আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে চলার প্রয়োজনে নানা উপায় উদ্‌ভাবিত হল। আবিষ্কৃত হল দিকনির্ণয়ের জন্য চুম্বক শক্তিসম্পন্ন নাবিকদের **কম্পাস, অ্যাস্ট্রোলেব, সেক্‌সট্যাণ্ট** প্রভৃতি নতুন যন্ত্র, যার সাহায্যে সমুদ্র যাত্রা সহজসাধ্য হয়। এইভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত হল বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ। এখন থেকে বড় বড় পাল-তোলা জাহাজ উপকূল ঘেঁসে না গিয়ে সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সাহস পেল।

এই রকম অভিযানের প্রেরণা জুগিয়েছিল পশ্চিম য়ুরোপে রাজ্যগুলির নবজাগ্রত জাতীয় ভাব। খৃস্টান জগতে ভাঙন শুরু হলে এক একটি জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্র (**নেশন স্টেট**) গড়ে উঠেছিল, সে কথা জেনেছ। শেষ মুসলিম রাজ্যের পতন হলে স্পেন দেশে খৃস্টান রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হয়ে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে (১৪৯২ খৃঃ অব্দ)। ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সেও ঐ রকম জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হয় যথাক্রমে ১৪৮৫ ও ১৪৯১ সালে। এই-ভাবে শক্তিশালী রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতির মান-মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নতুন দেশ আবিষ্কারে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল। বণিক-ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য-সূত্রে ঐ সব অঞ্চলে হাজির হয়ে নিজ নিজ রাজ্যের বিজয়-পতাকা তুলে দিল। এই ভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে যেমন জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হল, তেমনি দেশজয়ের

আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে লাগল। পনেরো শতকের শেষ থেকে ভারত (ইণ্ড), চীন (ক্যাথে) প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ ও বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করা ও বজায় রাখাই



আবিষ্কৃত পৃথিবীর সীমা বিস্তার (আঃ ১৫৬০)

ছিল য়ুরোপের জাতিদের প্রধান লক্ষ্য। স্বার্থরক্ষার জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলহ এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে আঠারো শতকে। যাই হোক, সমুদ্রপথগুলি চিনে রাখা, আবিষ্কৃত দেশগুলির মানচিত্র তৈরি করা, অর্থাৎ ভূগোল-বিজ্ঞানের প্রসার রেনেশাঁসের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। সেই সূত্রে নতুন ভূখণ্ডে যখন উপনিবেশ স্থাপন শুরু হল, তখন 'য়ুরোপের বিস্তার', মানে অধিকার বিস্তারের পথ ক্রমেই প্রশস্ত হতে লাগল।

পোর্তুগাল ঃ এইবার যে দুটি দেশ এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেয়, তারা **পোর্তুগাল ও স্পেন**। পোর্তুগীজরাই আসরে প্রথম নেমেছিল রাজবংশীয় নাবিক হেনরি'র (Henry the Navigator) প্রেরণায়। তাঁর সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে বহু নাবিক সমুদ্রযাত্রা করে এবং অনেক নতুন দেশ ও দ্বীপ আবিষ্কার করে। পোর্তুগীজরা প্রথমে আফ্রিকার উপকূল ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। মেডিরা ও আর্জোস দ্বীপগুলি অধিকার করে পোর্তুগীজরা কেপ ভার্দ-এ পৌঁছায়। তারপর ভারতবর্ষে আসার স্থলপথ বন্ধ হওয়াতে আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে দীর্ঘ সমুদ্রপথের সন্ধান চলল। **বারথেলোমিউ ডিয়াজই** প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of good Hope) অতিক্রম করেন (১৪৮৬ খৃঃ অব্দে)। এর বারো বছর পরে বিখ্যাত নাবিক **ভাস্কো-ডা-গামা** দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে **কালিকট** নগরে উপস্থিত হন। ভারতে পোর্তুগীজ অধিকারের এই সূত্রপাত (১৪৯৮)। প্রকৃত পক্ষে **আলবুকার্ক** হলেন প্রাচ্য দেশে পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আরব সাগরে মস্কট, ওরমুজ থেকে ভারতে মাদ্রাজ

তারপর সিংহল, মসলা দ্বীপপুঞ্জ (মলক্কা), জাভা সেলিবিস ও বোর্নিও দ্বীপ পর্যন্ত হল পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমা। ওদিকে পশ্চিমে অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রম করে **কেব্রাল** দক্ষিণ আমেরিকায় প্রকাণ্ড দেশ ব্রাজিল (Brazil) অধিকার করেন (১৫০০)। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন **ম্যাগেলান** (Magellan) (১৫১৯-২২)। অতলান্তিক, প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে তিনি সমুদ্রপথে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন। দক্ষিণ আমেরিকার শেষ প্রান্তে দুর্যোগপূর্ণ প্রণালীটি তাঁরই নামে অভিহিত।

পোর্তুগীজরা শুধু ভারতে ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ গুলিতে (ইস্ট ইণ্ডিজ) বাণিজ্য ও বসতি স্থাপন করেনি, সুদূর চীন ও জাপানের সঙ্গেও ব্যবসা শুরু করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, ক্ষুদ্র পোর্তুগাল নানা অভিযান চালিয়ে যে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, তাতে ভূমধ্যসাগর থেকে অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে বাণিজ্যের এবং ক্ষমতারও কেন্দ্র সরে গেল। **পিসা, জেনোয়া**, বিশেষ করে **ভিনিসের** মতো সমৃদ্ধ শহরগুলির খুব লোকসান হতে লাগল। পোর্তুগীজরা আরবদের কাছ থেকে যে বাণিজ্য অধিকার দখল করে নিল এবং পৃথিবীর নতুন জলপথ আবিষ্কার করে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে আসতে লাগল, তাতে পোর্তুগালের রাজধানী **লিস্‌বন** এখন য়ুরোপে প্রাচ্য দেশের যাবতীয় পণ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার ও প্রসিদ্ধ বন্দর হয়ে উঠল। তবে স্পেনের সাম্রাজ্যের মতো

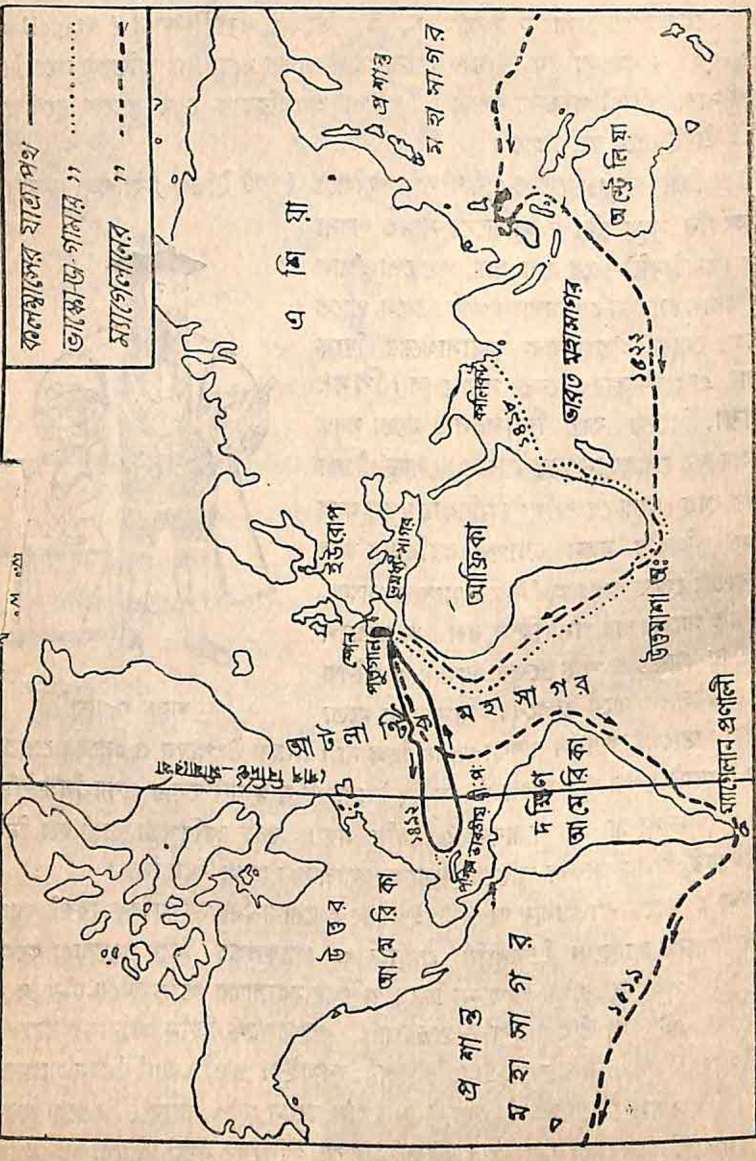


ভাস্কো-দা-গামা

পোর্তুগীজ সাম্রাজ্যে প্রশাসন ব্যবস্থা তেমন ছিল না। নিজস্ব উৎপাদন ও রসদের জোরও ছিল কম। ছোট্ট দেশ, শুধু সওদাগরি অর্থাৎ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল হয়েছিল। জন-সংখ্যা কম, লোকবলও বেশি নয়। তাই আধিপত্য স্থায়ী হয় নি। পোর্তুগীজদের অনেক জায়গা সতেরো শতকে ওলন্দাজরা দখল করে নেয়।

স্পেন : ভাস্কো-দা-গামার আগেই, ইটালির জেনোয়া-নিবাসী নাবিক বিশ্ববিখ্যাত **কলম্বাস** স্পেনের সাহায্যে তিনখানি জাহাজ ও লোকলস্কর নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেন (১৪৯২)। পূর্ব দিকের ঘুর-পথে না গিয়ে পশ্চিমে মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চীন দেশে পৌঁছে যাবেন, এই ছিল তাঁর ধারণা ও প্রত্যাশা। প্রকৃতপক্ষে তিনি আবিষ্কার করলেন বাহামা দ্বীপপুঞ্জ, হিসপানিওলা, কিউবা, ত্রিনিদাদ, জামাইকা প্রভৃতি ক্যারিবিয়ন সাগরের দ্বীপগুলি। কলম্বাস মোটের ওপর চারটি অভিযান করেন চৌদ্দ বছরে। ভেবেছিলেন এশিয়া মহাদেশে এসে গেছেন, কিন্তু আসলে তিনি যে পশ্চিমের নতুন মহাদেশের কোলে পদার্পণ করলেন তা না জেনেই মারা যান। কলম্বাসের পর **আমেরিগো ভেসপুচি** (যাঁর নাম থেকে আমেরিকা), **বালবোয়া, কর্তেজ** এবং আরো কয়েক জন অভিযান চালিয়ে মধ্য আমেরিকার অনেকগুলি অঞ্চলে ও 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ' দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন।

বালবোয়া অতলান্তিক পার হয়ে যখন **পানামা যোজকে** এসে উঠলেন, (১৫১৩), তখন তিনি দেখলেন সম্মুখে প্রসারিত আর এক সমুদ্র, প্রশান্ত মহাসাগর। এই সব অভিযানের ফলে পশ্চিম সাগর-পারে স্পেনের এক বড় উপনিবেশ-সাম্রাজ্য গড়ে উঠল।



স্পেন থেকে যে সব সাহসী বিজেতা স্থানীয় অধিবাসীদের হারিয়ে, তাদের রাজ্যের ঐশ্বর্য ও অনেক কালের সভ্যতা ধ্বংস করে স্পেন-সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করে, ইতিহাসে তারা 'কন্‌কুইস্টেডোর' (Conquistadores) নামে পরিচিত। এরা অনন্ত যৌবনের উৎস

স্থল, পরম সৌন্দর্য-ভূমি এক কাল্পনিক দেশের সন্ধানে বেরিয়েছিল। যাই হোক, **কর্তেজ** মধ্য আমেরিকার প্রাচীন **আজ্‌টেক** জাতিকে পরাস্ত করে **মেক্সিকো** দেশ জয় করেন (১৫১৯-২১) আর **পিজারো** দক্ষিণ আমেরিকার আর এক সুপ্রাচীন জাতি **ইনকা**-দের কাছ থেকে পেরু দখল করে নেন (১৫৩১-৩২)।

স্পেনের সাম্রাজ্য খুব বিশাল হয়ে উঠেছিল ষোল শতকে। এই বিপুল সাম্রাজ্য প্রায় তিন শো বছর টিকে ছিল। ১৮০৮-২৫ সালের মধ্যে তার পতন ঘটে প্রধানতঃ মুক্তি আন্দোলনের নেতা **সাইমন বলিভারের** অক্লান্ত চেষ্টায়। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। পোর্তুগাল ও স্পেন যে সাগর-পারে সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রণী ছিল সে কথা জেনেছ। এখন তার ফলাফল কি, তা বলছি। প্রথমতঃ য়ুরোপে যখন পুরাতন ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছিল, সেই সময়ে নব-আবিষ্কৃত আমেরিকায় স্পেনের প্রচারকদের দৌলতে ধর্মের প্রসার হওয়াতে অনেকটা ক্ষতি পূরণ হল। তা ছাড়া সেখানকার ভুট্টা, আলু, তামাক, কোকো, কুইনিন প্রভৃতি নতুন ফসল দ্রব্যের আমদানির কথা আগেই পড়েছ। স্পেনের অধিকৃত অঞ্চলে যে সব মূল্যবান্ সোনা রূপার খনি ছিল, তা থেকে প্রচুর মুদ্রা তৈরি হত। তার ফলাফল য়ুরোপের আর্থিক বাজারে দেখা গেল। জিনিস পত্রের দাম চড়ল, আর বেতন-মজুরির হারও বেড়ে গেল।

বাণিজ্য প্রথা : এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ ভাবে বলতে হবে। বিজিত নতুন দেশগুলিতে উপনিবেশ স্থাপিত হলে সেখানে শোষণ আর দমন-নীতি চলতে থাকে। ঐ সব দেশের কাঁচা মাল ও নানা রকম প্রয়োজনীয় রসদ নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য নিয়ে আসা হত এবং তা থেকে পণ্য দ্রব্য তৈরি করে ব্যবসা চালানো হত। মনিব-দেশের এই ব্যবসায়-নীতিকে বলা হয় **মার্কেন্‌টাইল সিস্টেম**, অর্থাৎ **বাণিজ্য-তন্ত্র** যার আসল মানে হল উপনিবেশগুলিকে যথেচ্ছ দোহন ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করা। এক কথায় শোষণ। পোর্তুগাল ও স্পেন উভয়েই স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও লুণ্ঠন চালিয়েছিল। সব চেয়ে লজ্জা ও ঘৃণার ব্যাপার ছিল তাদের ক্রীতদাস-ব্যবসা। আফ্রিকা থেকে সমানে নিগ্রো চালান দিয়ে স্পেন-পোর্তুগালের মালিকরা অমানুষিক অত্যাচারে তাদের বেগার খাটিয়ে নিত। সস্তায় কিংবা বিনা মজুরিতে তাদের খনির কাজে ও চিনির খামারে লাগিয়ে যে সব জিনিস উৎপন্ন হত, তা থেকে তারা বিস্তর লাভ করত। এর ফলে '**ওয়েস্ট ইণ্ডিজ**' দ্বীপগুলিতে আদিবাসীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্পেন ও পোর্তুগাল হীনবল হয়ে পড়লে হল্যাণ্ডের **ওলন্দাজ**, **ফরাসী** ও **ইংরেজ** বণিকদল কোম্পানি খুলে লাভজনক ব্যবসা শুরু করে দেয়। বাণিজ্যতন্ত্র পুরোপুরি চালু হল এবং দুই শতাব্দী ধরে শ্বেতকায় জাতিরা উপনিবেশ-সাম্রাজ্য গড়ে তুলল পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংলণ্ড টিকে রইল। ঐ দুই দেশের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার লড়াই চলেছিল প্রায় দুশো বছর। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইংরেজরাই নৌ-শক্তির বলে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে দাঁড়াল।

ভৌগোলিক অভিযানের সূত্রপাত, তার গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল বিশদভাবে বুঝিয়ে

দেওয়া গেল। এখন একটি সুফলের কথা বলছি। **আজটেক্ ও ইনকা**, এই দুই প্রাচীন জাতির সভ্যতা আজ বিলুপ্ত। 'আজটেক্দের সভ্যতা' যা **'মায়া সভ্যতা'** নামে অভিহিত হয়, এবং 'ইনকা'দের সভ্যতারও যে সব ধ্বংস-চিহ্ন ছিল, তা দেখে ষোল শতকের বিজেতার দল অবাক্ হয়ে যায়। তাদের প্রত্যক্ষ দেখার ফলে বর্তমান কালের মানুষ ঐ বিস্মৃত সভ্যতা দুটির পরিচয় ও জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা বাণিজ্যের একটা নতুন প্রথার চলন দেখা গেল। দেশ-বিদেশে বাণিজ্যতরী পাঠিয়ে বণিকরা যে অর্থ সঞ্চয় করত, তাদের অনেকে ঘরে বসে কোনও ঝুঁকি না নিয়েই সেই মূলধন খাটাতে লাগল জাহাজ ও নাবিক জুগিয়ে। অভিযান ফেরৎ এলে তারা লাভের মোটা অংশ আদায় করত। এই জন্য তাদের বলা হত 'ঘুমন্ত বা নিষ্কর্মা অংশীদার'। রেনেশাঁসের ফলাফল বিচার করে দেখা যায় যে এ যুগের শিল্পী সাহিত্যিক জ্ঞানী গুণী বণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী—সকলেই লাভবান হয়েছিল। কেবল দরিদ্র জন-সাধারণ তেমন কিছুই পেল না। উৎখাত কৃষক, বেকার শ্রমিক আর ভবঘুরের দল সংখ্যায় বাড়তে থাকল।

এক নজরে

* পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেশাঁসের প্রভাবে নতুনকে জানবার আগ্রহ থেকে ইউরোপীয় নাবিকরা নতুন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করে।
* মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে মানুষের মন প্রাচ্য দেশগুলিকে চেনবার জন উৎসুক হয়েছিল। অজানা উন্মুক্ত সমুদ্রপথে অভিযান করার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম, যথা, চুম্বক শক্তিসম্পন্ন নাবিকদের কম্পাস অ্যাস্ট্রোলেব, সেকস্‌ট্যান্ট প্রভৃতি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় সমুদ্রযাত্রা সহজ হয়।
* য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির সমুদ্র অভিযানের ফলে আবিষ্কৃত নতুন পৃথিবীর সীমা বহুলাংশ বিস্তৃত হয়েছিল।
* দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগাল ও স্পেন ছিল অগ্রণী। পরবর্তী কালে অন্যান্য দেশের মানুষ সামুদ্রিক অভিযানে আগ্রহী হয়।
* পর্তুগীজ অভিযাত্রীদের মধ্যে বারথেলোমিউ ডিয়াজই প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করেন। এর বার বছর পরে ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে কালিকট নগরে উপস্থিত হন। আলবুকার্ক প্রাচ্য দেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
* ভৌগোলিক আবিষ্কার বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা করেছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কম্পাস কাকে বলে ? * অ্যাস্ট্রোলেব কি ? * জলপথে নতুন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টায় কারা অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল ? * পর্তুগীজদের সামুদ্রিক অভিযানে কে প্রথম প্রেরণা দিয়েছিলেন ? * বারথেলোমিউ ডিয়াজ কে ছিলেন ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করেন ? * ভাস্কো-দা-গামা কে ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন ? * প্রাচ্য দেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? প্রাচ্য দেশে পর্তুগীজ সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ? * কেব্রাল কে ছিলেন ? * কোন পর্তুগীজ নাবিক সমুদ্রপথে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন ? * কলম্বাস কে ছিলেন ? তিনি কোন কোন দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন ? * কনকুইস্টেডোর কাদের বলা হয় ? এদের কয়েকজনের নাম কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। রেনেশাঁসের সঙ্গে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সম্পর্ক কি ?
২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল ?
৩। কোন কোন আবিষ্কৃত জিনিস সমুদ্রযাত্রায় নাবিকদের সাহায্য করেছিল ?
৪। পর্তুগীজ নাবিকরা কার কাছ থেকে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছিলেন ? তাঁর জীবনকালে এবং মৃত্যুর পর কয়টি অভিযান হয়েছিল ?
৫। কলম্বাস কোন জায়গায় প্রথমে পৌঁছেছিলেন ? তিনি কয়বার সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন ?
৬। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। ম্যাগেলানের কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৮। কর্তেজ ও বালবোয়া কোন অঞ্চল আবিষ্কার করেন ?
৯। মার্কেনটাইল সিস্টেম কাকে বলে ? এর কার্যকারিতা বর্ণনা কর।
১০। মায়া সভ্যতা কাদের সৃষ্টি ? সে সভ্যতার কি কি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে ?
১১। স্পেন ও পর্তুগালের পর কোন কোন য়ুরোপীয় জাতি উপনিবেশ বিস্তার করে ? তাদের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী হলো কারা ?
১২। ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যকেন্দ্র কেন ও কিভাবে পশ্চিমসাগরের উপকূলে চলে গেল ?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে নাবিকদের উদ্যোগে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের কারণ কি ?
২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে পর্তুগাল ও স্পেন কি ভূমিকা নিয়েছিল ? ঐ দুই দেশের উদ্যোগে ভৌগোলিক আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত কর।
৪। য়ুরোপে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের ফল কি হয়েছিল ?

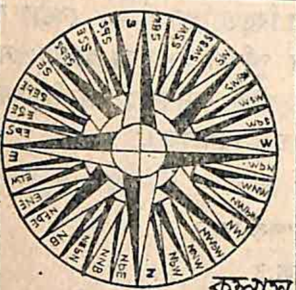
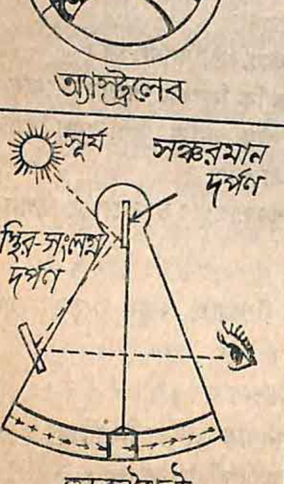
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] **সংশোধন কর ঃ**

(ক) কলম্বস ছিলেন পর্তুগালের শ্রেষ্ঠ নাবিক। (খ) 'নাবিক হেনরি' ইটালি রাজবংশীয় পুরুষ। (গ) বালবোয়া মেক্সিকো দেশ জয় করেন। (ঘ) কর্তেজ প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর দেখতে পান। (ঙ) দিয়াজ জলপথে সারা পৃথিবী ঘুরে আসেন।

ব্যবহারিক অনুশীলনী

[এক] নিচের দিক্ নির্ণয়ের যন্ত্রগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখে রাখ ঃ

 কম্পাস	ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ এই যন্ত্রটির সাহায্যে সমুদ্রবক্ষে দিক নির্ণয় করা হয়।
 অ্যাস্ট্রলেব	ব্যবহারিক প্রয়োগঃ এই যন্ত্র সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়।
 সেকট্যান্ট	ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ ভূ পৃষ্ঠ থেকে গ্রহ নক্ষত্রাদির কৌনিক উচ্চতা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। এর সাহায্যে কোন জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর দিঙ্‌মণ্ডলের কত ডিগ্রী ঊর্ধে অবস্থিত রাত্রে তার পরিমাণ যে কোন সময়ে সহজে মাপা যায়।

[দুই] নিচের ছকের বাঁ-দিকে কয়েকজন নাবিকের ছবি দেয়া হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে ডানদিকের শূন্যস্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

 হেনরি দ্য নেভিগেটর	টীকা ঃ --
 ভাস্কো-ডা-গামা	টীকা ঃ --
 ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান	টীকা ঃ --
 আলবুকার্ক	টীকা ঃ --

৪ রিফর্মেশন য়ুরোপে ধর্মীয় আন্দোলন



সূচনা : য়ুরোপে পোপ ও চার্চ' এর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয় ষোল শতকের গোড়ায়, তাকে ধর্মীয় বিপ্লবই বলা চলে। কারণ, তার ফলে এমন এক নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন হল, যা পোপের শাসন আর মধ্যযুগীয় চার্চের প্রাধান্যের মূলে কুঠারঘাত করল। পোপ যে ভাবে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন, বড় বড় অ্যাবট, বিশপরা যে রকম পার্থিব সুখ-সম্পদ ভোগ করতেন, সেই অধার্মিক জীবনযাত্রা এখন কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হল। রেনেশাঁস যে ভাবে নতুন চিন্তা ও ধারণার বীজ ছড়িয়ে দিল, তার অনিবার্য প্রভাব পড়েছিল সমাজে, রাজনীতিতে এবং ধর্মবিশ্বাসে। তাই জ্ঞান-চর্চা, মুদ্রা যন্ত্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ও বিবেকবুদ্ধি দিয়ে বিচার করার ইচ্ছা একদিকে যুক্তিবাদ অপর দিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবি সৃষ্টি করলো। প্রচলিত সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে তখন মনে প্রশ্ন উঠল, সমালোচনার প্রবৃত্তি জাগল, ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীন মতামতের দাবি জন্মাল। তাই বলা যায়, রেনেশাঁস থেকেই রিফর্মেশনের জন্ম। এখন জানতে হবে, কি কি কারণে 'রিফর্মেশন' এল, ধর্ম-সংস্কারের জন্য বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হল।

উৎপত্তির কারণ : প্রথমেই দেখা যায় মধ্যযুগের চার্চ ছিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। সকল খৃস্টান এর অধীন ও অন্তর্ভূক্ত। সকলেই পোপ ও তাঁর নির্দেশ অনুশাসন মেনে চলত। ক্যাথলিক ধর্মে তাই সকল জাতির সমান স্থান ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয় ভাবসম্পন্ন এক একটি রাষ্ট্র নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য চাইল এবং ধর্মজগতের একক গুরু পোপের চরম কর্তৃত্বকে গ্রাহ্য করল না। বিভিন্ন দেশের রাজারা পোপের যথেচ্ছ ব্যবহারে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলেন। পোপের বিরাগভাজন হলে সেই রাজাকে জাতিচ্যুত বা একঘরে করা হত। রাজসভায় পোপের প্রতিনিধি থাকতেন যিনি পোপের দাবি পেশ করতেন এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। এ ছাড়া, আরও কয়েকটি কারণ ছিল যেমন উচ্চপদস্থ যাজক-সম্প্রদায়ের অনেকেই ব্রহ্মচারী সাধু-পুরুষ ছিলেন না, তাঁদের জীবনে ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য এবং পাপ আচরণ দেখা যেত। **সিজার বোর্জিয়ার** মতন কোনও কোনও পোপের জীবন কলুষিত ছিল। তাঁরা অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতেন, রাজাদের শাস্তি দেবার ভয় দেখিয়ে পোপের খাজনা দাবি ও আদায় করে নিতেন। চার্চের বড় পদগুলি (আর্চবিশপ, কার্ডিনাল প্রভৃতি) পোপেরা মোটা অর্থের বিনিময়ে বিক্রী করতেন। শুধু তাই নয়, ধর্মের মাহাত্ম্য ভাঙ্গিয়ে রীতিমত অনাচার চলত। কোনও রাজা বা বড় মানুষ কিছু অন্যায় বা দোষ করলে পোপের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হত। পোপ সেই ক্ষমা দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করে দোষীকে রেহাই

দিতেন কিন্তু প্রচুর অর্থের বদলে। এই রকম বিশেষ পাত্র বুঝে যে প্রশ্রয় দেওয়া হত (ইন্ডালজেন্স) তাকে উৎকোচ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এ দিকে রাজ্যের শাসকরা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। পাদরিরা রাজকীয় বিচারের অধীন ছিল না। শাস্তি-স্বরূপ জরিমানাও দিত না। আর চার্চের ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি করমুক্ত ছিল যদিও হিসাব করে দেখা গেছে, ঐ সময়ে য়ুরোপের যাবতীয় অর্থসম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল তাদেরই দখলে। মোট কথা, ধর্মের নামে অরাজকতা ও ব্যাপক দুর্নীতি চলছিল।

এই সব দেখে শুনে অনেক ভক্তিমান খৃস্টানদের মনে রীতিমত সংশয় জাগল। তাঁরা ভাবলেন সত্যই কি ধর্মের এই রূপ! মৌলিক গ্রন্থ পড়ে ধর্মতত্ত্বের অনেক খুঁটিনাটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাঁরা সাব্যস্ত করলেন এবং অজ্ঞতা ও কুসংস্কারগুলি প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন। পাদরিরা দোষ পাপ করলে তাদের বিচার হত ধর্মীয় আদালতে, শাস্তি হত নির্জনে অনুতাপ! এ দিকে দেশ শাসনের খরচ বাড়তে থাকায় করের বোঝা বাড়ল, সব চাপটা পড়ল সাধারণ মানুষের ওপর। কারণ যাজক-কুল কর থেকে মুক্ত। অগত্যা রাজারা অন্য পথ ধরলেন। চার্চের অনেক জমিজমা, সঞ্চিত ধনরত্ন সরকারী দখলে আনা হল, যেমন ইংলণ্ডে রাজা অষ্টম হেনরি মঠগুলি ভেঙ্গে উঠিয়ে দিয়ে তাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে রাজকোষ পূর্ণ করলেন।

মার্টিন লুথার ঃ ইটালি যেমন রেনেশাঁসের উৎসস্থল, জার্মানিও তেমনি এই নতুন ধর্মমতের জন্মভূমি। এই ধর্মমতকে বলা হয় **'প্রোটেস্ট্যাণ্ট'** মতবাদ। কেন বলা হয়, সে কথা পরে বলছি। ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য ও পোপের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম রুখে দাঁড়ালেন অসীম সাহস নিয়ে, তিনিই আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার (১৪৮০-১৫৪৬)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে, কিছুদিন মঠে বাস করেন, তারপর **উইটেনবার্গ** বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। এর মাঝে তিনি রোম ঘুরে আসেন কিন্তু সেখানে ধর্মের অব্যবস্থা দেখে খুব হতাশ হয়ে ফিরলেন। ক্রমে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে পুরোহিত-প্রধান সমাজে ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় আচার-সর্বস্ব। মন্ত্রপাঠ আর ক্রিয়াকলাপ করে মুক্তি পাওয়া যায় না। বিশ্বাসই একমাত্র মুক্তির পথ। ইটালিতে যখন ধর্মের সত্য রূপ ছেড়ে ধর্মের নামে ছেলেখেলা চলছিল, জার্মানির ভিতরকার অবস্থাও তেমনি অবনতির পথে নামছিল। দেশের মধ্যে তখন দুই তিন শো ছোট বড় রাষ্ট্র কয়েকটি বিশপদের এলাকা, অনেকগুলি সামন্ত রাজ্য আর কয়েকটি স্বাধীন নগর। জার্মানি এই ভাবে বিভক্ত ছিল। জার্মানির রাজন্যদল সম্রাটের প্রভুত্বের দাবি মানতে নারাজ, আর দুর্দান্ত সামন্তবর্গ তখন পরস্পর কলহে আর ঘরোয়া যুদ্ধে লিপ্ত। অধিকাংশ কৃষক ছিল ভূমিদাস, নিষ্ঠুর অত্যাচারে পীড়িত। ধর্মীয় ব্যাপারেও যথেষ্ট অসন্তোষ জমা হচ্ছিল। পোপের অযথা হস্তক্ষেপ এবং চার্চের ভিতরে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারে জাতীয় প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে মার্টিন লুথারের আবির্ভাব।

রিফর্মেশনের পূর্বাভাস

জন ওয়াইক্লিফ ঃ কিন্তু লুথারের পূর্বেও প্রচলিত ধর্ম আচরণের রীতি-নীতির কড়া

সমালোচনা, এবং বিদ্রোহী মনোভাবের নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে মধ্যযুগের শেষ ভাগে দুই কবি, **ল্যাংল্যাণ্ড ও চসারের** কাব্যে সে যুগের নৈতিক অবনতির চিত্র আছে। ল্যাংল্যাণ্ড পীড়িত দরিদ্রের কথা লিখেছেন, দেখিয়েছেন বিশপ ও যাজকের দল নিজেদের বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থেকে সাধারণ মানুষকে প্রবঞ্চনা করে থাকে। অক্সফোর্ডের উচ্চ শিক্ষিত **জন ওয়াইক্লিফ্** কিন্তু আরও প্রকাশ্য ভাবে পুরোহিত-শ্রেণীর নিন্দা করেছেন এবং ইংলণ্ডের পোপের ট্যাক্স তোলার অধিকার নেই—এ কথা অকুণ্ঠভাবে ঘোষণা করেন। দরিদ্র কৃষকদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল, প্রবল বিরাগ ছিল ধনী ও ধর্ম নেতাদের উপর। তাঁর সংগঠিত অনুচর দলের নাম ছিল '**ললার্ডস**'। এরা ছিল সরল পাদরি ঘুরে ঘুরে মানুষদের কাছে প্রকৃত ধর্মভাব কি তা বুঝিয়ে দিত। এর জন্য তারা যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করে। ওয়াইক্লিফ্ ল্যাটিন ছেড়ে ইংরেজিতে বাইবেল অনুবাদ করেন। চার্চের গোড়া সমর্থকরা, পোপকে আক্রমণ করার জন্য, তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পনেরো শতকে সমাজ ও ধর্মব্যবস্থার সংস্কার চেয়ে তিনি যে প্রতিবাদ-আন্দোলন সৃষ্টি করেন, সে জন্য তাঁকে রিফর্মেশনের 'ভোরের তারা' (morning star) আখ্যা দেওয়া হয়।

জন হাস্ ঃ ওয়াইক্লিফের চেয়ে আরও সক্রিয় আন্দোলন চালিয়েছিলেন **জন হাস্** (Huss)। তিনি খোলাখুলি যাজক শ্রেণীকে আক্রমণ করেন। প্রকাশ্যভাবে বলতে থাকেন তারা আধ্যাত্মিক জীবনে যে কর্তৃত্ব ফলায় বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান দেখিয়ে লোক ঠকায়, এবং কর দেওয়া থেকে ছাড় পায়, তার কোনও যুক্তি প্রমাণ নেই বাইবেলে ; ললার্ডদের মধ্যে অনেকে ইংলণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়ে বোহিমিয়া (বর্তমান চেকো-স্লাভাকিয়া) রাজ্যে আশ্রয় নেয় এবং সেখানকার '**হাসাইট**' আন্দোলনকে সম্ভবতঃ প্রভাবিত করে। যাইহোক, জন হাস্, ওয়াইক্লিফ্ ও তাঁর 'ললার্ডদের' চেয়ে আরও চরমপন্থী ছিলেন। তিনি চার্চের আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন। এমন কি, বলেছিলেন চার্চের ও রাষ্ট্রের যে সব কর্তা পাপের মধ্যে থেকে খৃস্টের পবিত্র নির্দেশ কলঙ্কিত করে তাদের কোনও শাসন-অধিকার নেই। এই থেকে বোঝা যায়, হাস এর মতামত ছিল আধুনিক যুগের মতো। যাই হোক, ইংলণ্ডে ওয়াইক্লিফ্ আর প্রাগ শহরে জন হাস্ 'রিফর্মেশন'-এর এক শো বছর আগে তার পূর্ব ভূমিকা রচনা করেন যান। তাঁদের প্রভাব খুব সম্ভব মার্টিন লুথারের ওপর পড়েছিল। পণ্ডিতরা মনে করেন, ওয়াইক্লিফ্ ও হাস্-এর শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে য়ুরোপে কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়।

রিফর্মেশনের প্রসার ঃ

জার্মানিতে ঃ মার্টিন লুথার ও তাঁর দুই পূর্বসূরী ওয়াইক্লিফ্ ও হাস্, কেউই বিধর্মী বা নাস্তিক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত খৃস্টান। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র খৃস্টধর্মের নামে যে সব সঙ্কীর্ণতা অজ্ঞতা ও সংস্কারের দাসত্ব চলছিল, সেগুলি সমূলে উৎপাটন করা। এখন লুথারের নেতৃত্বে 'রিফর্মেশন জার্মানিতে কেমন করে প্রসারিত হল, সেই কথায় ফিরে আসি। ধর্ম-বিপ্লবের পথে প্রথম পদক্ষেপ শুরু হল যখন ১৫১৭ খৃস্টাব্দে পোপের অর্থ প্রয়োজন মেটাতে তাঁর প্রতিনিধি টেৎসেল

'**ইনড্যলজেন্স**' (প্রশ্রয় দান পত্র) বিক্রী করতে লাগলেন। এ দেখে লুথার উইটেনবার্গ গির্জার দরজায় তাঁর বিখ্যাত **৯৫টি থীসিস** অর্থাৎ প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি এঁটে দিলেন। পোপ ক্রুদ্ধ হয়ে লুথারের বিরুদ্ধে ডিক্রী (Bull) জারি করলে লুথার প্রকাশ্যে সেটি পুড়িয়ে দিলেন এবং জার্মানির সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের উদ্দেশ্যে এক নিবন্ধ লিখলেন পোপের প্রাধান্য এবং ধর্মীয় ক্রিয়া-পদ্ধতিকে আক্রমণ করে (১৫২০)। এর পর **ওয়ার্মস্ সভার** (Diet of Worms) অধিবেশনে তিনি যখন তাঁর বক্তব্য ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করলেন, তখন সারা দেশে উত্তেজনার আগুন ছড়িয়ে পড়ল। সম্রাট পঞ্চম চার্লস-এর সামনে এই সভায় লুথার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পোপও তাঁর কাউন্সিল যা বলেন ও করেন, আমার বিশ্বাস তার বিপরীত। লুথারকে জাতিচ্যুত করা হল ধর্মবিরোধী বলে। স্যাক্সনি দেশের শাসক তাঁকে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখলেন। সেখানে বসে লুথার জার্মান ভাষায় 'নিউ টেস্টামেণ্ট', (খৃস্টের জন্ম থেকে আরম্ভ বাইবেলের দ্বিতীয় অংশ) অনুবাদ করতে লাগলেন। 'ওয়ার্মস্ সভা'র এই অধিবেশনে কেবল জার্মানির নয় বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখন থেকে মার্টিন লুথার পোপ ও সনাতন চার্চ থেকে বিছিন্ন হলেন। আর জার্মানি দুটি শত্রু-শিবিরে বিভক্ত হল। এক দিকে ক্যাথলিক দল, অপর পক্ষে স্যাক্সনির নেতৃত্বে লীগ বা জোট যারা লুথারের মতবাদ গ্রহণ করল। সম্রাট চার্লস যখন একটি ধর্মমত সমভাবে সকলের ওপর চাপাতে চেষ্টা করলেন, তখন লুথারের অনুগামী রাজন্যদল তীব্র প্রতিবাদ (protest) করলেন। তাই থেকে তাঁরা **প্রোটেস্ট্যাণ্ট** নামে পরিচিত হলেন। ১৫৩২ সালে যখন **অগস্‌বার্গে** লুথারের মতবাদ স্পষ্টভাবে বিবৃত হল, তখন থেকে উত্তর জার্মানিতে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত সুপ্রতিষ্ঠিত হল। দক্ষিণ জার্মানিতে ছিল ক্যাথলিক প্রাধান্য।

হল্যাণ্ডে ঃ জার্মানি থেকে রিফর্মেশন ক্রমে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হল। হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড এবং নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক—এই ছয়টি দেশ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করল। ব্রিটিশ রাজ্যে ও হল্যাণ্ড দেশে জাতীয় চেতনা ছিল প্রখর। পোপ এবং পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব এবং হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করেনি। হল্যাণ্ড তো স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়েছিল সম্রাট চার্লস ও তাঁর পুত্র, স্পেন-রাজ দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে। জয়লাভের পর হল্যাণ্ডে গণতান্ত্রিক শাসন (Dutch Republic) প্রতিষ্ঠিত হল। জার্মানি থেকে ধর্মবিপ্লবের ঢেউ পৌঁছাল **সুইটজারল্যাণ্ডে**। সেখানে প্রথম দিকে জুইংলি (Zwingli) ছিলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট নেতা। ক্যাথলিকদেয় সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর সেখানে নেতৃত্ব দিলেন **জন ক্যালভিন** (John Calvin)। জাতে ফরাসী, কিন্তু প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ওপর নির্যাতন এড়িয়ে তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান এবং জেনিভাতে তাঁর কর্মস্থল করে নেন। ধর্মমতে তিনি লুথারের চেয়েও প্রগতিশীল। তাঁর চরম মতবাদ এবং কঠোর শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তাঁকে 'প্রোটেস্ট্যাণ্টিজম'-এর পোপ এরং ডিক্টেটর (একনায়ক) বলা হত। ক্যালভিন ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংগঠনের দিক থেকে গণতান্ত্রিক। তাই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে ক্যালভিনের মতবাদের সমাদর হয়েছিল।

২৪/৪

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ঃ ফ্রান্সে রিফর্মেশন তেমন কৃতকার্য হয়নি, জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়নি। এর প্রধান কারণ ফ্রান্স প্রধানতঃ ক্যাথলিক দেশ এবং সনাতন রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুগামী। তবে উত্তর-পূর্ব দিকে অল্প সংখ্যক প্রোটেস্ট্যাণ্ট ছিল, তাদের নাম **হিউগেনো** (Huguenot)। ওদিকে হল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতই জয়ী হয়। নানা উৎপীড়ন সত্ত্বেও ঐ দেশ ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেনি। ইংলণ্ডে রিফর্মেশন এল রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে। উপলক্ষ হল একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। হেনরি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলেন কারণ তিনি অ্যানবোলেনকে (এলিজাবেথের মা) বিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিচ্ছেদের জন্য পোপের অনুমতি প্রার্থনা করে প্রতিনিধি পাঠিয়েও তাঁর মনস্কাম সিদ্ধ হল না। তাই পোপের অসম্মতি উপেক্ষা করে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। পোপ এই বিবাহ অসিদ্ধ বলাতে দুই পক্ষে বিবাদ ও সংঘর্ষ বাধল। তখন রাজা পোপের আনুগত্য অস্বীকার করে পার্লামেণ্ট ডেকে একটির পর একটি আইন পাস করিয়ে নিলেন। তবু হেনরি নিজে পুরোপুরি প্রোটেস্ট্যাণ্ট হননি যদিও ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের সঙ্গেই তাঁর সংঘর্ষ। যাইহোক ইংলণ্ড ক্যাথলিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হল। হেনরির ছেলে ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের সময়ে দেশ উগ্র প্রোটেস্ট্যাণ্ট হল। আবার তাঁর প্রথম কন্যা মেরীর (স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের স্ত্রী) রাজত্বকালে দেশে আবার ক্যাথলিক ধর্মের প্রাধান্য দেখা গেল। শেষপর্যন্ত রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত সরকারী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এলিজাবেথ যে ধর্মব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন সেটাই স্থায়ী হল। তিনি নিজে দুটির মধ্যে কোন মতে বিশ্বাস করতেন ঠিক জানা যায় না। তবে নিজের ও দেশের স্বার্থে তাঁকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ইংলণ্ডে রিফর্মেশন ক্রমেই জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। যারা গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্ট তাদের নাম ছিল '**পিউরিটান**' আর স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বলা হত 'প্রেসবাইটারিয়ান'।

ধর্মবিপ্লবের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঃ ফলাফল বিচার করলে রেনেশাঁসকে যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যায়, ধর্মের ক্ষেত্রে রিফর্মেশনও সেই রকম ঐতিহাসিক ঘটনা। দুই আন্দোলনের মূল কথা একই। রেনেশাঁসের বৈশিষ্ট্য— জ্ঞানচর্চা, যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা। এক কথায় মনুষ্যত্ব। রিফর্মেশনের বৈশিষ্ট্যও তাই। লক্ষ্য স্বাধীন মতের প্রতিষ্ঠা, উন্নত ও পবিত্র জীবন যাপন। রেনেশাঁস যুগের বুদ্ধির অনুশীলন সার্থক ভাবে প্রয়োগ করা হল রিফর্মেশন যুগে। জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করা হল বিবেক ও বিশ্বাসকে। এখন ধর্মবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলগুলি উল্লেখ করছি।

প্রথমত মধ্যযুগে রাশিয়া ও বলকান দেশগুলি বাদে সমগ্র য়ুরোপ ছিল পোপের কর্তৃত্বাধীন। এখন উত্তর য়ুরোপের অনেক দেশ (যাদের উল্লেখ আগে করা হয়েছে) পোপের প্রভুত্ব না মেনে স্বাধীন হল ধর্মের ক্ষেত্রে। রোমের চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক একটি দেশ প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতে দীক্ষিত হল। ফলে য়ুরোপের উত্তর অঞ্চল হল প্রোটেস্ট্যাণ্ট, দক্ষিণ অংশে থেকে গেল রোমান ক্যাথলিক ধর্ম। এতে য়ুরোপ মোটামুটি

দু'ভাগে বিভক্ত হল। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ধর্মীয় যুদ্ধে পরিণত হল, চলেছিল প্রায় দশ বছর। একদিকে সম্রাট চার্লস অপর পক্ষে প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাষ্ট্রজোট। ১৫৫৫ সালে যুদ্ধ থামলে আগস্‌বার্গের সন্ধি দ্বারা একটা আপোস হল। পরে আবার যুদ্ধ হয়েছিল তিরিশ বছর ধরে। ১৬৪৮ সালে তার সমাপ্তি ঘটলে য়ুরোপে একটা শেষ নিষ্পত্তি হল। তবে বহুদেশে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌ভাব ছিল না। যেমন ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও পিউরিটান সম্প্রদায় মনে করত, ক্যাথলিকরা বিদেশীদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিঘ্নস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ রিফর্মেশনের একটি প্রত্যক্ষ ফল হল '**কাউণ্টার রিফর্মেশন**' নামে এক সংগঠন। রিফর্মেশনের বিপরীত এবং পাল্টা জবাব বলে এই সংস্থাটি ইতিহাসে ঐ নামে পরিচিত। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল, প্রোটেস্ট্যাণ্টদের দুর্বল করে দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করা। নতুন ধর্মমত যাতে কোনও ক্রমে বাড়তে না পারে এবং শক্তিশালী না হয়, সেই উদ্দেশ্যে কাউণ্টার রিফর্মেশন একটি বড় রকম জোট সৃষ্টি করে এবং বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে নানা উপায় অবলম্বন করে। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রসার রুখতে হলে আগে নিজের ঘর সামলানো দরকার অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মের মধ্যে যে সব আপত্তিকর প্রথা কুসংস্কার ও দুর্নীতি বেড়ে উঠেছিল সেগুলি বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্মযাজকদের জীবন পবিত্র ও উন্নত করার জন্য ভিতর থেকে চার্চের সংস্কার হল শ্রেষ্ঠ উপায়। আর সেই সঙ্গে পোপের দৈব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে ক্যাথলিক ধর্মের কয়েকটি নীতি ও নিয়ম কঠোর-ভাবে বেঁধে দেওয়া হল।

অপর এক পদ্ধতি হল নতুন ধর্মপন্থীদের মন ফেরানো ও সনাতন ধর্ম তাদের ফিরিয়ে আনা। প্রথমোক্ত উপায়ে অর্থাৎ সংস্কারের মাধ্যমে কিছু ভালো কাজ হয়েছিল। পাদরিদের মধ্যে অনেকে পবিত্র জীবন যাপন করে একটি উন্নত আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। এখন ক্যাথলিক ধর্মের মাহাত্ম প্রচারে যারা নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে **ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের** নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হবে। মধ্যযুগের সাধু সেণ্ট বার্ণাড, সেণ্ট ফ্রান্সিসের মতন তিনিও আত্মত্যাগী মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। সে জন্য তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার আখ্যা দেওয়া হয়। মিশনারী-দের উদ্যম ও দৃষ্টান্তে ক্যাথলিক চার্চের শক্তি ও খ্যাতি বৃদ্ধি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে '**জেস্যুইট সমাজের**' কথা বলা দরকার। এই 'Society of jesus'-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **ইগনেশিয়াস লয়োলা** (Ignatious Loyola)। গভীর আন্তরিক ধর্ম-বিশ্বাসে তিনি খ্রীস্টের বাণী প্রচারে ও খ্রীস্টধর্মের সেবায় মনপ্রাণ নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সেবকদল জেসুইট সম্প্রদায় নামে আখ্যাত। তাঁরা স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করেন। মানবের ও ঈশ্বরের সেবায় তাঁদের আদর্শ, কিন্তু ধর্ম আর রাজনীতি যখন জড়িত হয়ে পড়ে তখন আদর্শ ক্ষুন্ন হয়। পোপের



ফ্রান্সিস জেভিয়ার

সমর্থক ক্যাথলিক ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশীদার হওয়াতে, জেসুইট সম্প্রদায়ের কার্যকলাপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট রাজ্যগুলিতে অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে। বিশেষ করে, ইংলণ্ডে এলিজাবেথের আমলে রানীকে হত্যা করার কয়েকটি ষড়যন্ত্রে তাদের যোগসাজস আছে বলে ঘোর সন্দেহ জাগে। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং রানীর জীবন রক্ষার জন্য জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ ইংলণ্ডের মানুষ জেসুইটদের বিদেশী শত্রুজ্ঞানে বিতাড়িত করল। এই সূত্রে **'ইনকুইজিশন'** (Inquisition) নামে একটি নির্যাতন-রীতির উল্লেখ করি। ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদের বিচারের জন্য একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে সরাসরি রায় দেবার ব্যবস্থা ছিল। নির্যাতন পদ্ধতি ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর। দোষী বলে সাব্যস্ত হলে এবং নতুন ধর্মমত প্রত্যাহার না করলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। চারদিকে কাঠের রাশি সাজিয়ে বিধর্মীদের পুড়িয়ে মারা হত। স্পেন দেশে এই ইনকুইজিশন খুব জোরদার হয়েছিল। ইটালি, নেদারল্যাণ্ডস্ (ক্যাথলিক শাসনের অধীনে) এবং রোমেও এই নির্যাতন চালানো হয়। য়ুরোপে তিন'শ বছরের মধ্যে প্রায় তিরিশ হাজার ব্যক্তিকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল।



ইগনেশিয়াস লয়োলা

যখন দেখা গেল, ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার (যাকে বলা যায়, বিশুদ্ধিকরণ), মিশনারিদের ধর্মপ্রচার, জেসুইট সম্প্রদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা আর ইনকুইজিশনের পীড়ন ও দমন-নীতি ব্যর্থ হ'ল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের প্রসার বন্ধ করা গেল না, তখন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে শক্তির প্রয়োগ করলে কার্যসিদ্ধি হবে, এই সিদ্ধান্ত হল। কাউণ্টার-রিফর্মেশনের এটি শেষ কৌশল। ক্যাথলিক চার্চের মতে এটি জেহাদ, ধর্মেরই অঙ্গ। সনাতন ধর্মের রক্ষা করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু খাঁটি ক্যাথলিকরা মনে করেন, একে 'কাউণ্টার রিফর্মেশন' বলা উচিত নয়। কারণ, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের উত্থাপনের আগে থেকে ক্যাথলিক চার্চ 'রিফর্মেশন অর্থাৎ ধর্ম সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের উদ্দেশ্য আর কার্যকলাপ তাই প্রমাণ করে। তিনি কাউণ্টার রিফর্মেশনের সব চেয়ে বড় সমর্থক এবং সেই সংগঠনের এক বড় সদস্য। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতকে সম্পূর্ণ উৎখাত করা। তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত করছি ঃ "আমার সকল রাজ্য আর যদি শত-শত জীবন পেতাম তাও বরং হারাতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্মবিরোধীদের মাতব্বরি মেনে নিতে পারব না।" যাই হোক, কাউণ্টার রিফর্মেশন কেন্দ্র ছিল **ট্রেণ্ট সভা**। সেই সভায় সম্রাট চার্লস, পোপ ও ফিলিপ কার্যসূচীর নির্দেশ দিতেন, ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য বিস্তারের ব্যবস্থা নিতেন।

ডাচ বিদ্রোহ ঃ প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের ঘোর শত্রু ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডস-এ যে

অত্যাচার ও নির্যাতন চালান তার উল্লেখ আগে করা হয়েছে। কিন্তু নেদারল্যাণ্ডস-এর পরিচয় ও কিছু পূর্ব ইতিহাস জানা দরকার। এ দেশের মানুষেরা স্বাধীনতার জন্য বহু বছর ধরে (১৫৫৬-১৬৪৮) বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিল তার কাহিনী পৃথিবীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। 'নেদারল্যাণ্ডস' নিম্নভূমি দেশ। এর মধ্যে হল্যাণ্ডের উত্তর দিকটা বেশ নিচু, উত্তর সাগরের জল তার মধ্যে প্রবেশ করে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কোনও কোনও অংশ আরও নিচে বলে সেখানে প্রাচীরের মতো বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত। দেশের মধ্যে অনেক খাল। শত্রু আক্রমণ করলে অধিবাসীরা বাঁধের মুখ খুলে দিয়ে ঐ অঞ্চল জলমগ্ন করে দিত। এ দেশের লোক পরিশ্রমী। ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশি। হল্যাণ্ড ছিল স্পেনের অধিকারে উত্তরের প্রদেশগুলি (ব্রাবাণ্ট, ফ্ল্যাণ্ডার্স, হল্যাণ্ড, জিল্যাণ্ড প্রভৃতি) একত্র যুক্ত হয়ে 'যুক্ত প্রদেশ' নামে পরিচিত হয়। এখন যে কারণে হল্যাণ্ডে বিদ্রোহ সুরু হয়, সে কথা বলছি।

এ দেশের শাসক সম্প্রদায় ছিল ক্যাথলিক। সম্রাট পঞ্চম চার্লস কেন্দ্র সরকারকে জোরদার করার জন্য নিজের, লোক দিয়ে প্রশাসন চালাতেন। আর ছিল **'স্টাটহোল্‌ডার'** (Stadtholder) সম্রাটের মনোনীত রাষ্ট্রপাল। চার্লস-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনের রাজা হয়ে নেদারল্যাণ্ডস্ শাসন করতে থাকেন। নতুন ধর্মমতের ঘোর শত্রু হিসাবে ইতিহাসে তাঁর পরিচয়। গোড়া থেকেই একজেদী নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য দেশের অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধল। তিনি তাঁদের 'ভিক্ষুক' (Beggars) নাম দিয়ে অবজ্ঞা করতেন। যাই হোক, (**উইলিয়াম প্রিন্স অব্ অরেঞ্জ**-এর নেতৃত্বে তাঁরা **'ইনকুইজিশন'** এর নির্যাতন এবং ফিলিপের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করতে ঐক্যবদ্ধ হলেন। গোঁড়া প্রোটেস্ট্যাণ্টরা অনেকগুলি ক্যাথলিক গির্জা ধ্বংস করে দিলে ফিলিপ সুযোগ পেয়ে গেলেন। ছয় বছরের মধ্যে রাজ প্রতিনিধি আলভা (Alva) প্রায় আঠার হাজার ব্যক্তিকে নিহত করলেন। এইবার উইলিয়াম অব অরেঞ্জ বংশানুক্রমে যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল পদে নির্বাচিত হয়ে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন (১৫৭২)। ফিলিপের সৈন্যবল আর নেদারল্যাণ্ডের জনমত ও গণশক্তির মধ্যে তুমুল লড়াই চলল। স্পেনের সৈন্যদল একদিকে শহরের পর শহর বিধ্বস্ত করতে থাকে, তেমনি উইলিয়মের নিপুণ পরিচালনায় ডাচ সৈনিকরা রাজশক্তিকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। অবশেষে দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশগুলি ক্যাথলিক থেকে ফিলিপের আনুগত্য স্বীকার করে নিল কিন্তু উত্তরে হল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রদেশগুলি সাধারণতন্ত্র রিপাবলিক প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হল। এই প্রচেষ্টা সার্থক হল ওয়েস্টফ্যালিয়া সন্ধির ফলে (১৬৪৮)। ডাচদের স্বাধীন রিপাবলিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল। পরে হল্যাণ্ড একটি স্বাধীন রাজ্য হয় এবং দক্ষিণ ভাগ (অস্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ডস) ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী বেলজিয়ম রাজ্য বলে অভিহিত হয়। স্বাধীনতার এই যুদ্ধে উইলিয়ম অব অরেঞ্জ যে ভূমিকা পালন করেন এবং দেশাত্মবোধে সমগ্র দেশকে উদ্দীপিত করেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কয়েকবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টার পর তাঁকে হত্যা করা হয় (১৫৮৪)। ফিলিপ নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "কিছু না করার চেয়ে বিলম্বে করাও

ভালো।" ডাচ বিপ্লবের সাফল্যের প্রধান কারণ হল অরেঞ্জ বংশের রাষ্ট্রনেতাদের সুদক্ষ নেতৃত্বে জন-সাধারণের অটল সঙ্কল্প ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এবং (রিফর্মেশনের প্রভাবে) নতুন ধর্মমতের প্রতি অবিচালিত নিষ্ঠা।

ইংলণ্ড ও স্পেন ঃ এইবার ইংলণ্ডের কথা বলি। নেদারল্যাণ্ডের পর ইংল্যাণ্ডে ছিল ফিলিপের লক্ষ্য যেহেতু ইংলণ্ড প্রোটেস্ট্যাণ্ট। এলিজাবেথ রানী হয়ে পিতার ধর্ম ব্যবস্থা থেকে আরও একটু এগিয়ে এসে ধর্ম-সমস্যার এমন সমাধান করলেন (Religious settlement) যাতে কোনও রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি না হয়। এই ধর্মব্যবস্থায় তাঁর ছোট ভাই ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের উগ্র প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ আর ভগ্নী মেরীর আরও উগ্র ক্যাথলিক প্রীতি বর্জন করে তিনি মধ্য পথ নিলেন। দেশে যে ধর্মমত অনুমোদিত হল, তাতে পোপের প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রইল না। তিনিই রাষ্ট্রের ও চার্চের সর্বময় কর্ত্রী। এখন কেন ও কিভাবে এবিজাবেথ কাউণ্টার রিফর্মেশনের মোকাবিলা করলেন বলছি।

এই সময় স্কটল্যাণ্ডের রানী ছিলেন **'মেরী'** (Marry Queen of Scots)। এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর আত্মীয় সম্পর্ক। প্রজাবর্গের আস্থা হারিয়ে তিনি স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি এলিজাবেথের কাছে কিছু কালের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। এলিজাবেথের রাজনীতি জ্ঞান ছিল প্রখর। তিনি ভেবে দেখলেন, মেরী তাঁর সিংহাসনের দাবীদার। ফ্রান্স তাঁর মিত্রপক্ষ এবং ক্যাথলিক রাজ্যগুলি তাঁকে সমর্থন করে। এ অবস্থায় তিনি মেরীকে আসতে দিলেন এবং অবিলম্বে টাওয়ার অব্ লণ্ডনে (কারাগার) তাঁকে আটক করে রাখলেন। এই সময় দেশে জেসুইটদের তৎপড়তা বাড়ছিল, চক্রান্ত চলছিল রানীর বিরুদ্ধে, মেরীর সঙ্গে ক্যাথলিকদের যোগ সাজস আছে আর ইংলণ্ডে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত, এই অভিযোগ তুলে এলিজাবেথ মেরীকে প্রাণদণ্ড দিলেন। এইভাবে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর নিধনে তাঁর পথের কাঁটা দূর হল আর ক্যাথলিক পার্টির ইন্ধন জোগান এবং কূটনীতির চাল বিফল হল।

আর্মাডা ঃ এইবার স্পেনের কথায় ফিরে আসি। দ্বিতীয় ফিলিপের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ, বহু বিস্তৃত তাঁর সাম্রাজ্য। বাণিজ্য ব্যাপারে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ক্রমেই বাড়ছিল। নেদারল্যাণ্ডসের মুক্তি আন্দোলনে এলিজাবেথ পরোক্ষ ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য দিতে থাকেন কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। ইতিমধ্যে কয়েকজন সাহসী ইংরেজ নাবিক স্পেনের জাহাজ ও বন্দর আক্রমণ করে ধনরত্ন লুঠ করে। কাজেই ফিলিপ ইংলণ্ডকে জব্দ করে সে দেশ থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধ পরিকর হলেন। কেউ কেউ বলেছেন, এলিজাবেথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নী, ভূতপূর্ব রানী মেরীর (ফিলিপের পত্নী) মৃত্যুর পর ফিলিপ এলিজাবেথের পাণি প্রার্থী হন যাতে ইংলণ্ড ও স্পেন এক হয়ে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এলিজাবেথ নাকি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় ফিলিপের আক্রোশ বাড়ে এবং ইংলণ্ডকে আক্রমণ করতে তিনি কৃতসংকল্প হন। বিরাট নৌ-বাহিনী **স্প্যানিশ আর্মাডা** সুসজ্জিত হয়ে বহু সৈন্য নিয়ে ইংলণ্ডের দিকে অগ্রসর হল। ফরাসী উপকুলের কাছে ইংরেজ জাহাজ পথ

রোধ করে প্রথম সংঘর্ষেই (পোর্টল্যাণ্ড) জয়ী হল। ইংরেজ নাবিক সৈন্যরা জাহাজ চালনায় আরও অভিজ্ঞ ছিল। ড্রেক, হকিন্স প্রভৃতি দক্ষ নেতারা স্পেনের নৌবাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দিলেন, জাহাজ থেকে নির্ভুলভাবে কামান গোলা বর্ষণ করে। স্পেনের অনেক জাহাজ আগুনে পুড়ল, পরে পালাতে গিয়ে ঝড়ে পড়ে আরও কিছু ডুবল। ইংরেজ যখন পিছু তাড়া করল, তখন অবশিষ্ট নৌবাহিনী (১৩২টির মধ্যে মাত্র ৫৩টি রণতরী) ঘুর পথে স্পেনের দিকে ফিরে গেল। শোচনীয় পরাজয়ে স্পেনের শুধু সৈন্য আর জাহাজ লোকসান হয়নি, ফিলিপের উচ্চাশা ও শক্তির দম্ভ ধূলিস্যাৎ হল। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডে ক্যাথলিক দলের শেষ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হল। এর পর থেকেই স্পেনের অধোগতি ও পতন আরম্ভ হয়।

ফলাফল ঃ কাউণ্টার রিফর্মেশনের ব্যর্থতায় লাভ হল ইংলণ্ডের ও হল্যাণ্ডের। স্বদেশকে স্পেনের আক্রমণের বিরুদ্ধে, কি প্রোটেস্ট্যাণ্ট কি ক্যাথলিক, সবাই রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল। এই সময়ে দেশে প্রবল জাতীয় ভাব উদ্দীপিত হয় এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিদেশী আক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন দেয়। তার ফলে জাতীর প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে এবং পরে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এখন স্পেনকে পরাস্ত করে ইংলণ্ড নৌবলে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হল এবং সমুদ্রপারে উপনিবেশ স্থাপনে অগ্রণী হল। আর স্পেনের অত্যাচার ও দমননীতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে হল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করল। এইভাবে রিফর্মেশন কোন কোন দেশে প্রসারিত হল এবং তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া য়ুরোপের ইতিহাস কি ভাবে দেখা গেল, অর্থাৎ নতুন ও পুরাতন. দুই ধর্মের আন্দোলনের প্রধান ঘটনাগুলি ও তাদের ফলাফল পাশাপাশি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হল।

এক নজরে

* রেনেশাঁসের প্রভাবে য়ুরোপে পোপ ও চার্চ-এর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাকে বলে ধর্মীয় আন্দোলন।
* ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে চতুর্দশ শতাব্দীতে জন ওয়াইক্লিফ ক্যাথলিক ধর্ম ও ধর্মাধিষ্ঠানের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাকে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের শুকতারা বলা হয়। ওয়াইক্লিফের শিষ্যরা লোলার্ড নামে পরিচিত ছিলেন।
* ওয়াইক্লিফের চেয়ে আরও শক্তিশালী আন্দোলন শুরু করেছিলেন বোহেমিয়ার জন হাস।
* ক্যাথলিক চার্চের প্রাধান্য ও পোপের সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মার্টিন লুথার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদ থেকেই তাঁর ধর্ম প্রতিবাদী বা প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম বলে পরিচিত হয়।

* জার্মানির উত্তরাংশ, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, নরওয়ে। সুইডেন ও ডেনমার্ক প্রভৃতি রাজ্যে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমত প্রচারিত হলো।
* লুথারপন্থীদের মত ক্যালভিন পন্থীরাও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।
* প্রোটেস্টাণ্ট বা প্রতিবাদী মতকে বাধা দান এবং চার্চের ঐক্যরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতি ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।
* প্রতি-ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে যারা ক্যাথলিক ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে নেমেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেণ্ট জেভিয়ার ও ইগনেশিয়াস লয়োলা ও তাঁর জেসুইট-সম্প্রদায়।
* প্রতিবাদী আন্দোলন দমন করতে গিয়ে স্পেনের রাজা দুর্দান্ত প্রতাপ দ্বিতীয় ফিলিপ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।
* স্পেন ইংলণ্ডের যুদ্ধে দ্বিতীয় ফিলিপ পরাজিত হয়েছিলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ে আর্মাডা নৌবহর ধ্বংস হওয়ায় ফিলিপের উচ্চাশা ও শক্তির দম্ভ ধূলিস্যাৎ হয়েছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* ধর্মবিপ্লব বা ধর্মসংস্কার কাকে বলে? * কিসের থেকে রিফর্মেশনের জন্ম হয়েছে? * পোপ কে ছিলেন? তিনি কোথায় বাস করতেন? * মার্টিন লুথার কে ছিলেন? • মার্টিন লুথার পেশায় কি ছিলেন? * জন ওয়াইক্লিফ কে ছিলেন? তিনি কি নামে পরিচিত ছিলেন? * ওয়াইক্লিফের শিষ্যরা কি নামে পরিচিত ছিলেন? * জন হাস কে ছিলেন? * ইনডালজেন্স বা প্রশ্রয় দানপত্র কাকে বলে? * ইনডানজেন্স বা প্রশ্রয় দানপত্র কারা বিক্রী করতেন? * উইটেনবার্গ গীর্জার দরজায় কে ৯৫টি থিসিস বা প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি এঁটে দিয়েছিলেন? * ইউরোপে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মমতের উৎপত্তি কি ভাবে হয়? * ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে খ্রীস্টান জগৎ কয়ভাগে ভাগ হয়ে যায়? * প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ক্যাথলিক কাদের বলা হতো? * সুইজারল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? * ক্যালভিন কে ছিলেন? * হিউগেনো কাদের বলা হতো? * কাউণ্টার রিফর্মেশন কাকে বলে? এদের লক্ষ্য কি ছিল? * ইগননেশিয়াস লয়োলা কে ছিলেন? তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের নাম কি? * ইনকুইজিশন কাকে বলে?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। য়ুরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল কেন?

২। ক্যাথলিক ধর্মে কি কি দোষ ত্রুটি দেখা গিয়েছিল?

৩। ক্যাথলিক চার্চে ইনডালজেন্স বা প্রশ্রয়দান পত্র বিক্রীর রীতি কি ভাবে প্রচলিত হয়েছিল ?

৪। ধর্ম-সংস্কারক হিসেবে জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাসের অবদান উল্লেখ কর।

৫। ধর্মসংস্কার আন্দোলন জার্মানিতে প্রথম শুরু হয়েছিল কেন ?

৬। মার্টিন লুথার কোথাকার লোক ? তিনি প্রশ্রয় দানপত্র বিক্রীর বিরুদ্ধে কিভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ?

৭। লুথারের ধর্মমতের মূল কথা কি ?

৮। লুথারের ধর্ম আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনা কর ?

৯। প্রতি-ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে জেসুইট সঙ্ঘের ভূমিকা কি ছিল ?

১০। ইনকুইজিশন কাকে বলে ? সেখানে কিসের বিচার হতো ? অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কি দণ্ড দেওয়া হতো ?

১১। জেসুইট সমাজ কে সংগঠন করেন ? তার উদ্দেশ্য ও নীতি কি ছিল ?

১২। নেদারল্যাণ্ডস্ কেন বিদ্রোহ করেছিল ? এই বিদ্রোহ কে পরিচালনা করেন ? এই মুক্তি সংগ্রামের ফলাফল কি হয়েছিল ?

১৩। স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী কি অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ? তাতে রানী এলিজাবেথের কি সুবিধা হলো ?

১৪। 'স্পানিশ আর্মাডা কি ? তার কি পরিণতি হয় ?

১৫। আর্মাডার পরাজয় কেন গুরুত্বপূর্ণ ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ইউরোপের ইতিহাসে ধর্মসংস্কার বলতে কি বুঝায় ? এই সংস্কারের প্রয়োজন ঘটেছিল কেন ?

২। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিক চার্চে প্রচলিত দুর্নীতি সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কারা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ? তাদের বক্তব্য কি ছিল।

৪। জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাস কে ? তাঁরা কি ভাবে ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ?

৫। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি ? কোন দেশে এই আন্দোলন শুরু হয় ?

৬। মার্টিন লুথার কে ছিলেন ? তিনি কি ভাবে ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন ?

৭। লুথারের ধর্ম আন্দোলনের ফলে ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে কি ভাবে সংস্কার আন্দোলন হয়েছিল তা আলোচনা কর ?

৮। কি কি উপায়ে প্রতি ধর্মসংস্কার আন্দোলনকে কার্যকর করা হয় ?

৯। জেসুইট সম্প্রদায় কি ভাবে ক্যাথলিক চার্চের প্রতি আবার মানুষের শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনে ?

১০। ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ?

১১। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ফিলিপের অভিযানের কাহিনী বিবৃত কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] **দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) ওয়াইক্লিফ-এর অনুগামীদের কি বলা হতো ?

(খ) মার্টিন লুথার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন ?

(গ) মার্টিন লুথার ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদপত্র বের করেছিলেন তার নাম কি ?

(ঘ) Society of Jesus বা জেসুইট অর্ডারের প্রতিষ্ঠাতা কে।

(ঙ) জন হাসকে কোন ধর্মসভায় ডেকে নিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ?

(চ) ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন ?

ব্যবহারিক অনুশীলন

[এক] নিচের রেখা মানচিত্রে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের সীমা দেখানো হয়েছে। রেখামানচিত্রে প্রদর্শিত সংকেতের সাহায্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্যগুলি চিহ্নিত কর ঃ



[দুই] নিচের বাঁদিকের চিত্রগুলি দেখ এবং এরা ধর্মসংস্কার আন্দোলনে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ডান দিকের শূন্যস্থানে অল্পকথায় লেখ ঃ



জন ওয়াইক্লিফ



জন হাস



মার্টিন লুথার



জন ক্যালভিন

৫



ইংলণ্ডে বিপ্লব (সপ্তদশ শতাব্দী)

মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা : ধর্মবিপ্লব আর রাষ্ট্রবিপ্লব, দুইয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইংলণ্ডের ও হল্যাণ্ডের ইতিহাস। ধর্ম-বিপ্লবের ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলিতে জাতীয়তা বোধের প্রকাশ দেখা যায়। ইংলণ্ডে ও হল্যাণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণী—বণিক্ ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হয়ে ওঠে এবং ক্রমে '**জাতীয় বুর্জোয়া**' শ্রেণীতে পরিণত হয়। রেনেশাঁস ও রিফর্মেশনের ফল স্বরূপ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্‌ভব য়ুরোপের ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এঁদের অনেকেই শিক্ষাপ্রাপ্ত, কেউ ব্যবসায়ে লিপ্ত, কেউ বা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। নতুন ধর্মমতে দীক্ষিত হয়ে এঁরা আধুনিক দৃষ্টি ও গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জন করেন। একদিকে যেমন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মতামতের দাবি, স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির প্রতিরোধ এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা, অপর দিকে তেমনি বাণিজ্যের দৌলতে প্রচুর অর্থাগম এবং সেই থেকে '**ক্যাপিটালিজম**' এর উদ্‌ভব অর্থাৎ পুঁজি বৃদ্ধি। এঁরা সকলেই প্রোটেস্ট্যান্ট, কেউ নরম কেউ চরমপন্থি। সতেরো শতকে ধর্মের রূপান্তর আর সমাজ ও অর্থনীতির রূপান্তর, এই দুটি বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়।

পিউরিটান সম্প্রদায় : ইংলণ্ডে এলিজাবেথের আমলে ধর্ম ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই অ্যাংলিকান চার্চের বিধিনিয়ম সব প্রোটেস্ট্যাণ্টের মনোমত ছিল না। সেইজন্য তাদের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় যেমন '**পিউরিটান**'। এরা গোঁড়া ধার্মিক। সংখ্যায় গরিষ্ঠ না হলেও তাদের সংগঠন দৃঢ় ছিল। টিউডর যুগে এদের ওপর নির্যাতন চলে, তাই অনেকে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করে। পিউরিটানদের মধ্যে অনেক দৃঢ় চরিত্রের মানুষ ছিল যারা নিজস্ব ধর্মমত ও নীতিজ্ঞান থেকে ভ্রষ্ট হয় নি, রাজরোষে পড়ে কারাবরণ করে, পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হয়ে রাজার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, শেষে বিদ্রোহী হয়ে রাজার দলকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয় এবং অত্যাচারী রাজার শিরচ্ছেদ করে। এই বিদ্রোহে পিউরিটানদের বড় ভূমিকা ছিল। নেতাদের মধ্যে অনেকেই পিউরিটান সম্প্রদায়ের। তাই এই রাষ্ট্রবিপ্লবকে '**পিউরিটান বিপ্লব**' বলা হয়।

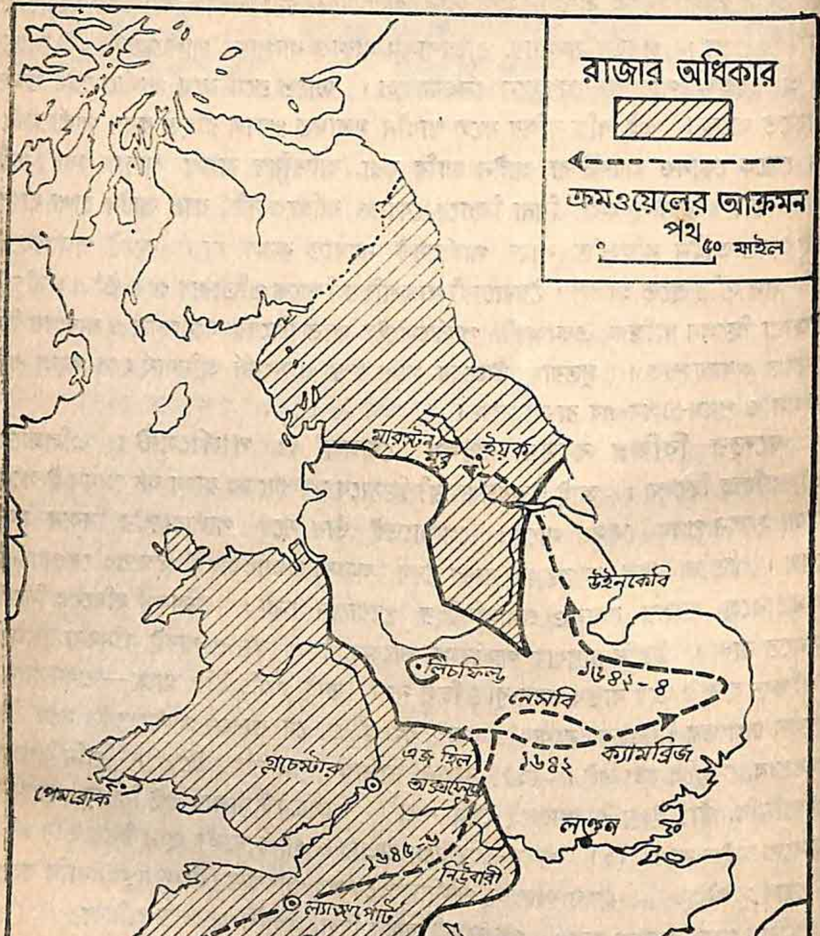
রাজা ও পার্লামেণ্ট : স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লস-এর সময় এই বিপ্লব ঘটে। রাজায় প্রজায় সংঘর্ষের প্রধান কারণ হল স্টুয়ার্ট রাজারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁদের আগে টিউডর যুগে অষ্টম হেনরি ও তাঁর কন্যা রানী এলিজাবেথ শাসন ব্যাপারে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দেন। কিন্তু বে-আইনীভাবে নয়। পার্লামেণ্টকে দিয়ে

আইন পাশ করাতেন নিজের সুবিধার জন্য। মোটের ওপর তাঁরা পার্লামেণ্টের সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত ব্যবহার করলেও পার্লামেণ্ট ডাকতেন ও তার সহযোগিতা চাইতেন। এর ফলে পার্লামেণ্টকে আহ্বান করে তার পরামর্শ নেওয়া একটি স্বাভাবিক বৈধ প্রথায় দাঁড়িয়ে গেল। গুরুতর সমস্যায়, রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে, পার্লামেণ্টের এই সাহায্য ও অংশ গ্রহণ পরোক্ষভাবে মেনে নেওয়া হল। তাতে ক্রমে ক্রমে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। এই শক্তি বৃদ্ধির ফলে স্বাধীন মতামত প্রকাশ রহিত করা, পার্লামেণ্টকে না ডেকে কোনও অ্যাকট বা আইন জারি করা, অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা, বিনা বিচারে কোনও ব্যক্তিকে দীর্ঘ কাল আটক রাখা রাজার এই সমস্ত আইন বহির্ভূত কাজ পার্লামেণ্ট বরদাস্ত করল না। ক্রমেই পার্লামেণ্টের প্রতিবাদ তীব্র হতে লাগল। স্বৈরাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠল। স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন দাম্ভিক, একজেদী, পার্লামেণ্টের প্রতি তাঁদের মনোভাব ও ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল প্রথম জেমস ও প্রথম-চার্লস-এর রাজত্বকালে।

দ্বন্দ্বের বিভিন্ন কারণ, প্রথম জেমস ও পার্লামেণ্ট : এলিজাবেথ অবিবাহিত ছিলেন। তাই উত্তরাধিকারী হিসাবে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস ইংলণ্ডের রাজা হলেন প্রথম জেমস নামে। গোড়াতেই তাঁর সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিবাদ বেধে গেল। তিনি মনে করতেন, রাজা দৈব ক্ষমতার অধিকারী, ঈশ্বরের দেওয়া এই ক্ষমতাবলে রাজার কোনও জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। প্রজাবর্গ মনিবের নির্দেশ মানতে বাধ্য। তিনি চারবার পার্লামেণ্ট ডাকেন, কিন্তু কোনও বারই বনিবনা হয়নি। শিক্ষিত হলেও তাঁর বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না। তাই একটি উক্তি আছে—'প্রথম জেমস হলেন জগতের বিজ্ঞতম নির্বোধ'। যাই হোক যে যে কারণে পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাব, সেগুলি হল এই। (১) রাজার বিশিষ্ট স্থান সবার ঊর্ধ্বে। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর ইচ্ছা ও আজ্ঞাই শেষ কথা। পার্লামেণ্ট রাজার এই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য মানতে চাইল না। (২) শাসন-প্রতিষ্ঠানে রাজার ও পার্লামেণ্টের স্থান নিয়ে তীব্র মত-বিরোধ সৃষ্টি হল। রাজা বললেন, পার্লামেণ্ট যে সব অধিকার (Privilege) দাবি করে সেগুলি রাজার অনুগ্রহ-দান। পার্লামেণ্ট জবাব দিল, এগুলি জন্মগত অধিকার। (৩) রাজা পার্লামেণ্টের সম্মতি না নিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন নানাভাবে শুল্ক কর বসিয়ে। পার্লামেণ্ট জানাল, তিনি তা করতে পারেন না।

প্রথম চার্লস ও পার্লামেণ্ট : জেমসের পুত্র প্রথম চার্লসের সময় উভয় পক্ষের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র ও ভীষণ হয়ে উঠল। চার্লস ছিলেন আরও উদ্ধত, প্রজামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যেতেন। তাঁর ক্যাথলিক প্রীতি পার্লামেণ্টের বিরাগ সৃষ্টি করল। এদিকে অর্থাভাবে রাজা নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন, যেমন বাধ্যতা-মূলক ঋণ, জাহাজ কর ইত্যাদি। ১৬২৮ সালে পার্লামেণ্ট রাজার নিকট অধিকার সংক্রান্ত আবেদন পেশ (Petition of Right) করল। কিন্তু তিনি সর্তগুলি লঙ্ঘন করতে থাকলেন। ১৬২৯ থেকে ১৬৪০ সাল, দীর্ঘ এগারো বছর চার্লস বিনা পার্লামেণ্টে

ব্যক্তিগত শাসন চালিয়ে গেলেন। ইতিহাসে এই সময়কে 'Eleven years Tyranny' বা এগারো বছরের **স্বৈরাচার শাসন** বলা হয়।



সহায় হলেন দু'জন, ওয়েন্টওয়ার্থ (Wentworth) ও প্রধান বিশপ লর্ড (Lard)। এঁরা রাজার স্বৈরাচার সমর্থন করে নানা অবৈধ কাজ করতে থাকেন। উভয়েই পার্লামেন্টে অভিযুক্ত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। দারুণ অর্থাভাবের জন্য চার্লস শেষ কালে পার্লামেন্ট ডাকতে বাধ্য হলেন। এরই নাম **লং বা দীর্ঘ পার্লামেন্ট** (১৬৪১)। কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হলো না। স্কটল্যাণ্ড বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আর ইংলণ্ডে পিউরিটান দলও ক্ষিপ্ত হল তাঁর অবৈধ শাসননীতির জন্য। এখন মূল প্রশ্ন হল রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা

কার হাতে ? পার্লামেণ্টের না রাজার হাতে ? এ সমস্যা সমাধানের জন্য **গৃহযুদ্ধ** (Civil war) শুরু হল। এক দিকে চার্লস ও তার স্থায়ী সেনাবাহিনী, অপর দিকে পার্লামেণ্ট ও তার সৈন্য দল। **ক্রমওয়েল** ছিলেন পার্লামেণ্ট সৈন্যের নেতা। প্রথম দিকে রাজার দল কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড-এর সাহায্যে পার্লামেণ্ট সৈন্য **মার্সটন মুর ও নেসবির** যুদ্ধে জয়লাভ করল। এর পর চার্লস স্কটল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তারা তখন পার্লামেণ্টের হাতে তাঁকে সমর্পণ করল। যখন দেখা গেল রাজা সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন, তখন সেনা নায়করা চার্লসের বিচারের আয়োজন করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল দেশদ্রোহিতা। বিচার শেষে রাজা দোষী সাব্যস্ত হলেন, দণ্ড হল শিরচ্ছেদ! চার্লসের ছিন্ন মস্তক দেখে ক্রমওয়েল নাকি বলেছিলেন, 'নিষ্ঠুর প্রয়োজন' !

কমনওয়েলথ ও প্রোটেকটরেট ঃ চার্লসের মৃত্যুর পর চরমপন্থী নেতাদের পরামর্শে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তার নাম **কমনওয়েলথ** বা প্রজাতন্ত্র। সৈন্যদলের নায়ক হিসাবে ক্রমওয়েলই প্রকৃত শাসক হলেন। পার্লামেণ্ট রাজতন্ত্র উঠিয়ে দিল, কিন্তু সৈন্যদলে বিভেদ বাড়ছিল এবং বাইরে থেকে বিপদের আশঙ্কাও কম ছিল না। ক্রমওয়েল দৃঢ় হাতে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের বিরোধ দমন করেন। একটি নতুন শাসনযন্ত্র দ্বারা (Instrument of Government ১৬৫৩) ক্রমওয়েল লর্ড প্রোটেক্টর (রক্ষক) পদে অধিষ্ঠিত হলেন। ক্রমওয়েল তার সফল বৈদেশিক নীতির জন্য আরও বিখ্যাত। ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ, স্পেনের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে সাফল্য ও জ্যামাইকা অধিকার করে ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডের মান মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। ক্রমওয়েলের বড় কৃতিত্ব যে স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডকে তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে এক এক শাসনের মধ্যে নিয়ে আসেন। ক্রমওয়েলকে রাজা হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ঐ পদে অধিষ্ঠিত হলেন কিন্তু পিতার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাই সেনাপতিরা পরিস্থিতি জনমত বুঝে প্রথম চার্লসের পুত্র **দ্বিতীয় চার্লসকে** আহ্বান করলেন সিংহাসনে বসার জন্য। তিনি ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি নিয়মতন্ত্র অমান্য করবেন না।

'রেস্টোরেশন' ঃ পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ ১৬৬০ সালে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। একেই বলা হয় রেস্টোরেশন।' এর ফলে শুধু রাজা নয়, পার্লামেণ্টও আবার ফিরে এল পরিচিত রূপে (যে **লং পার্লামেণ্ট** এতদিন মুলতুবি ছিল)। পার্লামেণ্টের সনাতন অধিকারগুলিও স্বীকৃত হল এবং তার শক্তিও বাড়ল। ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল, আর প্রমাণিত হল, শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টের স্থান সকলের উপরে ও রাজার ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রেস্টোরেশনের আর একটি ফল দেশের সামাজিক অবস্থা আবার স্বাভাবিক। কিন্তু পার্লামেণ্ট সতর্ক হল, পাছে পিতার মত তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন পাশ করা হল (একে ক্ল্যারেন কোড বলা হয়) যাতে ইংলণ্ডের ক্যাথলিকরা কোনও উচ্চ পদে নিযুক্ত হবে না। চার্লসের ভাই ও উত্তরাধিকারী **দ্বিতীয় জেমস** অবিবেচনা ও হঠকারিতার

জন্য প্রজাদের বিরাগভাজন হলেন। তিনিও প্রকাশ্যভাবে এমন কাজ করতেন যাতে তাঁর ক্যাথলিক ধর্মগ্রহণ প্রতিপন্ন হয়, যেমন ক্যাথলিকদের স্বপক্ষে নির্দেশ জারি উচ্চপদে মনোনীত ক্যাথলিক লোক বসানো, কোনও আইন কিছুদিনের জন্য বাতিল করা এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিধিনিষেধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া। এর ওপর, তিনি সাতজন বিশপকে রাজদ্রোহিতার ও মানহানির অপরাধে অভিযুক্ত করে বিচারের হুকুম দিলেন, কারণ গির্জার মধ্যে তাঁরা ক্যাথলিকদের স্বপক্ষে রাজার ঘোষণা পত্র পাঠ করতে অস্বীকার করেন। এইবারে তিনি সকলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটালেন। বিশপরা নির্দোষ প্রমাণিত হলে চারদিকে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। এই সময়ে জেমসের এক পুত্র সন্তান হয়। অনেকেই ভাবলেন, এই শিশুটি তাঁর নয়, বাইরে থেকে তাঁকে প্রাসাদে চালান করা হয়েছে। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী ক্যাথলিক হলে সমূহ ক্ষতি। জেমসও বুঝলেন তিনি শেষ অবস্থায় এসেছেন। তাই সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেলেন (১৬৮৮)।

গৌরবময় বিপ্লব: দ্বিতীয় জেমস্ অক্সফোর্ড ও ক্রেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন। এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে লণ্ডনের কাছে এক দল ক্যাথলিক সৈন্য মোতায়েন করেন। এইভাবে তিনি প্রজাদের এমন উত্যক্ত করে তুলেছিলেন যে ইংলণ্ডের রাজত্ব ছেড়ে তার পলায়ন ছাড়া গতি ছিল না। বিনাযুদ্ধে এই যে পরিবর্তন হল, তাকে ইতিহাসে '**গৌরবময় বিপ্লব**' (Glorious Revolution) বলা হয়। 'পিউরিটান বিপ্লব' যদি প্রথম পর্ব হয়, 'গৌরবময় বিপ্লব' তারই দ্বিতীয় পর্ব ও পরিণতি। এখন তার গুরুত্ব ও ফলাফলগুলি সংক্ষেপে বলি। প্রথমতঃ প্রমাণিত হল যে পার্লামেণ্টই প্রধান এবং তারই সহযোগিতায় রাজ্য শাসিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা রাজার নেই, তাঁকে ক্ষমতা দেয় পার্লামেণ্ট। এই বিপ্লবের পরে জেমসের কন্যা মেরী ও তার স্বামী উইলিয়মকে যে যুগ্ম রাজা ও রানী হিসাবে নির্বাচন করা হয়, তার দ্বারাই প্রমাণ হল, সিংহাসনের দাবি রাজার জন্মগত অধিকার নয়। তৃতীয়তঃ **বিল অব রাইটস** নামে আইন পাশ করে (১৬৮৯) পার্লামেণ্ট রাজার ক্ষমতা সঙ্কুচিত করল। স্থির হল, ভবিষ্যতে কোন ক্যাথলিক রাজপদে বসতে পারবেন না। স্থায়ী সৈন্য রাখা চলবে না, তার জন্য পার্লামেণ্টের অনুমতি দরকার। রাজ্যের বার্ষিক খরচ পার্লামেণ্ট প্রতি বছর মঞ্জুর করবে। বিচারকরা রাজার অনুগত ভৃত্য নয়। এবং প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত বলবৎ থাকিবে। অন্যান্য শর্তগুলি পড়লে বোঝা যাবে, রাজাকে নিয়মতন্ত্রের অধীন করা হল। এ বিপ্লবে প্রধান অংশ নিয়েছিলেন 'হুইগ পার্টি' (অভিজাত গোষ্ঠী) তাই বেশ কিছুকাল দেশের শাসনব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে হুইগদের কর্তৃত্ব চলেছিল। যাই হোক, ইতিহাসে এই দুটি বিপ্লবের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়, বিশেষ করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে। 'দুই বিখ্যাত ব্যক্তির নাম এখানে স্মরণীয়। একজন মহাকবি **মিলটন**। তিনি কমনওয়েলথের স্বাধীন প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করে কয়েকটি নিবন্ধ লেখেন ল্যাটিন ভাষায়। আর একজন দার্শনিক **লক্** (Locke) তিনিও স্বাধীনতা, অধিকার ও রাষ্ট্রতন্ত্রের উপর কয়েকটি চিন্তাশীল গ্রন্থ রচনা করেন আমেরিকার ও ফ্রান্সের বিপ্লবীরা তাঁর লেখা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন।

একনজরে

* সপ্তদশ শতাব্দীতে স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।
* স্টুয়ার্ট রাজারা ছিলেন দাম্ভিক, একজেদী, পার্লামেণ্টের প্রতি তাঁদের মনোভাব ও ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লস-এর রাজত্বকাল।
* রাজা বে-আইনভাবে কর ধার্য করায় রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল।
* রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পার্লামেণ্টের না রাজার হাতে এই সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে চার্লস ও তার স্থায়ী সেনাবাহিনী। অপর-দিকে ছিল পার্লামেণ্ট ও তার সৈন্যদল।
* গৃহযুদ্ধে পার্লামেণ্ট জয়ী হলেও সেনাদলের নায়ক হিসেবে ক্রমওয়েল রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করলেন। রাজা চার্লস-এর প্রাণদণ্ডের ফলে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো।
* ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম চার্লস-এর পুত্র দ্বিতীয় চার্লস কে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করায় ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। এই ঘটনা রাজ-তন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে অভিহিত হয়।
* ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। এই বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে রাজার উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে কি বোঝায় ?
* পিউরিটান কাদের বলা হতো ?
* পিউরিটান বিপ্লব কাকে বলে ?
* কার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে প্রথম বিপ্লব সংঘটিত হয় ?
* ষষ্ঠ জেমস কে ছিলেন ? তিনি কি ভাবে কি ভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা হলেন ?
* প্রথম জেম্‌স হলেন জগতের বিজ্ঞতম নির্বোধ—এরূপ বলার যুক্তি কি ?
* ইংলণ্ডের ইতিহাসে কোন সময়কালকে Eleven years Tyranny বা এগার এগার বছরের স্বৈরাচার শাসন বলে ?

* লং বা দীর্ঘ পার্লামেন্ট কাকে বলে ? কে কত সালে এই পার্লামেন্ট ডেকেছিল ?
* ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণ কি ছিল ?
* পার্লামেন্ট সৈন্যের নেতা কে ছিলেন ?
* বিচারে চার্লস-এর কি শাস্তি হয়েছিল ?
* রেস্টোরেশান কাকে বলে ?
* গৌরবময় বিপ্লব কাকে বলে ? এই বিপ্লব কোন বছর অনুষ্ঠিত হয় ?
* গৌরবময় বিপ্লবের কালে কে ইংলণ্ডের রাজা হন ?
* বিল অব রাইটস নামে আইনটি কোন বছর পাশ করা হয় ?
* কোন মহাকবি ও দার্শনিক কমনওয়েলথ-এর স্বাধীন প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করেছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডে কি ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল ?
২। রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণগুলি উল্লেখ কর।
৩। মার্সটন মুর ও নেসবির যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর।
৪। প্রজাতন্ত্র উঠিয়ে দিয়ে আবার ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
৫। রেস্টোরেশন কথাটির অর্থ কি ? রেস্টোরেশনের ফলে কি কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ?
৬। দ্বিতীয় চার্লস কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ? তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল ?
৭। দ্বিতীয় জেমস প্রজাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন কেন ? দ্বিতীয় জেমস-এর অবৈধ কাজের দুটি দৃষ্টান্ত দাও।
৮। গৌরবময় বিপ্লবের ফলে রাজা ও পার্লামেন্টের কি স্থান নির্দিষ্ট হলো ?
৯। বিল অব রাইটস-এর প্রধান শর্তগুলি উল্লেখ কর।
১০। ১৬৮৮ সালের বিপ্লবকে গৌরবময় বলা হয় কেন ? এই বিপ্লবের নতুনত্ব কি ছিল ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতকের বিপ্লব বলতে কি বোঝ ?
২। ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের মূল কারণগুলি কি ছিল ?
৩। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধের কারণ কি ? এর পরিণতি কি হয়েছিল ?
৪। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?
৫। ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কি ভাবে হয়েছিল ?
৬। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের কারণ কি ? একে গৌরবময় বিপ্লব বলা হয় কেন ? এই বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।
৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ বিল অব রাইটস।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

(খ) ইংলণ্ডে কাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল ?

(গ) দীর্ঘ পার্লামেণ্ট কত বছর স্থায়ী হয়েছিল ?

(ঘ) ক্রমওয়েল কে ছিলেন ?

(ঙ) কত খ্রীস্টাব্দে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

(চ) কত খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ?

ব্যবহারিক অনুশীলনী

নিচে বাঁ পাশের চিত্রটি অলিভার ক্রমওয়েলের। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে এঁর ভূমিকা এবং ইংলণ্ডের লর্ড প্রোটেকটর হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ডান পাশের শূন্যস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত কর।



৬



মুঘল সাম্রাজ্য ঃ (১৫২৬-১৭০০)

বাবর (১৫২৬-১৫৩০) ঃ সুলতানী আমলের শেষ দিকে ভারতের সর্বত্র যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল, বাবর সেই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেন। ১৫২৬-১৫৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ভারতে এক নতুন রাজবংশের সূচনা করে যান। তাঁর পিতা **তৈমুরের** বংশজাত, মায়ের দিকে বাবরের সঙ্গে মোঘল নেতা **চিঙ্গিস খাঁর** সম্পর্ক ছিল। কাবুল ও কান্দাহারের রাজা বাবর তিনবার ভারত আক্রমণ করেন। তৃতীয় অভিযানে তিনি **প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে** (১৫২৬) ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। বাবর জাতিতে চঘতাই তুর্কী ছিলেন, তাই চঘতাই তুর্কীরাই ভারতে মুঘল বা মোগল নামে অভিহিত। এই পাণিপথের যুদ্ধ তাঁকে দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর করল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁর রাজ্য নিষ্কণ্টক হল না। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর সিক্রির কাছে **খানুয়ার** প্রান্তরে বাবর মেবারের রানা সঙ্গকে পরাস্ত করেন। এর ফলে হিন্দুস্থানে মুঘল অধিকারের পথ প্রশস্ত হল। তারপর ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে বাবর **ঘোঘবার** যুদ্ধে বাঙলা-বিহারের দুর্দান্ত আফগান সর্দারদের পরাজিত করেন। মৃত্যুকালে (১৫৩০) তাঁর রাজ্য কাবুল কান্দাহার থেকে বাঙলার সীমান্ত পর্যন্ত সুদূর-বিস্তৃত ছিল। বাবরের চরিত্রে নানা গুণ ছিল। তুর্কী ভাষায় তিনি 'আত্মজীবনী' লেখেন। মুঘল বাদশাহীর সূত্রপাত করে গেলেও একটি সাম্রাজ্য গড়বার মত সময় ও ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯, ৫৫-৫৬ খৃঃ) ঃ বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর বড় ছেলে হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হলেন ; কিন্তু সমগ্র রাজ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না। সেই সময় পূর্ব ভারতে বিহার অঞ্চলে শের খাঁ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) এবং পরের বছর বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁর হাতে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। তারপর পনের বছর ধরে হুমায়ুনকে হৃতরাজ্যে পলাতকের জীবন যাপন করতে হয়। এই সময়ে সিন্ধু দেশে অমরকোট নামক-স্থানে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হলে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 'হুমায়ুন' নামের অর্থ 'ভাগ্যবান' কিন্তু তাঁর মত ভাগ্যহীন সম্রাট বড় দেখা যায় না।

শেরশাহ (১৫৪২-১৫৪৫) ঃ ভারতের ইতিহাসে শেরশাহ এক অসামান্য ব্যক্তি। তিনি জাতে আফগান্ (পাঠান) ; তাঁর আসল নাম ছিল ফরিদ। প্রথমে তিনি

বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন, ক্রমে শক্তিশালী হয়ে রোটাস ও চুনার দখল করে নেন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দেন। তারপর শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি রাজ্যবিস্তার ও ভালো শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যান। অবশেষে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ করবার সময় বারুদের আগুনে পুড়ে শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫)।

রাজস্ব-বিভাগের সংস্কার শের শাহের এক বড় কীর্তি। যোগাযোগের সুবিধার জন্য তিনি বাঙলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত শাহী সড়ক (গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড) তৈরি করান। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্বকালের মধ্যে শের শাহ দেশশাসনে ও নানাবিধ সংস্কারে প্রতিভার পরিচয় দেন। এবং সাম্রাজ্যকে পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে যান। তাঁর হিন্দু বিদ্বেষ ছিল না, তাঁর অনেক বড় কর্মচারী ছিলেন হিন্দু, ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁর এক প্রধান সেনাপতি। সকলেই স্বীকার করেন যে রাজস্ব ব্যবস্থায়, শাসন ও মুদ্রা-সংস্কারে আকবর শের শাহের কাছে অনেকটা ঋণী। শেরশাহ যদিও পাঠান, নিজের কৃতিত্বে তিনি মোঘল-যুগের মধ্যে থেকে স্থায়ী নাম রেখে গেছেন।

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)ঃ হুমায়ুনের বেগম হামিদা বানুর পুত্র আকবর ১৫৫৬ সালে তেরো বছর বয়সে দিল্লীর বাদশাহ হলেন। তখন তিনি নামে মাত্র পাঞ্জাবের, শাসক, আফগান শত্রুদের আক্রমণে তাঁর পৈতৃক রাজ্য বিপন্ন। এই সময়ে আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ। তাঁরই কৌশলে ও সাহায্যে আকবর **দ্বিতীয় পানি-পথের যুদ্ধে** (১৫৫৬) হিমুর নেতৃত্বে হিন্দু পাঠান সেনা বাহিনীকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধ শেষে আহত হিমুকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। তারপর আকবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। এই দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গেল এবং হিন্দু-স্থানে মুঘল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হল। আকবর নিজ হাতে শাসনভার নিয়েই রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য গঠনে মন দিলেন। ১৫৬১ সাল থেকে একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে তিনি একটির পর একটি রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করে নিজ রাজ্যের আয়তন বাড়িয়েছিলেন। জৌনপুর ও গোয়ালিয়রের পর আকবর মালব রাজ্য ও গণ্ডোয়ানা রাজ্য জয় করেন।

রাজপুত নীতিঃ আকবর প্রথম থেকে বুঝেছিলেন, বীর রাজপুত জাতির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। তাই অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তারপর একে একে মাড়বার বিকানীর, জয়শলমীর ও বুন্দির রাজারা স্বেচ্ছায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু শিশোদীয় বংশের মেবারের রানা উদয়সিংহ নতি স্বীকার করলেন না। ফলে ১৫৬৭ খৃস্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন। তখন উদয়সিংহ চিতোর ছেড়ে উদয়পুরে গিয়ে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গ মুঘল অধিকারে এলে রাজস্থানের অধিকাংশই আকবরের করায়ত্ত হয়।

গুজরাট রাজ্যজয় আকবরের রাজত্বের একটি প্রধান ঘটনা। এই অঞ্চলের রাজস্ব-ব্যবস্থা তিনি সুযোগ্য মন্ত্রী তোডরমহলের হাতে ন্যস্ত করেন। এর ফলে আকবরের রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র, বড় বন্দরগুলি

মুঘলদের অধিকারভুক্ত হওয়াতে সাম্রাজ্যের অর্থসমৃদ্ধি অনেক বেড়ে গেল। বাঙলায় তখন সুলেমান দাউদ কররাণী স্বাধীনভাবে শাসন করেছিলেন। দাউদ রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যও আকবরের সেনাপতি মানসিংহের কাছে হেরে যান। এরপর আকবর-কাবুল কান্দাহার থেকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি ছিল তাঁর রাজ্যসীমা। উত্তর ভারত জয় সমাধা করে আকবর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির দিকে মন দিলেন। আহম্মদনগরের রাণী চাঁদবিবি মুঘল সৈন্যদের প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি। এরপর বেরার ও খান্দেশ আকবরের হস্তগত হল (১৬০১)। এইভাবে চল্লিশ বছরের উপর দীর্ঘকাল আকবর রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ছলে বলে কৌশলে ভারতের অধিকাংশ তিনি একশাসনে এনে রাষ্ট্রের ঐক্য সাধন করেছিলেন।

রানা প্রতাপই একমাত্র রাজপুত বীর যিনি মুঘল শক্তির কাছে মাথা নত করেননি। আকবর চিতোর জয় করেছিলেন কিন্তু মেবারকে বশে আনতে পারেননি। রাজা মানসিংহ সম্রাটের আদেশ নিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। **হলদিঘাটের** সঙ্কীর্ণ গিরি প্রান্তরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধে রানা প্রতাপ পরাস্ত হন (১৫৭৬)। প্রকৃতপক্ষে আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে সাম্রাজ্য মজবুত করতে হলে হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজারই সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া দরকার, এই কথা তিনিই প্রথম বুঝে-ছিলেন। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া ও তীর্থযাত্রী কর বন্ধ করে দেন এবং অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন।

শিল্প ও সাহিত্য ঃ আকবর শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলের অনেক স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ফতেপুর সিক্রির বিশাল প্রাসাদ আকবরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। লালপাথরে তৈরি আকবরের এই নির্জন প্রাসাদ নগরীর শোভা ও গাম্ভীর্য সত্যিই অতুলনীয়। সম্মুখে বিরাট চওড়া উঁচু সিঁড়ি, তারই ওপর বিস্ময়কর বিশাল প্রবেশ-তোরণ—বুলন্দ দরওয়াজা। তোরণের ভিতর দিয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে জামা-ই মসজিদ। সামনের চত্বরে সাধু সেলিমচিস্তির সুন্দর সমাধি, আরও পিছনে শূন্য রাজকক্ষ ও অন্দরমহল। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি সৌধ, আগ্রার কেল্লা, এ সবই আকবরের সময়ে তৈরি হয়। আকবরের নিজের সমাধি রয়েছে আগ্রা শহরের কাছেই, **সিকান্দ্রায়**। এই সবই লালপাথর দিয়ে গড়া। সাদা পাথরের অংশগুলি শাহজাহানের কাজ।

আকবরের একটি 'নবরত্ন সভা' ছিল—'নওরতন দরবার'। গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী আবুল ফজল্স, তাঁর ভাই ফৈজী, আর হিন্দু সভাসদদের মধ্যে রাজা মানসিংহ, তোডরমল, সুরসিক রাজা বীরবল এবং বিখ্যাত সঙ্গীতকার মিঞা তানসেন। ইতিহাসের দলিল হিসাবে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' খুবই মূল্যবান। আকবরের আমলে বিখ্যাত ভক্তকবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' নামে হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন, যা সারা ভারতে আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে। বাঙলা দেশের চৈতন্য

চরিতামৃত' গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ আর নরহরি কবিরাজও এ যুগেরই মানুষ। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)ঃ ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর পারস্যদেশের মির্জা-গিয়াসের বিধবা কন্যা মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি নূরজাহান (জগতের আলো) নামে পরিচিত হন। নূরজাহান অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও চতুর ছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তাই জাহাঙ্গীরের শাসন কালে নুরজাহানের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়। জাহাঙ্গীর সুরাপানে দুর্বলচিত্ত ও বিলাসী ছিলেন, সুতরাং রাজমহিষী নূরজাহানই রাজ্যের আসল কর্ত্রী হয়ে ওঠেন। শেষ দিকে তাঁর ক্ষমতা ও খ্যাতির নষ্ট হয়। জাহাঙ্গীর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মুঘল শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র খুরম মেবার আক্রমণ করলে প্রতাপের ছেলে রানা অমরসিংহ সন্ধি করে মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। দাক্ষিণাত্যেও রাজপুত্র খুরম আহম্মদনগর জয় করেন। তাতে জাহাঙ্গীর খুব খুশী হয়ে খুরমকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে নূরজাহান গোপনে চেষ্টা করছিলেন যাতে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়র সিংহাসন পান। নূরজাহানের চক্রান্ত বুঝতে পেরে শাহজাহান বিদ্রোহী হন। সম্রাট ও নূরজাহান উভয়েই লাহোরে বন্দী হন এবং সেখানেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় (১৬২৭)।



জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক আরম্ভ হয়। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির** পক্ষে ক্যাপ্টেন **হকিন্স** বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধার জন্য মুঘল দরবারে আসেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস **স্যার টমাস রো**-কে দূত হিসাবে আগ্রায় পাঠিয়েছিলেন। ইংরাজ রাজদূত জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাতে ইংরাজদের কুঠি নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয়। স্যার টমাস রো লিখেছেন যে সম্রাট মোটের উপর ভালো লোক, অমায়িক ও বুদ্ধিমান। তাঁকে তুলাদণ্ডে বসিয়ে ধনরত্নের পাল্লার সঙ্গে ওজন করা হলে বিশিষ্ট উৎসবের দিনে সে সব বিতরণ করা হত। দরবারে জাঁকজমক আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও, কৃষকদের অবস্থা দরিদ্রই ছিল এবং প্রদেশগুলিতে শাসন তেমন দৃঢ় ছিল না। যাই হোক, তাঁর এই সুলিখিত ভারতবিবরণী থেকে মুঘল যুগের অনেক দরকারী কথা জানতে পারা যায়।

শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮) জাহাঙ্গীরের হিন্দু পত্নী যোধপুরী বেগমের পুত্র শাহজাহান ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে

শাহজাহানের রাজত্বকাল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তখন মুঘলদের গৌরবকাল। শাহজাহান 'নওরোজ' নামে একটি বড় উৎসব অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু ঐ বছরেই গুজরাটে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় (১৬৩০) এবং তাতে বহু লোকের প্রাণ-হানি ঘটে। ১৬৩১ সালে সম্রাটের প্রিয় মহিষী মমতাজ বেগমের মৃত্যু হলে তিনি গভীর শোক পেয়েছিলেন।



শাহজাহান

এদিকে বাঙলায় তখন পোর্তুগীজ 'ফিরিঙ্গী'র দল লুটতরাজ, খুন-জখম করে বেড়াত, লোকদের ধরে নিয়ে ক্রীতদাসের মত বিক্রী করত। হুগলীতে ছিল পোর্তুগীজদের কুঠি। এই সব অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে সম্রাট হুগলীতে তাদের কুঠি দখল করার আদেশ দেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সম্রাট অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান তখন ভয় পেয়ে নতি স্বীকার করলেন। বিজাপুরের সুলতানও বাদশাহের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হলেন। শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরাঙ্গজীব মাত্র ১৮ বছর বয়সে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন।

শিল্পকলা ও ঐশ্বর্য : শিল্পকলার অসামান্য উন্নতির জন্য শাহজাহানের শাসন-কাল ইতিহাসে বিখ্যাত। তাঁর আমলের মর্মরনির্মিত সৌধগুলির কারুকার্য ও সৌন্দর্য অপরূপ। দিল্লীতে **শাহাজাহানবাদ** নাম দিয়ে তিনি যে নতুন দুর্গপ্রাসাদ তৈরি করান তাকেই **লালকেল্লা** বলা হয়। তার মধ্যে **দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আম**-এর শিল্প কাজ অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। শ্বেত পাথর ও সোনা রূপার কাজে তৈরী এই দুটি হর্ম্য শোভায় ঝলমল করত। তা দেখে বিদেশীরা চমৎকৃত হয়েছিল। দেওয়ান-ই-খাসের মাঝখানে ছিল **ময়ূরসিংহাসন** (তখ্‌ত-ই-তাউস)। দরবারে বসবার জন্য এই সিংহাসন অজস্র হীরা জহরত এবং এক লক্ষ তোলা সোনা দিয়ে তৈরি করান হয়। শাহজাহানের মৃত্যুর অনেক পরে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে এই সিংহাসন নিয়ে চলে যান। আগ্রার বিখ্যাত **মোতি মসজিদ** আর এক অপূর্ব শিল্প-কীর্তি। তবে শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগ্রায় যমুনার ধারে **তাজমহল**। মমতাজের সমাধি-সৌধ জগতের অন্যতম বিস্ময়। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা রকম পাথর ও মনি-মাণিক্য আনিয়ে এই শ্বেত পাথরের সৌধ নির্মাণ করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তার কারণ রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু দেশের লোকই সেই অর্থ জুগিয়েছে

এবং বাদশাহ তাঁর ভাণ্ডার থেকে ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন জাঁকজমকে। আগ্রা, দিল্লী, আজমীর, লাহোর ও শ্রীনগর প্রভৃতি শহরে শাহজাহানের যে সব শিল্পকীর্তির নমুনা আছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সে আমলে কতটা ঐশ্বর্য ও আরম্বর ছিল। সম্রাটের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দারা শিকো বিভিন্ন সংস্কৃত শাস্ত্র ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এ যুগে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে দেশের শিল্প সংস্কৃতিও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক ইউরোপীয় পর্যটকদের লেখা থেকে জানা যায় যে কৃষকরা উৎপীড়িত হত, প্রাদেশিক শাসকরা অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। দুর্ভিক্ষ নিরোধের সুব্যবস্থা ছিল না।

১৬৫৭ সালে শাহজাহান খুব অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁর চার ছেলের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ধুরন্ধর তৃতীয় পুত্র আওরঙজীবই কূট কৌশলে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে আলমগীর উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৬৫৮)। সম্রাট বর্তমানেই তিনি সম্রাট হলেন। তাঁর দুবার অভিষেক হয়, একবার ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আর দ্বিতীয় বার শাহজাহানের মৃত্যুর পর ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। বন্দী শাহজাহানের দুঃখময় শেষ জীবন এক হিসাবে তাঁর নিয়তি। তিনি যে বিদ্রোহ ও রক্তপাতের সূচনা করেন, তারই পরিণতি এই স্বকর্মের ফলভোগ।

আওরঙজীব (১৬৫৮-১৭০৭): সম্রাট হয়ে আওরঙজীব শাসনপদ্ধতির সংস্কার করেন। রাজপুত রাজা ও হিন্দু কর্মচারীরা আগের মতই রাজকার্যে নিযুক্ত রইলেন, তবে রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে নানা কারণে এই নীতির বদল হয়। **'বেনারস ফর্মন'** থেকে জানা যায়, সম্রাট (তখন পর্যন্ত) হিন্দুধর্মের উপর বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না। যাই হোক, আওরঙজীব তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জুমলার সাহায্যে রাজ্য বিস্তার করেন। মাতুল সায়েস্তা খাঁ বাঙলার শাসনকর্তা হিসাবে নাম করেন। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের এক নতুন শত্রু প্রবল হয়ে উঠেছিল। শাহজী ভোঁসলার পুত্র শিবাজী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।


আওরঙ্গজীব

নানা বিদ্রোহ: আওরঙজীব ছিলেন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান। তাঁর ধর্ম-অনুরাগ ছিল প্রবল। মুসলমানরা তাঁকে 'জিন্দা পীর' বলতেন। ভারতে ইসলামের প্রচার ছিল তাঁর লক্ষ্য। আওরঙজীবের ধর্মনীতি ও হিন্দুবিদ্বেষের ফল বিষময় হয়েছিল। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও মুঘলদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়েছিল। পঞ্চম গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের

আদেশে প্রাণ হারান। নবম গুরু তেগবাহাদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় আওরঙজীব তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন। এখন থেকে শিখরা মুঘলদের প্রধানতম শত্রু বলে গণ্য হয়।

রাজপুত নীতিঃ আকবরের সময় থেকে রাজপুতরা মুঘলদের মিত্র হয়ে যুদ্ধ করেছে কিন্তু আওরঙজীবের ব্যবহারে রাজপুতদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। অনেক বছর ধরে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আওরঙজীবের কোনও লাভ হয়নি। ক্রমে সারা রাজস্থানে অশান্তি দেখা দিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভেঙে গেল।

দাক্ষিণাত্য নীতিঃ শিবাজী ও আওরঙজীবঃ আওরঙজীবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোটের উপর ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর যেটুকু সাফল্য, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়। তাঁর আসল সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘকাল মারাঠাদের বিরুদ্ধে। শিবাজী ছিলেন মারাঠা জাতির স্রষ্টা। মুঘলরা যখন উত্তর ভারতে ব্যস্ত তখন শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তি-বিস্তারের মস্ত সুযোগ এল। মহারাষ্ট্রের স্বাধীন রাজা শিবাজী প্রস্তুত হলেন। সম্রাট হয়েই আওরঙজীব শিবাজীকে জব্দ করার জন্য মাতুল সায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু শিবাজীর হঠাৎ আক্রমণে তাঁকে প্রাণ নিয়ে চলে আসতে হয়। শিবাজী কিছু কাল চুপ করে ছিলেন তারপর আবার সংগ্রাম শুরু করেন। শিবাজী হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করলেন ও সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করলেন। ১৬৭৪ সালে 'ছত্রপতি' উপাধি নিয়ে রায়গড়ে স্বাধীন নৃপতি হিসাবে তাঁর অভিষেক হল। ১৬৮০ সালে মহারাষ্ট্র বীরের মৃত্যু হয়। শিবাজীর জীবিত কালে সম্রাট মারাঠাদের দমন করতে পারেন নি। 'পার্বত্য মূষিক' বলে তাঁকে বিদ্রূপ করলেও তিনি শিবাজীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন (১৬৮৬-৮৭)। তার আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তিনি তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী পর্যন্ত অধিকার করেন। সেই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য সব চেয়ে বিশাল ও বিস্তৃত হয়। মুঘল সেনা অনেকগুলি মারাঠা দুর্গ দখল করে কিন্তু দাক্ষিণাত্যের বাদশাহের সৈন্যবাহিনী মারাঠাদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে। সম্রাট আওরঙজীবের মারাঠা শক্তি খর্ব করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

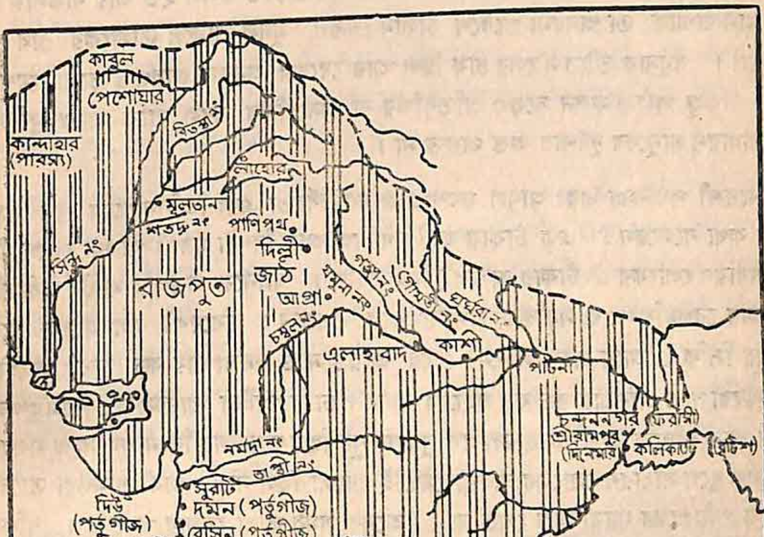


শিবাজী

আওরঙজীব খুব সরল জীবনযাপন করতেন, তাঁর জীবনে কোনও আড়ম্বর ছিল না। অবসর সময়ে পবিত্র কোরান নকল করতেন, বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করেছিলেন। রাজকার্যে তাঁর অত্যন্ত মনোযোগ ছিল, কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি ব্যর্থ। তাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁকে অনেকটা দায়ী করা হয়। শেষ জীবনে পুত্রদের কাছে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে তাঁর মনের ক্ষোভ ও ব্যর্থতার সুর ফুটে উঠেছে। হিন্দু,

রজপুত, শিখ, কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি সদ্‌ভাব রেখে চলেননি। ফলে এত বড় সাম্রাজ্য এক মুঠিতে ধরে রখো যায়নি। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যে নিস্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই এক ঐতিহাসিক বলেছেন—'ঐ দাক্ষিণাত্যে তাঁর দেহ আর কৃতিত্ব, উভয়েরই সমাধি।'

মুঘল আমলে সমাজ ও সভ্যতা : মুঘল আমলের জীবনযাত্রা দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পকলা প্রভৃতি কয়েকটি দরকারী খবর জোগাড় করা গেছে বিদেশীদের ভ্রমণকাহিনী ও মন্তব্য থেকে। মুঘল আমলে ইউরোপ



মুঘল সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সময়

থেকে যাঁরা ভারতে আসেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ র‍্যালফ ফিচ, ক্যাপ্টেন হকিন্স, স্যর টমাস রো, পিটার মণ্ডি ও পাদ্রী টেরিং ; ফরাসী হীরক-ব্যবসায়ী তাভার্নিয়ে ও চিকিৎসক

বার্নিয়ে ইটালিয়ান পর্যটক মানুচি ও ওলন্দাজ বণিক পেলিসির্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের বিবরণ থেকে শুধু রাজদরবারের ঐশ্বর্য আড়ম্বর, ভিতরকার দুর্নীতি ও চক্রান্তের কথাই নয়, দেশের জমি, ফসল, পণ্য-বাণিজ্য, শিল্পকলা এবং কর্মচারীদের জুলুমে কৃষক-কারিগরদের দুরবস্থা—এই রকম অনেক খবর জানা যায়। এই সময়ে সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষের পরিচয় মেলে—(১) সম্ভ্রান্ত ধনিক (২) ব্যবসায়ী কর্মচারী প্রভৃতি মাঝারি শ্রেণীর লোক ও (৩) কৃষক শ্রমিক দোকানদার জনসাধারণ। জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। চাষীরা ছোট জমি নিয়ে চাষ করত। সরকারের বড় আয় ছিল জমির রাজস্ব। জমিতে ধান যব গম প্রভৃতি ফসল হত আর বাঙলায় যে প্রচুর ধান জন্মাত, তা অন্যান্য প্রদেশে চালান যেত। মুঘল আমলে তামাকের চাষ শুরু হয়েছিল। যমুনার তীরে নীলের চাষ ছিল আর দেশের অন্যান্য জায়গায় তুলো, রেশম, আখ। কিন্তু পর্যাপ্ত ফলন সত্ত্বেও অতিবৃষ্টির বা অনাবৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হলে সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত থাকত না।

বিদেশী পর্যটকরা এবং আবুল ফজলও জমির উর্বরতা এবং জিনিসপত্রের খুব সস্তা দামের কথা বলেছেন। এক টাকায় আট মণ চাল আর বিশটা মুরগী পাওয়া গেলে কি হয়, সাধারণ লোকের ঐ টাকার অভাবই ছিল বেশি। বার্নিয়ে বাঙলার মাটির উর্বরতা, এখানকার রেশমশিল্প ও সমৃদ্ধির প্রশংসা করে গেছেন। বিদেশী লেখকদের মতে ফতেপুর সিক্রি ও আগ্রা শহর লণ্ডনের চেয়ে আয়তনে ও জনসংখ্যায় বড় আর লাহোর ছিল ইউরোপ ও এশিয়ায় বড় বড় শহরের সমান। ঢাকা পাটনা রাজমহল চট্টগ্রাম হুগলী বর্ধমান আর ওদিকে কাশী আহম্মদাবাদ বুরহানপুর ছিল তখনকার দিনে খুব সমৃদ্ধ নগর। তবে মুঘল যুগে সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। চাষী-শ্রমিকরা তাদের ফসল ও পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য পেত না। অনেক সময় তারা বেগার খাটতো। বণিক ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা সে তুলনায় অনেকটা ভালো ছিল। উচ্চশ্রেণীর আয়-ব্যয় দুইই ছিল প্রচুর। কোন কোন আমীর-ওমরাহ, এমন কি রাজকুমার সুজাও, ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটিয়ে অনেক রোজগার করতেন।

ব্যবসা বাণিজ্য, যাতায়াত ও সরবরাহের জন্য ছিল বড় বড় রাজপথ। শিল্প-দ্রব্য ও নৌকা তৈরির জন্য অনেক কারখানা ছিল, চাষী ও জেলেরা নিজেদের কাজ না থাকলে এই সব কারখানায় সাময়িকভাবে কাজে নিযুক্ত হত। এ যুগে বিদেশে রপ্তানি হত নীল, আফিম, লঙ্কা, রেশম, মসলিন হাতীর দাঁতের জিনিস ও সুগন্ধি গাছ-গাছড়া। বাঙলাদেশ থেকে যেত সুতির কাপড়, সোরা, তেল ও ঘি। মুঘল যুগে চিত্রকলারও এক নতুন রূপ দেখা যায়। ছবি আঁকার এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল, রঙের ব্যবহার, নক্সাদার কিনারা এবং ছোট আকার। শিল্প রসিকদের কাছে এই মুঘল 'মিনিয়েচর' খুব সমাদর ও সংগ্রহের সামগ্রী। হস্তলিপির কৌশল ('ক্যালিগ্রাফি') এবং পুঁথির পৃষ্ঠায়, বিশেষ করে চার কিনারায় বিচিত্র অলংকার ও রঙীন চিত্রকর্মের জন্য মুঘল যুগ প্রসিদ্ধ। মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা ও প্রসার বাড়তে থাকে। আকবরের সভায়

ছত্রিশজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন অদ্বিতীয় গায়ক ও সুরস্রষ্টা তানসেন।

মুঘল রাজ্যের অধঃপতন (১৭০৭-৫৭): আওরঙজীবের শেষ জীবন ও ব্যর্থতা, মুঘল শক্তির পতনের জন্য তাঁর দায়িত্বের কথা তোমরা পড়ে এসেছ। দাক্ষিণাত্য অভিযানে শুধু লোকক্ষয় নয় প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। এই আর্থিক দৈন্য ক্রমে স্থায়ী ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। সম্রাটের মৃত্যুর পর (১৭০৭) থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের চরম দুরবস্থা হল, কিন্তু এই পরিণামের জন্য আরও অন্য কারণ ছিল। ১৭০৭ সালের পর যাঁরা বাদশাহী তখ্‌তে বসলেন, তাঁদের বলা হয় Later Mughals বা 'পরবর্তী মুঘল'। আওরঙজীবের মৃত্যুর পর বড় ছেলে সম্রাট হলেন **বাহাদুর শাহ** নাম নিয়ে। রাজপুতদের সঙ্গে তিনি সন্ধি করলেন, তাদের স্বাধীনতা এক রকম মেনে নিয়ে। তবে শিখদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়, কারণ আওরঙজীবের সময় শিখ-মুঘল সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে যায়।

সম্রাটের মৃত্যুর পর আবার সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব শুরু হল। তারপর বড় ভাই **জাহান্দর শাহ** সিংহাসন পেলেন। অকর্মণ্য জাহান্দর এক বছরের বেশি রাজ্য ভোগ করেন নি। তারপর **ফররুকশিয়র** দিল্লীর মসনদে বসলেন। তাঁর সহায় ছিলেন **সৈয়দ ভ্রাতারা** আবদুল্লা ও হুসেন আলি। এঁদের প্রতিপত্তি এই সময় থেকে এত বেড়ে গেল যে ইতিহাসে তাঁরা 'রাজকর্তা' নামে পরিচিত। এঁরা স্বার্থ ও ইচ্ছামত সিংহাসনে লোক বসিয়েছেন, সরিয়েছেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা আপনাদের হাতে রেখেছেন। ফররুকশিয়র-কেও মরতে হল ছয় বছর পরে। তাঁরই সময়ে কোম্পানির দূত **সর্মন** সম্রাটের ফর্মন পেয়ে ইংরেজদের কয়েকটি বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করে।

সৈয়দ ভাইদের প্রতাপ ক্রমেই অরাজকতা সৃষ্টি করল। শেষকালে **মহম্মদ শাহ** গদীতে বসলেন রাজকর্তাদের সাহায্যে। সৈয়দ ভাইদের অপসারিত ও নিহত করা হলেও অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। দুরানী দলপতি **চিন কিলিচ খাঁ** নিজাম উল-মূল্‌ক নাম নিয়ে দাক্ষিণাত্য হায়দাবরাদে রাজধানী করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন এবং অযোধ্যায় সুবাদার **সদত খাঁ** স্বাধীন নবাব বংশের সূত্রপাত করলেন, আর বাঙলার সুবাদার **আলিবর্দি খাঁও** স্বাধীন নবাব হয়ে বসলেন। ওদিকে মারাঠাগণ সুযোগ বুঝে পেশবার নেতৃত্বে দিল্লী পর্যন্ত তাদের প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করল।

এই অবস্থায় এল দুই বিভীষিকা, দুটিই ভারত-সীমান্তের বাইরে থেকে। একটি নাদির শাহের আক্রমণ, অপরটি আহম্মদ শা আবদালীর প্রথম অভিযান। **নাদির শাহ** এক তুর্কি যোদ্ধা। দিল্লীর পথে কর্নালের যুদ্ধে তিনি মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অতঃপর দিল্লী প্রবেশ ও লুণ্ঠন। অগ্নিকাণ্ড ও অগণিত নরহত্যা দ্বারা তিনি যে ভয়াবহ প্রতিশোধ নিলেন তা অবর্ণনীয়। ব্যাপক জরিমানা আদায় করে বিশ্ববিখ্যাত কোহিনূর হীরা, ময়ূর সিংহাসন ও অজস্র ধনরত্ন নিয়ে, নাদির শাহ দেশে ফিরে গেলেন। এর ফলে পতনমুখী মুঘল সাম্রাজ্য যে আঘাত পেল, তা কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য আর রইল না।

এর পরেই এল দ্বিতীয় আঘাত। মহম্মদ শাহের পর **আহম্মদ শাহ** তখন দিল্লীর মসনদে। এই সময়ে নাদির শাহের অনুচর দুরানী দলপতি **আহম্মদ শাহ আবদালী** ভারতে হানা দিলেন পর পর তিনবার। এইসব অভিযানের ফলে বাদশাহী অসহায় হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে জাহান্দার শাহের এক পুত্র সিংহাসনে বসলেন তাঁর নাম **দ্বিতীয় আলমগীর**। তাঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। আবদালী চতুর্থ বার ভারত আক্রমণে দিল্লী ও মথুরা লুঠ করে ফিরে গেলেন।

তারপর শাহজাদা আলি গহর (দ্বিতীয় শাহ আলম) মসনদে বসলেন। দিল্লীতে কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ বুঝে পেশবা বাজী রাও আসরে নামলেন। আবদালী এখন শেষ অভিযানে অগ্রসর হলেন। একদিকে মারাঠা-মুঘল অপর দিকে আবদালীর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাবতীয় মুসলিম শক্তি জোট। ১৪ই জানুয়ারী ১৭৬১ উভয় পক্ষ ঐতিহাসিক অঙ্গনে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে সম্মুখীন হলে, আহম্মদ শা আবদালী জয়লাভ করেন। মুঘল-মারাঠার, তথা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। নাদির শাহের ও আবদালীর সবসুদ্ধ সাতটি আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা পতনোম্মুখ সাম্রাজ্যকে ধরাশায়ী করে দিল।

এদিকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার স্বাধীন নবাবী আমলও শেষ হল পলাশীর পরে (১৭৫৭)। এখন পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর বাদশাহীর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, শুধু শত্রুবেষ্টিত দিল্লী দুর্গনগরী। সেইখানেই শেষ দুই সম্রাট **দ্বিতীয় আকবর** আর **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ** সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত নামে মাত্র মসনদে আসীন ছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় শাহ আলম বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙলা-বিহার ওড়িশার দেওয়ানী দিয়েছিলেন। ফলে সেখানে ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হল।

১৭০৭ সাল পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য ক্ষমতায় ঐশ্বর্যে বিদেশী আগন্তুকের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল, পরের পঞ্চাশ বছরে তার দ্রুত অবসান হঠাৎ ঘটেনি। সে অধঃপতনের দায়িত্ব একা আওরঙজীবের নয়। তাঁর মৃত্যুকালেও সাম্রাজ্যের যে বৃহৎ আয়তন ও শক্তি ছিল তা রক্ষা করার মত লোক ছিল না। পরবর্তী মুঘলরা প্রায় সবাই দুর্বল বিলাসী ও অক্ষম ছিলেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট আইন না থাকায় সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধ ও প্রাণহানি হত। মুঘল বংশধররা মন্ত্রীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। ইংরেজরা যখন শাসক হবার চেষ্টা করছিলেন, তখন কেবল 'বাদশাহ' নামের মোহটুকুই ছিল। প্রশাসনে ও সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা আর রাজদরবারের হীন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র মুঘল রাষ্ট্রের ভিত্তিই নষ্ট করে দেয়।

য়ুরোপীয় বণিকদল : য়ুরোপীয় বণিকরা আগে ভারতের পণ্য কিনত আরব বণিকদের কাছ থেকে। তাই মুসলমান নাবিক ও বণিকদের একচেটিয়া দখল দূর করে তারা সরাসরি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে উন্মুখ হল। নতুন সমুদ্রপথের সন্ধান পেয়ে বিখ্যাত পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছলেন ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

পোর্তুগীজ : এই জলপথের আবিষ্কার হলে পোর্তুগীজরা দলে দলে ভারতে আসতে লাগল। কালিকটে টিকতে না পেরে তারা কোচিন এবং সেখান থেকে গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং সিংহলের অনেক জায়গায় এসে ঘাঁটি তৈরি করল। য়ুরোপের বণিকদের মধ্যে তারাই প্রথম বাঙলার সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), পরে ব্যাণ্ডেল এবং চট্টগ্রামে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা আয়ত্ত করে নিতে থাকে। ব্যাণ্ডেলে তাদের প্রতিষ্ঠিত সুন্দর গীর্জাটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং এখনো বর্তমান। মুঘল সরকারের সঙ্গে বিবাদ হলে তারা ব্যাণ্ডেল হুগলী অঞ্চল ছেড়ে অনেক দক্ষিণে হিজলিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৫১ সালে ইংরেজ বণিকেরা তখন হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে বসে গেলেন।

ওলন্দাজ : পোর্তুগীজদের ঠিক পরেই এল ওলন্দাজ (ডাচ), তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। কয়েক বছরের মধ্যে ওলন্দাজ বণিকরা পোর্তুগীজদের একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট করে দেয়। মাদ্রাজে নাগাপত্তন আর বাঙলার চুঁচুড়ায়, তারা কুঠি তৈরী করে। কিন্তু আঠারো শতকে ইংরেজ বণিকদের কাছে হেরে গিয়ে তারা মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ অঞ্চলে চলে যায় এবং সেখানে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যা এখন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া। এক সময়ে ওলন্দাজদের মশলার ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ছিল।

দিনেমার : ডেনমার্কের অর্থাৎ দিনেমার ব্যবসায়ীরাও এসেছিল শ্রীরামপুরে বাণিজ্যের জন্য কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারে নি। ইংরেজরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে, শ্রীরামপুর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়।

ইংরেজ : ওলন্দাজদের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ ভারতে এলেন বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য সনদ দেন। ভারতে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয় সুরাটে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি পেয়ে। পোর্তুগীজ প্রভাব যখন কমছে আর ফরাসীরা প্রবল হয়ে উঠে নি, ঠিক সেই সময়ে ইংরেজরা নানা জায়গায় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলল—মাদ্রাজে, সেখান থেকে বালেশ্বর হয়ে হুগলীতে এবং শেষকালে কলকাতায়। শাহজাহানের আমলে বালেশ্বর, পাটনা, হুগলী ও কাশীমবাজারে ইংরেজদের ব্যবসা করতে দেওয়া হয় এই সর্তে যে তাঁরা মুঘল সরকারকে বছরে তিন হাজার টাকা নগদ দিলে আর অন্যান্য বাণিজ্যশুল্ক তাঁদের দিতে হবে না। এই শুল্ক নিয়ে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে বাঙলায় রাজকর্মচারীদের বিবাদ শুরু হল। কিছু দিন পরে কোম্পানির এজেণ্ট জব চার্ণক হুগলীর আরও দক্ষিণে গঙ্গার তীরেই একটি সুবিধামত জায়গা খুঁজতে লাগলেন যেখানে নির্বিবাদে কুঠির ব্যবসা করা যায়, সমুদ্রপথে বিলাতী জাহাজ এসে সহজে দাঁড়াতে পারে। অতঃপর ১৬৯০ সালে সুতানুটিতে একটি কুঠি স্থাপন করলেন। তারপর সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ইজারা নিয়ে ১৬৯৮ সালে কলকাতা শহরটি গড়ে উঠল। সেখানে বাঙলার সুবাদারের অনুমতি নিয়ে ১২০০০ টাকা খাজনায় প্রথম ইংরেজ বসতি স্থাপিত হল।

ফরাসী : ভারতের সঙ্গে লাভজনক ব্যবসায় ভাগ নেবার জন্য শেষে এল ফরাসী বণিকদল। এরাও ইংরেজের মত গোড়ায় মাদ্রাজ অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরি করে যেটি পরে পণ্ডিচেরী নগরে পরিণত হয়। ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে তারা বাঙলার নবাবের কাছ থেকে চন্দন নগর লাভ করে। এর ফলে ইংরেজদের সামনে এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হল। আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে দুবার সংঘর্ষ হল, প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ। উভয়েরই উদ্দেশ্য, এদেশের ভিতরকার কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বিস্তার। ইংরেজদের সেনাপতি ক্লাইভ, শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন। য়ুরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতে একই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডই শেষে জয়ী হয়। তারপর থেকে বাঙলায় এবং বাঙলা থেকে সারা উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যেও ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার হতে থাকে। অবশেষে ইংরেজদের হাতেই ভারতের বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঁধা রইল আর বাঙলা দেশে পলাশীর যুদ্ধের পর তাদের টাকা পয়সার স্বার্থ ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গেল।

পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকরা হটে যাওয়াতে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের চরম মীমাংসার জন্য দুটি য়ুরোপীয় জাতি, ইংরেজ ও ফরাসী, এবার মুখোমুখি দাঁড়াল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে তারা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে বাণিজ্য করছিল। ভারতে আধিপত্য বা সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা তখনও ছিল না। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি উভয় পক্ষই এদেশে রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে লাগল। এ বিষয়ে অগ্রণী হল ফরাসীরা। তার ফলে ১৭৪০ সাল থেকে য়ুরোপে এবং সেই সূত্রে ভারতেও প্রাধান্য লাভের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। বাধল ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক অঞ্চলে, ১৭৪৬ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এই সংঘর্ষ শুধু ভারতে নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকাতেও বিস্তৃত হয়।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব : ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে **দুপ্লের** নাম জড়িত হয়ে আছে। ১৭৪২ সালে ফরাসী অধিকারগুলির শাসক রূপে তিনি পণ্ডিচেরীতে আসেন। সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার খুব দুর্যোগ, মুঘল রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার দাখিল। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির কাঠামোও ছিল দুর্বল। এই সব দেখে দুপ্লে ফরাসী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। এই সময়ে য়ুরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিপরীত দলে জড়িত হয়েছিল। ভারতেও কর্ণাটের উত্তরাধিকার নিয়ে বিভেদের ফলে, ইংরেজ ও ফরাসীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হল। দুই পক্ষ দুই জায়গায় এক এক দাবিদারের সাহায্যে এগিয়ে এল।



দুপ্লে

ইংরেজ পক্ষের নায়ক ছিলেন **রবার্ট ক্লাইভ** যিনি আগে কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন পরে সৈনিক হন। তাঁর নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্য আর্কট অধিকার করলে দুপ্লের বৃহৎ কল্পনা কাজে পরিণত হতে পেল না। দুপ্লে পদচ্যুত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। এই দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার উভয়ে স্থির করলেন, ভারতের ভিতরকার ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁরা আর জড়িত হবেন না।

১৭৫৬ সালে য়ুরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) আরম্ভ হলে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীরা তৃতীয় পরীক্ষায় উদ্যত হল। ১৭৫৮ সালে ফরাসী সরকার লালীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পণ্ডিচেরীতে পাঠালেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) জয়লাভ করে প্রতিপত্তি বাড়ান এবং বাঙলার নবাবের সঙ্গে ফরাসীদের জোট বাঁধার সম্ভাবনা দূর করেন। ইংরেজদের ভাগ্য এবার ফিরে গেল। তারপর ১৭৬০ সালে ওয়াণ্ডিওয়াশের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি সার আয়ার কূট লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। পণ্ডিচেরী শহরটি বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের আশা ধূলিস্যাৎ হল। ১৭৬৩ সালে সপ্তবর্ষ যুদ্ধের শেষে য়ুরোপের ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে **প্যারিসের** সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে সাব্যস্ত হল, ফরাসীদের কুঠি উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু সেখানে দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করা চলবে না। এই ইংরেজ-ফরাসী দ্বন্দ্ব য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে, তিনটি অঞ্চলে একত্র শুরু হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংরেজরা ফ্রান্সকে উত্তর আমেরিকায় কানাডা থেকে বিতাড়িত করলে ভারতেও তার ফলাফল দেখা গেল। বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বিচার করতে হবে। এই দ্বন্দ্ব আসলে উপনিবেশ নিয়ে বিবাদ অর্থাৎ সেখানকার বাণিজ্য দখল নিয়ে স্বার্থের সংঘাত। অতএব যে পক্ষের সমুদ্র অধিকার ও নৌবল বেশি, তার জয়ের সম্ভাবনাও বেশি। ইংরেজদের অর্থবল ও সমুদ্রে আধিপত্য ছিল বেশি, আর বিলাতে কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সমর্থন তো ছিলই। বাঙলাকে প্রধান ঘাঁটি করে পূর্ব দিক থেকে উত্তরে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করা এখন নিষ্কণ্টক ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এল।

মারাঠা শক্তির প্রসার ও রাজ্যবিস্তার : আওরঙজীবের রাজত্বকালে মুঘল-মারাঠা যুদ্ধের কথা জেনেছ। এখন মারাঠাদের শক্তিপ্রসার ও সাম্রাজ্যগঠনের কাহিনী বলছি। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের যে গৃহবিবাদ শুরু হয় তখন থেকে রাজার চেয়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পেশবারই প্রাধান্য বেশি। এই পেশবাদের নেতৃত্বে মারাঠা জাতি আরও শক্তিশালী হয়, মুঘলদের অবনতির সুযোগ নিয়ে তাঁরা একটি 'হিন্দু-পদ পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনে সচেষ্ট হন। ১৮১৮ সাল পর্যন্ত তাদের খানিক প্রতিপত্তি ছিল। তাই বলা যায়, ইংজেরা মুঘলদের কাছ থেকে নয়, মারাঠাদের হাত থেকেই ভারতের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করে নেয়।

আওরঙজীবের মৃত্যুর পর থেকেই মারাঠা শক্তির প্রসার শুরু হয়। খাস মহারাষ্ট্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে মারাঠারা হানা দিতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে গৃহবিবাদের

সূত্রপাত হল শাহু ও তারাবাঈ এর মধ্যে। সৌভাগ্যক্রমে বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শাহুর প্রধানমন্ত্রীও সহায় হন। তাঁরই সাহায্যে শাহ সিংহাসনে বসেন এবং এখন থেকে মারাঠারা মুঘলরাজ্যের মিত্রশক্তি হিসাবে গণ্য হল। এই মুঘল-মারাঠা সন্ধি বালাজী বিশ্বনাথের কৃতিত্ব। তিনি কয়েকজন মারাঠা নায়কদের নিয়ে মারাঠাচক্র সৃষ্টি করেন এবং পেশবার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়ান।



বালাজী বিশ্বনাথের ছেলে প্রথম বাজী রাওএর আমলে মারাঠাদের আরও শক্তিবিস্তার হয়। রণকৌশলে ও রাজনীতি জ্ঞানে তাঁর কৃতিত্ব পিতার চেয়ে বেশি। মুমূর্ষু মুঘল সাম্রাজ্যকে নষ্ট করে সিন্ধু থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। একেই 'হিন্দু-পদ পাদশাহী' বলা হয়। মারাঠারা

একদিকে গুজরাট ও মালব, অপরদিকে নিজামকে হারিয়ে দিয়ে নর্মদা থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ দখল করে নিল। পোর্তুগীজদের কাছ থেকে সালসেট ও বেসিন অধিকার (১৭৩৯) বাজী রাও-এর এক কৃতিত্ব। ১৭৪০ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়ে মারাঠাদের প্রতিষ্ঠা অনেক বেড়েছিল।

বাজী রাও এর ছেলে বালাজী বাজী রাও পিতার মত বিচক্ষণ না হলেও উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তি প্রসারে সচেষ্ট হন। তাঁর সময় থেকে পেশবার পদ বংশানুক্রমিক হয় এবং তাঁর আমলে মারাঠা রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। কিন্তু তিনি মারাঠা নায়কদের বংশগত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দেন। বরোদার পিলাজী গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের রনজি সিন্ধিয়া, ইন্দোরের মলহর রাও হোলকার এবং নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা প্রথম পেশবার কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও পরে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ এলাকায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মারাঠার কেন্দ্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পতনের পথও পরিষ্কার হয়। তবু বালাজী বাজী রাও এর আমলে মারাঠাদের সমকক্ষ কোনও শক্তিই ভারতে ছিল না, তারা ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে উঠে। ১৭৫৮ সালে আহম্মদ শা আবদালীর অনুপস্থিতে মারাঠারা পাঞ্জাব দখল করে নেয়। তার ফলে **পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ** বাধল, পাণিপথের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে মারাঠা সৈন্য আহম্মদ শা'র সৈন্যদলের সম্মুখীন হল। এই চূড়ান্ত সংগ্রামের কথা আগে বলা হয়েছে। মারাঠা বাহিনী অসীম সাহসে যুদ্ধ শুরু করলেও দুর্বার পাঠান সৈন্যের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে বিনষ্ট হল। ১৭৬১ সালে জানুয়ারী মাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের ভাগ্য এক হিসাবে নির্ধারিত হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের ফলাফল খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ পেশবার নেতৃত্বে গাইকোয়াড় সিন্ধিয়া প্রভৃতি মিলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যসংঘ গড়ে ওঠে, পাঞ্জাব-দিল্লী পর্যন্ত যে মারাঠাচক্রের প্রতাপ বিস্তৃত হয়, এখন সেই একতা ছিন্ন হয়ে গেল, পেশবার পদমর্যাদাও ক্ষুন্ন হল। পানিপথের পরও প্রায় চল্লিশ বছর মারাঠাদের শক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি, দিল্লী অঞ্চলে তারা আবার আধিপত্য ফিরিয়ে আনে, কিন্তু পানিপথের পরাজয়ের প্রচণ্ড আঘাত তারা পুরো সামলাতে পারেনি। তাঁদের পরাজয়ে যে জাতি লাভবান হল তারা আফগান নয়, বঙ্গবিজয়ী ইংরেজ। আর সুবিধা হল হায়দর আলির, যিনি এই সুযোগে মহীশূরে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মারাঠা প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেন।

শিখ শক্তির উত্থান: এখানে শিখ জাতির উদ্ভব থেকে রণজিত সিংহের উত্থান পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বলি। গুরু নানকের পবিত্র জীবন ও উপদেশ তোমরা আগে পড়েছ। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি হল শিখ ধর্মের প্রধান অঙ্গ। গুরুর অনুগামী ভক্তরা **শিষ্য বা শিখ** নামে একটি নতুন সম্প্রদায়ে পরিণত হল। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ সৈন্য ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে কয়েকবার মুঘল সৈন্যদের হারিয়ে দেন। তিনি শিষ্যদের পহল' দীক্ষা দিয়ে তাদের একতাবদ্ধ যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করেন। প্রত্যেক শিখ হলেন গুরুর পুত্র। জাতিভেদ না মেনে শিষ্যরা পরস্পর ভ্রাতৃভাব পোষণ

করবে, এই ছিল গুরু গোবিন্দের আদেশ। এরপর তিনি গুরুর পদ উঠিয়ে দিয়ে 'খালসা' (মুক্ত) নামে পবিত্র ধর্ম-সংঘ স্থাপন করেন। শিখরা 'গ্রন্থসাহেবে' গুরুর উপদেশমত সাধন ভজন করতে থাকে। মহম্মদ শা আবদালী যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন তখন শিখদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ হয়। আহম্মদ শা আবদালী চলে যাওয়ার পর শিখরা আবার প্রবল হয় এবং লাহোর দখল করে। এই সময়ে কয়েকটি **'মিশল'** বা শিখ দলের উৎপত্তি হয়, যেমন ভাঙ্গী, কানহাইয়া, সুকর-চাকিয়া ইত্যাদি। এই সব সর্দার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত অনেক শিখ সৈনিক নিয়ে প্রায় সমস্ত পাঞ্জাব অধিকার করে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 'রাখী' নামে এক রকম কর আদায় করতে থাকে। ক্রমে অন্যান্য দলের মধ্যে সুকর-চাকিয়া মিশলটি সব চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রণজিৎ সিংহ ছিলেন এই মিশলের নেতা। তিনিই প্রথম সুসংবদ্ধ শিখরাজ্য গঠন করে পাঞ্জাবে বিরাট শিখ শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৩ সালে রণজিৎ সিংহ অমৃতসর দখল করেন এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম পারে শিখ মিশলগুলি তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে। তারপর রণজিৎ সিংহ শতদ্রু পার হয়ে লুধিয়ানা শহর অধিকার করেন। বড়লাট মিণ্টো রণজিতের তৎপরতায় ভয় পেয়ে তাঁকে শতদ্রু নদীর পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখতে মনস্থ করলেন। ১৮০৯ সালে রণজিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে **অমৃতসরের সন্ধি** হল। স্থির হল, শতদ্রু নদী তাঁর রাজ্যের পূর্বসীমা নির্দিষ্ট হবে ঐ নদীর দক্ষিণে ও পূর্বে তিনি রাজ্য বিস্তার করবেন না। রণজিৎ তাঁর জীবদ্দশায় এই প্রতিশ্রুতি অমান্য করেন নি।



রণজিৎ সিং

১৮১৭ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা বিস্তার হয় সব চেয়ে বেশি। তিনি ফরাসী ও বিদেশী সেনাপতির তত্ত্বাবধানে একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। ঐ সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি জম্মু কাশ্মীর মুলতান জয় করেন এবং সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের কাছ থেকে পেশোয়ার দখল করেন। এই ভাবে সমগ্র পাঞ্জাবে ও সিন্ধুনদের কিছুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে রণজিৎ সিংহ 'পাঞ্জাব কেশরী' বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি করে ভালা কাজ করেন নি। কিন্তু শিখ রাজ্য তখন সদ্য স্থাপিত, তাকে স্থিতিশীল করা আগে দরকার ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৩৯) শিখদের অধোগতি শুরু হয়।

এক নজরে

* সুলতানী আমলের শেষ দিকে ভারতের সর্বত্র যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিয়েছিল। সেই সুযোগে কাবুল ও কান্দাহারের রাজা বাবর তিন বার ভারত আক্রমণ করেন।
* তৃতীয় বারের অভিযানে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসনের সূচনা করেন।
* বাবরের মৃত্যুর পর তার তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হলেন।
* চৌসা ও বিল্বগ্রামের যুদ্ধে আফগান নেতা শেরশাহ হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন।
* শেরশাহের মৃত্যুর পর আবার হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে মুঘল-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।
* হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর মাত্র তের বছর বয়সে দিল্লীর বাদশাহ হলেন। ১৫৬১ সাল থেকে একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে তিনি একটির পর একটি রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করে একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।
* আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
* জাহাঙ্গীরের পর শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক উন্নতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল।
* শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ দেখা দেওয়ায় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে।
* শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব কূট কৌশলে ও বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে সিংহাসন অধিকার করে। তাঁর রাজত্বকালেই আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে এগিয়ে যায়।
* মুঘল আমলে একাধিক য়ুরোপীয় পর্যটক এদেশে এসেছিলেন। এদের মধ্যে স্যার টমাস রো, বার্নিয়ে, টেভার্নিয়ে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
* মুঘল আমলে একাধিক য়ুরোপীয় ,ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এসে এদেশের রাজনীতিকে জটিল করে তোলে।
* ভারতে মারাঠা ও শিখ শক্তি প্রবল হলেও শেষ পর্যন্ত বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত করতে পারে নি।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? * কত খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয় ? * পানিপথের যুদ্ধে কে কাকে পরাস্ত করেছিলেন ? * শের খাঁ কে ছিলেন ? * কোন কোন যুদ্ধে হুমায়ুন শের খাঁর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন ? * আকবর কোথায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন ? * শের শাহ কত বছর ভারতে রাজত্ব করেছিলেন ? * স্বল্পকালীন রাজত্বকালে শের শাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কি ? * পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল ? * পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে কে কার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ? * রাণা প্রতাপ কে ছিলেন ? তিনি কোন যুদ্ধে আকবরের কাছে পরাস্ত হন ? * আকবরের নবরত্ন সভার গুণীব্যক্তিদের নাম কি ? * আইন-ই-আকবরী কে রচনা করেছিলেন ? * নূরজাহান কে ছিলেন ? * ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে কে বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধার জন্য মুঘল দরবারে এসে-ছিলেন ? * ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস কাকে দূত হিসেবে আগ্রায় পাঠিয়েছিলেন ? * শাহজাহান কত খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন ? * শাহজাহানের শিল্পকীর্তির কয়েকটি উদাহরণ দাও। * শিবাজী কে ছিলেন ? কে তাঁকে পার্বত্য মূষিক বলে বিদ্রূপ করতেন ? * কত খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব মারা যান ? * দুপ্লে কে ছিলেন ? * হিন্দুপদ পাদশাহী বলতে কি বুঝায় ? * পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত সালে কাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল ? * সুসংবদ্ধ শিখরাজ্য কে গঠন করেছিলেন ? * খালসা কথাটির অর্থ কি ? * অমৃতসরের সন্ধি কোন বছর কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কে কবে কি ভাবে করেছিলেন ?

২। হুমায়ুন কে ছিলেন ? তাঁকে ভাগ্যহীন বলা হয় কেন ? তিনি সিংহাসন ছেড়ে কেন চলে গেলেন ?

৩। শের শাহ কত বছর রাজত্ব করেন ? শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। আকবর কোন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ভারতের সিংহাসনে বসেন ? তিনি রাজপুতদের প্রতি কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন ?

৫। জাহাঙ্গীরের আসল নাম কি ? তিনি কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ? তাঁর রাজত্বকালের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ কর।

৬। শাহজাহানের রাজত্বকালের দুটি প্রধান ঘটনা উল্লেখ কর।

৭। শাহজাহান যে শিল্পকলার বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার প্রমান কি ? আগ্রায় ও দিল্লীতে শাহজাহানের কি কীর্তি আছে ?

৮। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এই বিবাদের কি পরিণতি হয়েছিল।
৯। আওরঙ্গজেব কি ভাবে সম্রাট হলেন? তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের কারণ কি?
১০। আওরঙ্গজেবের চরিত্রের দোষ ও গুণগুলি উল্লেখ কর।
১১। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবকে দায়ী করা হয় কেন?
১২। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি কি? কোনটি মূল কারণ বলে তোমার মনে হয়?
১৩। মারাঠাশক্তি বিস্তারে প্রথম বাজীরাও এর কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৪। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
১৫। সাম্রাজ্যের সংগঠক হিসেবে রণজিৎ সিংহের পরিচয় দাও।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। ভারতে মুঘলরা কি ভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সংক্ষেপে বিবৃত কর।
২। পানিপথের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।
৩। শেরশাহ কি ভাবে ভারতে আফগান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিবেন? তাঁর শাসনকালের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৪। আকবরের রাজ্যবিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৫। আকবরের শাসনব্যবস্থা আলোচনা কর।
৬। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। শাহজাহানের শিল্পকীর্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।
৮। আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তারের কাহিনী বিবৃত কর।
৯। আওরঙ্গজেবের সিংহাসন লাভ ও রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
১০। মুঘল যুগের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও।
১১। মুঘল যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
১২। মুঘল আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় দাও।
১৩। আওরঙ্গজেবের পরবর্তিকালে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী আলোচনা কর।
১৪। ভারতবর্ষে কোন কোন ইউরোপীয় দেশের বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছিল? কোন দেশের বণিকেরা প্রথম এসেছিল?
১৫। ইউরোপীয় বণিকদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধের ফলে কারা শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিল?
১৬। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৭। মারাঠা শক্তির উত্থান ও পতনের কাহিনী বর্ণনা কর।

১৮। শিবাজী কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে ভারতে মারাঠা শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

১৯। পেশোয়া কাদের বলা হতো? প্রথম তিন জন পেশোয়ার আমলে মারাঠা শক্তির বিস্তৃতির কথা লেখ।

২০। ভারতে শিখ শক্তির উত্থান ও পতনের কাহিনী বর্ণনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] নিচের 'ক' ও 'খ' স্তম্ভের বাক্যাংশ নিয়ে শুদ্ধ বাক্য গঠন কর ঃ

ক স্তম্ভ	খ স্তম্ভ
(ক) ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবর	বিশাল প্রাসাদ আকবরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।
(খ) যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যও	আবুলফজলের আইন-ই আকবরী ও আকবর নামা খুবই মূল্যবান।
(গ) অনেক স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ফতেপুর সিক্রির	ঘোঘরার যুদ্ধে বাংলা বিহারের দূর্দান্ত আফগান সর্দারদের পরাজিত করেন।
(ঘ) ইতিহাসের দলিল হিসেবে	আকবরের সেনাপতি মানসিংহের কাছে পরাজিত হন।
(ঙ) শাহজাহানের রাজত্বকালকে	এলিজাবেথ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার অনুমতি দেন।
(চ) ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রানী	আরম্ভ হলে ভারতে ইংরেজ ফরাসীরা শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলো।
(ছ) ১৭৫৬ সালে য়ুরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ	মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।
(জ) ১৮০৯ সালে রনজিৎ সিংহ ও ইংরেজদের	মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি হলো।

[দুই] সংশোধন কর ঃ

(ক) বাবর খানুয়ার যুদ্ধে রাণা প্রতাপকে পরাস্ত করেন।

(খ) স্যার টমাস রো শাহজাহানের রাজদরবারে এসেছিলেন।

(গ) গুরু গোবিন্দ শিখদের প্রথম গুরু।

(ঘ) আলিবর্দী খাঁ অযোধ্যার নবাব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঙ) ফারুক শিখর স্যার টমাস রোকে ফর্মান দিয়েছিলেন।

ব্যবহারিক অনুশীলন

[এক] পরের পৃষ্ঠায় ছকের বাঁদিকে মুঘল বাদশাদের চিত্র দেওয়া আছে।

ডানপাশের শূন্যস্থানে এঁদের নাম, সিংহাসন লাভের সময়কাল, বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ উল্লেখ কর ঃ





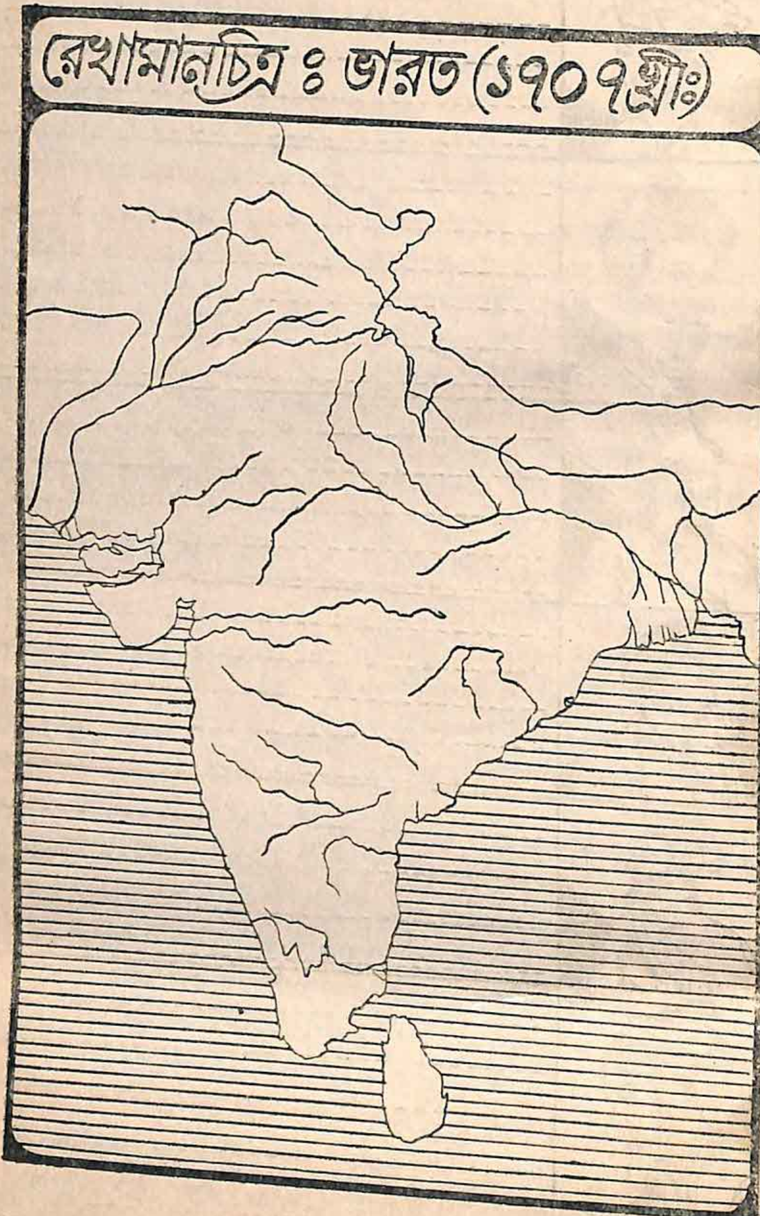








১। ভারতের রেখামানচিত্রে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার মোটা কাল রেখার সাহায্যে দেখাও এবং নিম্নলিখিতগুলির অবস্থান দেখাও : দিল্লী, আগ্রা, পানিপথ, মূলতান, গৌড়, বারাণসী, চিতোর, উজ্জয়িনী, সুরাট, মেবার, আমেদাবাদ, গণ্ডোয়ানা, খান্দেশ।



২। প্রদত্ত রেখা মানচিত্রে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তার রেখা মানচিত্রে প্রদত্ত সংকেতের সাহায্যে দেখাও ঃ

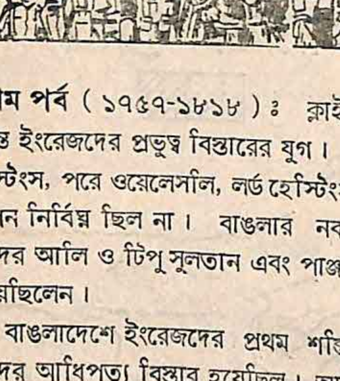




৭ ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার

প্রথম পর্ব (১৭৫৭-১৮১৮) : ক্লাইভের আমল থেকে ডালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের যুগ। এই কাজে অগ্রণী ছিলেন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস, পরে ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস ও ডালহৌসি। ভারতে ইংরেজদের সর্বাধিপত্য স্থাপন নির্বিঘ্ন ছিল না। বাঙলার নবাবরা, পেশবাদের নেতৃত্বে মারাঠারা, মহীশূরে হায়দর আলি ও টিপু সুলতান এবং পাঞ্জাবে শিখরা ইংরেজদের শক্তিপ্রসারে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন।

বাঙলাদেশে ইংরেজদের প্রথম শক্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেখান থেকেই উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল। আলিবর্দি খাঁ বাংলার নবাব হলেন ১৭৪০ সালে। তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে কলকাতায় ইংরেজ ও চন্দননগরের ফরাসীরা দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করে। তাঁর পরে দৌহিত্র **সিরাজউদ্দৌলা** মসনদে বসেন (১৭৫৬ খ্রীঃ)। নানা কারণে ক্রুদ্ধ সিরাজ কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি দখল করে কলকাতা আক্রমণ করলেন। তখন ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে এসে কলকাতা দখল করেন ও ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন। **আলিনগরের সন্ধি** কিন্তু স্থায়ী হল না। ইতিমধ্যে সিরাজের আত্মীয় মীরজাফরকে নবাব করার ঘোর ষড়যন্ত্র চলছিল। ক্লাইভও সেই চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু সিরাজ



লর্ড ক্লাইভ

তাঁর সেনাপতি মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ধনী বণিক জগৎশেঠ, ব্যবসায়ী উমিচাঁদের চক্রান্ত ভাঙতে পারেন নি। তাই **পলাশীর যুদ্ধে** (১৭৫৭) তিনি সিংহাসন হারালেন এবং ধরা পড়ে নিহত হলেন। পলাশীর যুদ্ধ এমন কিছু বড় লড়াই নয়, কিন্তু তার ফলে ইংরেজদের ভবিষ্যতে শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়ল। মীরজাফর অকর্মণ্য হলেও ওলন্দাজদের সাহায্যে তিনি ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ক্লাইভের তৎপরতায় **বিদেরার যুদ্ধে** ওলন্দাজরা পরাস্ত হয়। এখন মীবজাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাই মীরকাশিমকে মসনদে বসালেন। নবাবীর বদলে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের ভার

কোম্পানীকে দিতে হল। **মীরকাশিম** ইংরেজদের মতলব বুঝতে পেরে মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নেন। এইবার ইংরেজের সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি বিবাদ বাধল। কোম্পানির নামে কর্মচারীরা নিজের নিজের ব্যবসা চালিয়ে শুল্ক ফাঁকি দিচ্ছিলেন। মীরকাশিম কড়া ব্যবস্থা নিলে যুদ্ধ শুরু হল। কাটোয়ায়, ঘেরিয়া ও উদয়নালায় তিনটি যুদ্ধেই মীরকাশিম হেরে গেলেন, তারপর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৬৪ সালে **বক্সারের যুদ্ধে** মীরকাশিম একেবারে পরাস্ত হলেন। বাংলা দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব যেমন শিকড় বিস্তার করল, তেমনি অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হল। সিরাজ থেকে মীরকাশিম—এই পর্বে বাংলার মসনদ নিয়ে যে খেলা চলছিল, তার পরিণতি হল ১৭৬৫ সালে। এটা ইংরেজ শক্তির উত্থান কাহিনী। ইংরেজেরা কৌশলে আট বছরে তিন বার বাঙলায় বিপ্লব ঘটাল। পলাশীর চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব বেশি, কারণ মীরকাশিমের পরাজয় থেকে ইংরেজদের স্বার্থ ও শক্তি আরও কায়েম হল।

কোম্পানির দেওয়ানি ঃ তারপর নামে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে ক্লাইভ এই বন্দোবস্ত করে নিলেন যে কোম্পানি তাঁকে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দেবেন, আর বাদশাহ কোম্পানিকে তার পরিবর্তে বাঙলা বিহার ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেবেন। একেই বলা হয় **দেওয়ানি প্রাপ্তি**। এই সনদের ফল হল সাংঘাতিক। নবাব হলেন নামে দেশের সরকার, ইংরেজের অনুগ্রহে। আসলে কোম্পানিই দেশের শাসক। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত এই রকম ব্যবস্থাই চলেছিল। তারই মাঝে এল ১৭৭৬ সালে দুর্ভিক্ষ, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'।

মহীশূর ঃ মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যাচ্ছিল, সেই সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা, হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি প্রবল হয়ে উঠেন। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুবিধা খুঁজছিলেন, তার ফলে ভারতের রাজনীতির মধ্যে জড়িত হন। কর্ণাটের যুদ্ধ, মহীশূর ও মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির শক্তিপরীক্ষা তারই সাক্ষ্য। ইংরেজদের সঙ্গে মহীশূরের সংগ্রাম চলেছিল ত্রিশ বছর। বিদেশীর প্রতিরোধে হায়দর আলি ও তার পুত্র টিপু সুলতানের ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। হায়দর অনেক ফরাসী সৈন্য রেখে নিজের সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করে তোলেন। কিছুকাল পরে মহীশূর রাজের মৃত্যু হলে হায়দর রাজ্যের প্রকৃত কর্তা হন।

চারটি মহীশূর যুদ্ধ ঃ নিজাম ও মাদ্রাজে ইংরেজরা হায়দরের প্রতাপ বৃদ্ধিতে বিশেষ বিচলিত হয়ে তাঁকে দমন করবার চেষ্টায় রইলেন। ১৭৬৯ সালে মহীশূরের সেনাবাহিনী যখন মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে হাজির হল, তখন ইংরেজরা ভীত হয়ে হায়দরের সর্তমত সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধি দ্বারা স্থির হল, বিজিত জায়গাগুলি পরস্পরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ইংরেজরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় হায়দর তাদের উপর জাতক্রোধ হয়ে রইলেন।

দশ বছর পরে হায়দর আলি, নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজদের বিপক্ষে জোট-বদ্ধ হলেন। এই তিন পক্ষ যদি একত্রভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেন, তাহলে ভারতে বিদেশীর অস্তিত্ব বিপন্ন হত, সন্দেহ নেই। হায়দর আলির সুযোগ এল যখন ইংরেজরা শত্রুপক্ষ ফরাসীদের পণ্ডিচেরি নগর ও মাহে বন্দর দখল করলেন। এই বন্দরটি ছিল মহীশূর রাজ্যে, কাজেই হায়দর ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন (১৭৮০)। প্রথম দিকে ইংরেজ সেনাবাহিনী হারতে থাকে। তখন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুটকে দক্ষিণ ভারতে পাঠালেন। ত্রিশক্তির জোট ভেঙ্গে গেল হেস্টিংস এর কূট চালে। পোর্টোনোভো, পলিলুর প্রভৃতি একটির পর একটি যুদ্ধে সেনাপতি কুট হায়দরকে পরাস্ত করতে লাগলেন, কিন্তু এইসব পরাজয়ের পরও হায়দর দমেন নি। মালাবার উপকূলে এক ইংরেজ সৈন্যদল হায়দরের ছেলে টিপুর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ইংরেজদের অবস্থা বিপন্ন হয়ে ওঠে। সেই সময় হায়দর আলির মৃত্যু হল (১৭৮২)।



হায়দর আলি

কিন্তু টিপু অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন এবং এক ইংরেজ সেনাপতিকে সৈন্যসমেত বন্দী করলেন। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের যখন দুরবস্থা, তখন য়ুরোপের যুদ্ধ থামল এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি হলে টিপুর সঙ্গে ইংরেজরা **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি** করলেন (১৭৮৪)। টিপু ও ইংরেজরা পরস্পরকে বিজিত জায়গাগুলি ফিরিয়ে দিতে স্বীকার করলেন। মহীশূরের সঙ্গে কোনও নিষ্পত্তি হল না।

কয়েক বছর পরে কর্নওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে এলেন। ১৭৯২ সালে টিপুর পরাজয় হল। তিনি **শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি** করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে মহীশূরের অর্ধেক অংশ ছেড়ে দিতে হল, যুদ্ধের খেসারৎ বাবদ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকাও দিতে হল। উপরন্তু ইংরেজরা তাঁর দুই ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এসে জামিন হিসাবে রেখে দিলেন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে সংঘর্ষের অবসান হয়নি। শেষ যুদ্ধের জন্য ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই দায়ী। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব পাকা করার উদ্দেশ্যে ওয়েলেসলি 'অধীনতামূলক মিত্রতা' (**সাব্‌সিডিয়ারি অ্যালায়েন্স**') প্রবর্তন করলেন। এই নীতি যে যে রাজা গ্রহণ করবেন, তাঁরা ইংরেজের কাছে বশ্যতা স্বীকারে আবদ্ধ থাকবেন। ইংরেজ তাঁদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ভার নেবেন

কিন্তু বশ্য রাজারা কোম্পানির অনুমতি ছাড়া অপর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাবেন না, বিদেশী শক্তির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না। হয় নিজ ব্যয়ে তাঁদের রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে, নয় খরচ বাবদ রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে হবে। নিজাম অবশ্য এই রকম সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন, কিন্তু টিপু এই রকম অপমানসূচক সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে টিপু ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উৎসুক হলেন। তখন ওয়েলেসলি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন (১৭৯৯) এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ দুই দিক থেকে ইংরেজ সৈন্যদল পাঠালেন টিপুকে আক্রমণ করতে। টিপু পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজ সৈন্য দুর্গ অবরোধ করলে টিপু যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হলেন। তখন ইংরেজ সৈন্যরা শ্রীরঙ্গপত্তন লুঠ করে। যুদ্ধের পর রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজ ও নিজাম ভাগাভাগি করে নেন। সুদূর দক্ষিণে ইংরেজদের আধিপত্য পাকা হল।

মারাঠা যুদ্ধ ঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের সম্পূর্ণ পতন হয়নি। ইংরেজদের সঙ্গে নানা যুদ্ধে মারাঠারা বলিষ্ঠ প্রতিরোধ করেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত নেতা রাজনীতিতে বিচক্ষণতার পরিচয়ও দেন, যেমন নানা ফড়নবিশ, মাহাদজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাঈ প্রভৃতি। বালাজী বাজী-রাও এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে **মাধব রাও চতুর্থ পেশবা** হলেন। কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠাদের গৃহবিবাদ শুরু হল। প্রথমে পেশবা পদ নিয়ে ঘরোয়া ষড়যন্ত্র। **পঞ্চম পেশবা নারায়ণ রাও** যখন রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে নিহত হলেন, তখন রঘুনাথ নিজেকে পেশবা বলে ঘোষণা করলেন। এই থেকে ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সূত্রপাত। রঘুনাথ বা রাঘোবা ইংরেজদের কাছে সাহায্য চাইলেন। সাহায্যের বদলে যুদ্ধের খরচ, দুটি জায়গা—**সালসেট ও বেসিন,** রঘুনাথ ইংরেজদের দিতে স্বীকার করলেন। ইংরেজ সেনার সাহায্যে রঘুনাথ নানা ফড়নবিশকে পরাস্ত করবার পর রঘুনাথ এবং ইংরেজরা উভয়েই পুরন্দরের সন্ধি না মানায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যুদ্ধের প্রথমে ইংরেজ সৈন্য ওয়াড়গাঁও নামক স্থানে পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ব্যবস্থা হল, ইংরেজরা রঘুনাথের পক্ষ নেবেন না আর মারাঠাদের কাছ থেকে পাওয়া জায়গাগুলি ছেড়ে দেবেন। ওয়ারেন হেস্টিংস কিন্তু এই অপমানজনক সন্ধি মানলেন না। ইংরেজরা পর পর যুদ্ধে জয়ী হচ্ছে দেখে মাহাদজী সিন্ধিয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হলেন এবং নিজেই মধ্যস্থ হয়ে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে **সালবাই-এর সন্ধি-সর্ত** ঠিক করে দিলেন। সন্ধির ফলে ইংরেজরা **মাধব রাও নারায়ণকে** পেশবা বলে স্বীকার করলেন। মাহাদজী সিন্ধিয়া তাঁর রাজ্যে ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল ফিরে পেলেন।



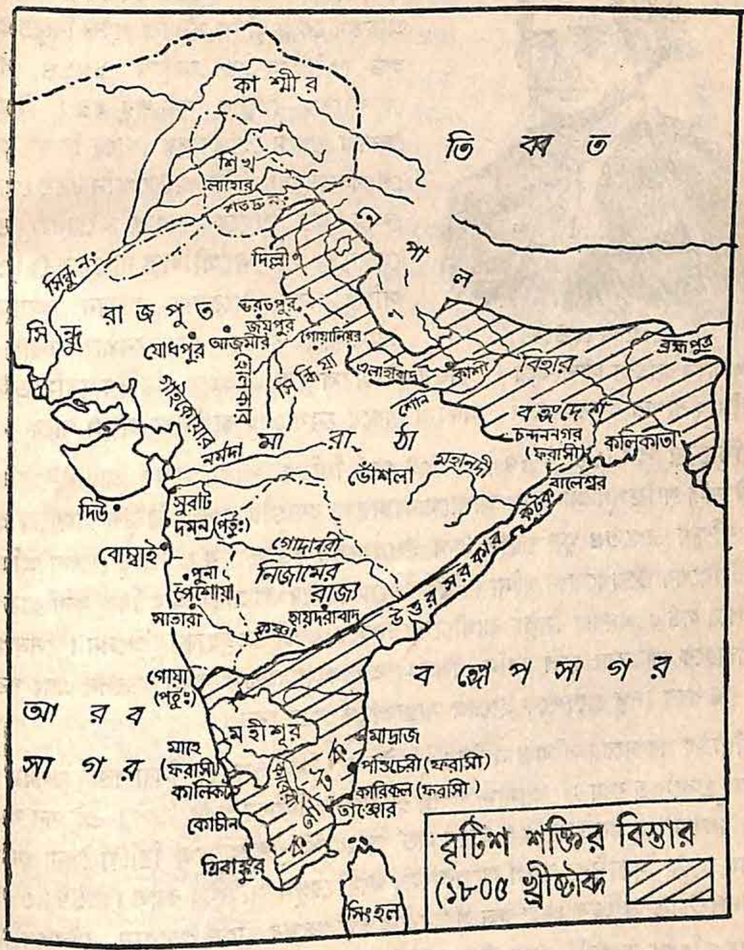
নানা ফড়নবিশ

দ্বিতীয় যুদ্ধ : দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় মারাঠাদের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন বুঝে বড়লাট ওয়েলেসলি পেশবাকে **অধীনতামূলক মিত্রতায়** বাঁধতে চাইলেন। এই সময়ে মারাঠাদের ভাগ্যে দুর্যোগ ঘনিয়েছিল। কারণ একে একে অহল্যাবাঈ, মাহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হল এবং ১৮০০ সালে প্রবীণ নানা ফড়নবিশও মারা গেলেন। মারাঠাদের মধ্যে একটি দৃঢ় শক্তির অভাবে আর গৃহবিবাদের ফলে ওয়েলেসলির পক্ষে এখন ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভব হল। পেশবা দ্বিতীয় বাজী রাও, দৌলত রাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্ত রাও হোলকার দ্বারা পদচ্যুত হয়ে, বেসিনে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন। তখন লর্ড ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি (পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন) পুনা দখল করে বাজী রাওকেই আবার গদিতে বসালেন। এই অনুগ্রহের বদলে বাজীরাওকে কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হল। তিনি ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে **বেসিনের সন্ধি** অনুযায়ী ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় বাবদ বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলেন। বাজী রাও-এর এই বশ্যতা স্বীকারে মারাঠা দলপতিরা ক্ষুব্ধ হলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৮০৩ সালে যুদ্ধ শুরু হল। **আসাই**-তে ইংরেজ সেনাবাহিনী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার মিলিত সৈন্যদলকে পরাজিত করে। ওদিকে উত্তর ভারতে সেনাপতি লেক সহজেই সিন্ধিয়াকে হারিয়ে দিলেন। তখন ভোঁসলা ও সিন্ধিয়াকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হল। ভোঁসলার সঙ্গে **দেবগাঁও** এবং সিন্ধিয়ার সঙ্গে **সুর্জিঅর্জনগাঁওতে** ইংরেজদের যে দুটি সন্ধি হল, তাতে ঐ দুটি রাজ্য থেকে আহমদনগর, বুন্দেল-খণ্ড, বেরার, ওড়িশা এবং দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশ ইংরেজদের হাতে চলে গেল। ভোঁসলা ও সিন্ধিয়া বশ্য মিত্রতায় আবদ্ধ হলেন, বৃদ্ধ শাহ আলমকে কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন করা হল। তারপর দীগের যুদ্ধে লর্ড লেকের কাছে হোলকারের সম্পূর্ণ পরাজয় হল (১৮০৪)। এই সময় ইংরেজদের আধিপত্য কতখানি বিস্তৃত হয়েছিল, মানচিত্রে দেখে নাও।


দ্বিতীয় বাজীরাও

তৃতীয় যুদ্ধ : ওদিকে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। কোম্পানি সেই খবর পেয়ে পেশবাকে আর একটি সন্ধিতে আবদ্ধ করলেন। ফলে বাজীরাওকে কোঙ্কন প্রদেশ ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। বাজীরাও এবার শেষ চেষ্টায় নামলেন। ১৮১৭ লালের নভেম্বরে তিনি পুনার পিছনে দিকে **খড়কী** (কিরকি) নামক স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। ইংরেজ পেশবার সেনাদল **কোড়েগাঁও** এবং **অস্টির** যুদ্ধে চূড়ান্ত ভাবে হারিয়ে দেয় (১৮১৮)। ইংরেজরা পুনা দখল করে নিল। বাজীরাও আত্মসমর্পণ করলে পেশবার পদ লোপ পেল এবং তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হল। ওদিকে হোলকার ও সিন্ধিয়া পরাস্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হল। সিন্ধিয়াকেও আর একটি নতুন সন্ধি-সর্তে

আবদ্ধ করা হল। এই ভাবে লর্ড **হেস্টিংস** মারাঠাদের শক্তি চূর্ণ করেন। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ শেষ হলে ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের অবসান ঘটল। সব মারাঠা রাজ্যই এখন ইংরেজের বশ্য ও অধীন হল। কেবল সিন্ধিয়ার কিছু স্বাধীনতা ও সামরিক ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল। **পুন্নিয়ার যুদ্ধে** গোয়ালিয়র সৈন্যরা হেরে যাওয়াতে শেষ মারাঠা রাজ্যটিও ইংরেজের



অধীন হয়ে গেল। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি নাগপুরের ভোঁসলাদের বাকি প্রদেশগুলি এবং ক্ষুদ্র সাতারা সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। মারাঠাদের পতনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রগতি প্রশস্ত হয়ে গেল, লর্ড হেস্টিংসের দৌলতে। ভারতে ইংরেজদের সর্বাধিপত্য-কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল দিল্লীতে তখন দ্বিতীয় আকবর বাদশাহ রয়েছেন যদিও নামে। লর্ড হেস্টিংস তাঁকে এই 'বাদশাহীর জের' ছাড়তে বললেন ও নজর দান বন্ধ করে দিলেন। এতদিন কোম্পানির টাকায় বাদশাহ শাহ আলমের নাম ছাপা থাকত। ১৮৩৫ সালের পর সেটিও উঠে গেল।

নেপাল যুদ্ধ ঃ ওয়েলেসলির পর লর্ড হেস্টিংসই ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৬৮ সালে পৃথ্বীনারায়ণ নামে এক গোর্খা নেতা নেপাল উপত্যকা ও কাঠমাণ্ডু দখল করে একটি গোর্খা রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে এই নেপাল রাজ্যের আয়তন বেড়ে বৃটিশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। লর্ড হেস্টিংস-এর নেতৃত্বে ১৮১৪ সালে গোর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ সৈন্যরা প্রথমে গোর্খাদের কাছে বিধ্বস্ত হয়। শেষকালে সেনাপতি অক্টরলোনি এসে গোর্খা নেতা অমর সিংহকে পরাস্ত করেন। তখন নেপালের সঙ্গে **সগৌলির** সন্ধি হয় (১৮১৬) সন্ধির ফলে ইংরেজরা বর্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা এবং নেপাল তরাই এর অনেকখানি জায়গা লাভ করে। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট বা প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য বিষয়ে নেপালের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকে।


ওয়ারেন হেস্টিংস

দ্বিতীয় পর্ব (১৮১৮-৫৭) ঃ এই পর্বে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার আরও দ্রুত হয়। বেণ্টিঙ্কের শান্তিপূর্ণ আমলেও আসামে কাছার ও জয়ন্তীয়া জেলা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। আর দক্ষিণ ভারতেও ক্ষুদ্র প্রদেশ 'কুর্গ' ইংরেজদের হস্তগত হয়। সিন্ধু প্রদেশ অধিকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একে নিছক জোরদখল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তারপরে লর্ড এলেনবরা সিন্ধুর আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজলেন। সেনাপতি নেপিয়ারকে পাঠানো হলে তিনি সিন্ধুর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করলেন এবং পরপর দুটি যুদ্ধ করে সিন্ধু প্রদেশকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

ব্রিটিশ সরকারের সীমান্ত নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রসারিত করা। আসাম-সংলগ্ন ব্রহ্মদেশের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই সব কারণে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ শুরু হয়। ১৮২৪ সালে লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে ব্রিটিশ সৈন্য কর্মীদের আসাম থেকে বিতাড়িত করল অল্পকালের মধ্যে রেঙ্গুন অধিকার করল। ১৮২৬ সালে **ইয়ান্দাবোর সন্ধির** ফলে ব্রহ্ম সরকারকে ইংরেজদের হাতে আরকান, টেনাসেরিম ও আসাম মণিপুর অঞ্চলটি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয়।

দুটি শিখ যুদ্ধ ঃ ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হলে শিখ রাজ্যে গৃহ বিবাদের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রণজিতের পর পুত্র খড়গ সিং রাজা হয়ে কিছুকাল পরে পদচ্যুত হন। এই সুযোগে ইংরেজরা পাঞ্জাব আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। শিখ সৈন্যদল কোম্পানির এলাকা আক্রমণ করতেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। উভয় পক্ষের মধ্যে পর পর কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। শিখরা হেরে যায়। মুদকি, আলিওয়াল, এই দুটি জায়গায় পর পর যুদ্ধে শিখরা চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়ে (১৮৪৬)

ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। লাহোরের সন্ধিতে জলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর বাম পাশের শিখ রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হল। ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানি লাহোর-দরবার থেকে দেড় কোটি টাকা আদায় করেন। ডালহৌসীর আমলে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয়। প্রথম শিখ যুদ্ধে শিখ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে বটে কিন্তু শিখরা তাকে চূড়ান্ত বলে মনে করেনি। ১৮৪৮ সালে ডালহৌসি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **চিলিয়ানওয়ালায়** উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলল। ইংরেজরা মূলতান অধিকার করলেন। পরের বছর গুজরাটে শিখদের আবার পরাজয় ঘটল। তখন ডালহৌসি এক ঘোষণা পত্রের দ্বারা পাঞ্জাব প্রদেশকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। দিলীপ সিংহকে পদচ্যুত করা হলে স্বাধীন শিখ-রাজ্যের অবসান হল, এখন শিখদের পতন কেন হল, তার কারণ, রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিংহই প্রথম ও শেষ নেতা। দিলীপ সিংহের সময়ে শিখদের পতন আসন্ন হয়। তাছাড়া ততদিন ভারতের অধিকাংশে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই পাঞ্জাবে শিখদের দমন করে রাজ্য দখল করা খুব শক্ত কাজ হয় নি, যদিও যুদ্ধে ইংরেজদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল মহীশূর ও মারাঠাদের পরাজয় মত শিখদের পরাজয় প্রায় একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি—স্বার্থনীতি, দলভেদ ও একতার অভাব।



লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসির আমল ঃ পাঞ্জাব অধিকার ছাড়া ডালহৌসি নানা উপায়ে অনেক দেশী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। দেশীয় রাজারা অপুত্রক হলে দত্তক পুত্র নিয়ে তাঁকে উত্তরাধিকারী করতেন। ডালহৌসি নিয়ম চালু করলেন, ইংরেজদের আশ্রিত কোন রাজ্যে দত্তকপুত্র গদি পাবেন না। যদি হিন্দু রাজ্যে দত্তক পুত্র নিতে হয় তা হলে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি দরকার। উদ্দেশ্য হল অপুত্রক অবস্থায় কোনও রাজা মারা গেলে তাঁর রাজ্য সরাসরি ইংরেজদের অধিকারে চলে আসবে। এটি 'স্বত্বলোপ নীতি' নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই নীতি প্রয়োগ করে **সাতারা, ঝান্সি, জয়পুর, নাগপুর** প্রভৃতি কয়েকটি ছোট রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হল। পোষ্যপুত্রের অধিকার সম্পূর্ণ বাতিল করে নেওয়াতে দেশীয় রাজারা এবং সাধারণ লোকও



নানা সাহেব

ঘোর অসন্তুষ্ট হন। এরপর ডালহৌসি **সিকিম রাজ্যের** খানিক অংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। ওদিকে **কর্ণাটের নবাব** মারা গেলে (১৮৫৩), তাঁরও কোনও উত্তরাধিকারীকে ডালহৌসি নবাব বলে স্বীকার করলেন না। তেমনি **তাঞ্জোরের** রাজাও মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারীর বৃত্তি ও রাজা উপাধি লোপ করা হল। হায়দরবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যে ইংরেজের সৈন্যদের ব্যয় বাবদ যে টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তা দিতে না পারায় **বেরার** প্রদেশটি ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ছিলেন ইংরেজদের বৃত্তিভোগী। তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৫৩) ডালহৌসি পেশবার দত্তকপুত্র **নানা সাহেবকে** বৃত্তি দিতে অস্বীকার করলেন। **অযোধ্যা** রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বলে ডালহৌসি সেটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বছরে বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করা হল। এই রকমে, কখনও আইনের কৌশলে কখনও বলপ্রয়োগ করে ডালহৌসি ভারতে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করলেন। ডালহৌসির শাসনকালেই ইংরেজ কর্তৃত্ব যখন কায়েম হল, ঠিক সেই সময়ে এল এক বড় বিদ্রোহ।

'সিপাহী বিদ্রোহ' বা প্রথম ভারতীয় বিপ্লব

বিদ্রোহের কারণ : ডালহৌসির রাজ্যবৃদ্ধি আর নানাবিধ আইন ও সংস্কারের ফলে এদেশের লোকের মনে যথেষ্ট অসন্তোষ ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী লাট ক্যানিং-এর সময়ে ভারতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ অচিরেই সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করল। এই সময়ে পুরানো বন্দুকের বদলে নতুন **এনফিল্ড রাইফেল** ব্যবহারে দেশী সিপাহীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হল। নতুন বন্দুকের টোটাগুলিতে চর্বি মাখানো থাকত এবং বন্দুকে পুরে নেওয়ার আগে টোটার একটি অংশ দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে হত। হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর সিপাহীদের মধ্যে খবর প্রচারিত হল, ঐ চর্বি গরু ও শূকরের। জাতিনাশ ও ধর্মহানির ভয়ে সিপাহীরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এই টোটা প্রচলনকেই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ বলা হয়। কিন্তু এটি উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত কারণগুলি নেপথ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। বিক্ষোভের আসল কারণগুলি ডালহৌসির আমলেই তৈরি হয়। তিনি যে নীতি অনুসরণ করে রাজ্যগ্রাস করতে থাকেন, তাতে রাজ্যচ্যুত ব্যক্তিদের আক্রোশ আর আশ্রিত রাজাদের আশঙ্কা মিলিত হল। উৎখাত ও দাবীহীন দেশী রাজারা ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁদের সৈনিক ও কর্মচারীরাও কর্মচ্যুত ও পদচ্যুত হল। সুতরাং ডালহৌসির কার্যকলাপ ভারতীয় বিদ্রোহের জন্য আংশিক ভাবে দায়ী।

শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে দিল্লীর বাদশাহের প্রতি অমর্যাদা এবং অযোধ্যার নবাবের রাজ্য দখল ও বিতাড়ন দেখে খুব আহত হলেন। সুতরাং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অসন্তুষ্ট হতে লাগল। আবার জমিদারী বিষয়ে, রাজস্ব আদায়ের

নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়াতে অযোধ্যার জমিদাররাও ক্ষতিগ্রস্থ হলেন। এই সব কারণে ইংরেজ-বিদ্বেষ ক্রমেই ঘনীভূত হল। সাধারণ লোকের মনেও শাসন ও সমাজ-সংস্কারের নতুন, আইনগুলি ঘোর সন্দেহ সৃষ্টি করল। সাধারণ মানুষ ভাবল, প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে তারা এ দেশের প্রজাদের খ্রীষ্টান করতে উৎসুক। নইলে দেশী খ্রীষ্টানরা যাতে সম্পত্তিলাভের অধিকার পায়, তার জন্য আইন তৈরি করা হল কেন? খ্রীষ্টান পাদরিদের তৎপরতাও সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল।

সৈন্যদলে দেশী সিপাহীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিদ্বেষভাব জাগল। সিপাহীরা দেখল, গোরা সৈন্য সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক কম। যুদ্ধবিগ্রহে তারাই বেশি কষ্ট করে, অথচ কোম্পানি তাদের মাহিনা বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা করেনি। এর উপর সিপাহীদের জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা বাড়ল। অধিকাংশ সিপাহী হিন্দু, তারা নিষিদ্ধ 'কালাপানি' পার হয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের বাইরে বিদেশে যেতে ঘোর আপত্তি জানায়। সিপাহীদের বোঝানো হল এই সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। রটনা করা হল, পলাশী যুদ্ধের পর একশ' বছর পরেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে, তা নিশ্চিত। এই সময়ে ভারতে গোরা সৈন্য ছিল খুব কম, ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর এই হল সুবর্ণ সুযোগ।



লক্ষ্মীবাঈ

২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৭ সাল। দমদমে সিপাহীরা নতুন বন্দুকের টোটা ব্যবহার করতে সরাসরি অসম্মতি জানাল। দুমাস পরে ব্যারাকপুরে এক সিপাহী **মঙ্গল পাণ্ডে** একজন উচ্চ-পদস্থ ইংরেজকে কুচকাওয়াজের মাঠে হত্যা করতে গেলে অন্য সিপাহীরা দাঁড়িয়ে রইল। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হলে ব্যারাকপুরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হল। এর পরে মীরাটে ও দিল্লীতে বিদ্রোহ ছড়ায়। তবে কানপুরে ও লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ সবচেয়ে তীব্র ও ভীষণ হয়ে দেখা দেয়। কানপুরে নেতৃত্ব করেন নানা সাহেব আর ঝাঁসী অঞ্চলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ। রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন। তাঁর অসীম বীরত্ব ইংরেজদেরও বিস্মিত করেছিল। তাঁতিয়া টোপী কিছুদিন পরে ধরা পড়েন, বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু নানা সাহেবের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

ব্যর্থতার কারণ: বিদ্রোহ সফল হতে পারল না কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিদ্রোহীরা দেশের সর্বত্র ও সকল শ্রেণীর কাছে থেকে সাহায্য বা সমর্থন পান নি। বরং ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন অনেক দেশীয় রাজা ও জমিদার। সাধারণ প্রজাবর্গ

বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি, মধ্যবিত্তের দল অনেকটা উদাসীন। যাই হোক ইংরেজরা শেষকালে যে জয়ী হন ও বিদ্রোহ দমন করেন তার একটি বড় কারণ তাঁড়া তাড়াতাড়ি সৈন্য সরাতে বা জড়ো করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে উপযুক্ত নেতার অভাবও আর একটি প্রধান কারণ। যাঁরা বিদ্রোহে নেমেছিলেন, তাঁরা ছাড়া ছাড়া ভাবে বিদ্রোহ চালিয়েছিলেন। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ঐক্যবদ্ধ ভাবে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করতে পারেন নি। অপর পক্ষে ইংরেজদের অস্ত্রসজ্জা, রণ-কৌশল ও পরিকল্পনা ছিল অনেক বেশি উন্নত। তাদের দৃঢ়তা ও সংগঠন ক্ষমতার সামনে বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারেন নি।



রাণী লক্ষীবাঈ-এর সীলমোহর

বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। তার প্রকৃতি ও আসল রূপ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকরাও এক-মত নন। কেউ বলেন এটি পুরোপুরি সামরিক বিদ্রোহ; নতুন বন্দুকে টোটার প্রবর্তনই তার প্রত্যক্ষ কারণ। কেউ বলেন, দেশের মধ্যে নানা অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে এটি মুসলমানদের ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু এই মতগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রধানতঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ হলেও এই বিদ্রোহ এমন সময়ে, এমন অবস্থায় ঘটে, দেশের মধ্যে তখন এত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ জমে ওঠে যে এই আন্দোলন একটা নতুন রূপ নেয়। অতএব এই বিদ্রোহকে শুধু 'মিউটিনি' বা সামরিক বিক্ষোভ বলা যায় না। কোনও বড় বিপ্লবের পেছনে সিভিল বা বে-সামরিক শ্রেণীদের বিক্ষোভও কাজ করে। ভারতেও তাই হয়েছিল। বিশ পঁচিশ বছর আগে থেকেই দেশের অনেক জায়গায় উৎপীড়িন প্রজাদের বিক্ষোভে আন্দোলনের নমুনা পাওয়া যাচ্ছিল। তার মধ্যে কৃষক ও সাধারণ প্রজাদের আন্দোলনের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। কোনও কোনও স্থলে জনসাধারণ বিদেশী শাসনের প্রতিরোধে আন্দোলন চালিয়েছিল। বিদ্রোহী এবং আন্দোলনকারী উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ এবং নষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। বাঙলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কয়েক জায়গায় এইরকম ছোট ছোট গণ-আন্দোলনের প্রমাণ আছে।

তাই মোটামুটি বলা যায়, এই বিদ্রোহ একান্তভাবে সামরিক বিদ্রোহ নয়, আবার পুরোপুরি জনগণের আন্দোলনও নয়। কতক অঞ্চলে এটি জমিদার ও সামন্ত রাজাদের বিক্ষোভ, তাঁরা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিদ্রোহে যোগ দেন। আবার উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেকগুলি জেলায় সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ অধিবাসীরা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়ায়নি, সে কথা সত্য। উপযুক্ত নেতা

শৃঙ্খলা ও সুনির্দিষ্ট পন্থা থাকলে এ বিদ্রোহ সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে পারত। তবু একে মহাবিদ্রোহের ভূমিকা বা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম ধাপ বলা যায়।

কোম্পানি শাসনের ফল : (অন্যত্র বিশদ ভাবে বলা হয়েছে) এখন উনিশ শতকের মাঝামাঝি অনেক ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভাবতেন, ইংরেজ শাসন ভারতকে উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ, ডাক ও তার বিভাগের প্রচলন ইত্যাদি কাজ ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য করা হয়েছে। তখন তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের আসল উদ্দেশ্য এবং উপনিবেশ শাসনের প্রকৃত চেহারা ধরতে পারেন নি। স্কুল কলেজে ইংরেজি-শিক্ষার ব্যবস্থা, দেশের নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা, শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা হয়েছিল কিন্তু আপন স্বার্থে, ভারতবাসীর উন্নতির জন্য নয়। শাসনযন্ত্র ঠিকভাবে চালানোর জন্যই সেগুলির দরকার ছিল। কিন্তু ঐ অনুগৃহীত শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন জাতীয় ভাবের প্রেরণা পেল তখন তারাই ইংরেজদের সুবিধা সম্বন্ধে প্রশ্ন ও সমালোচনা শুরু করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বিচারালয়ে শ্বেতকায় শাসকদলের মানুষকে দেশীয় (নেটিভ) বিচারক বিচার করতে পারতেন না। ইংরেজরা নানা ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে অসদ্ ব্যবহার ও উদ্ধত আচরণ করতেন এবং অবজ্ঞা দেখাতেন। তাই নিয়ে এই সময়, ব্ল্যাক অ্যাক্টস বা কালা আইন আন্দোলন হয়। ভারতীয়রা উচ্চশিক্ষিত উপযুক্ত প্রার্থী হলেও উচ্চপদে অধিকার পেতেন না। সুতরাং তাদের মনে অসন্তোষ জমা হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিকার ছিল না প্রতিবাদ করা ছাড়া।

ইংরেজরা রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন দমন নীতি চালিয়ে যায়, ভারতের অর্থনৈতিক জীবনেও তেমনি শোষণ নীতি অনুসরণ করে দেশের প্রভুত ক্ষতি সাধন করে। কোম্পানি আমলের প্রথম দিকে দেশী শিল্পবাণিজ্যের দারুণ দূরবস্থা হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর বিশ বছরের মধ্যে আজকালের হিসাবে বাঙলাদেশ থেকে প্রায় দেড়হাজার কোটি টাকা বিলেতে পাঠানো হয়। কোম্পানির রাজ্য বড় ও পাকা হতে লাগল, ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে রাশি রাশি টাকা বিলেতে চালান করা হতে থাকল। ইংরেজ বণিকরা কোম্পানির নামে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে প্রচুর রোজগার করত। নানা উপায়ে ইংরেজরা বাংলা ও ভারতকে নির্মমভাবে শোষণ করে দেশী শিল্পগুলির সর্বনাশ করে। বাংলার তাঁতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে এবং পশ্চিম ভারতের বরুচ ও সুরাটের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের বাজার নষ্ট করে কোম্পানি প্রচুর মুনাফা পেতে লাগল। বিলেতে তখন শিল্প বিপ্লব চলছে। সেখানে কয়লা আর লোহার খনি থেকে মাল উঠছে, কারখানা তৈরি হচ্ছে। অনেক টাকার দরকার এবং সেই চাহিদা মেটাতে হত ভারতকে। এখানকার কাঁচামাল সস্তায় কিনে বিলাতে তাই দিয়ে বিলেতী পণ্য দ্রব্য উৎপন্ন হত এবং সেগুলি আবার এদেশে এনে চড়া দামে বিক্রি হত। এক কথায়, ভারতের শিল্পগুলি ধ্বংস করে বিলেতী শিল্পের বাজার তৈরি হল। সুতরাং রাজনৈতিক অবিচার আর আর্থিক শোষণে কোম্পানির শাসনের উপর ভারতের অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে।

এক নজরে

* ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে, বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ইংরেজদের নিকট পরাজয় বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের প্রকৃত সোপান তৈরি করে। এবং বাংলা থেকেই উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল।
* ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তারে বাংলার নবাবেরা, পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা, মহীশূরে হায়দর আলী ও টিপু সুলতান, এবং পাঞ্জাবে শিখরা ইংরেজদের শক্তি প্রসারে যথেষ্ট বাঁধার সৃষ্টি করেছিল।
* মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা করের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করায় এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক অধিকার আইনগতভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।
* ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কতিপয় ছোট ছোট রাজ্য ব্যতীত সারা ভারতে ইংরেজরা আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়।
* ১৮১৮-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ প্রসার আরও তরান্বিত হয়। ইংরেজ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যগুলি অধিকার করে বিশাল ভারত সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।
* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং-এর সময় ভারতে মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম-ধাপ বলা হয়।
* ইংরেজরা রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন দমননীতি চালিয়েছিল, তেমনি ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে শোষণ নীতি অনুসরণ করে দেশের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। এই দুই কারণে কোম্পানির শাসনের উপর ভারতের অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* আলিবর্দি খাঁ কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হয়েছিলেন ? * সিরাজউদ্দৌলা কে ছিলেন ? তিনি কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মসনদে বসেন ? * আলিনগরের সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল ? * কত খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয় ? এই যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ? * মীরকাশিম কিভাবে বাংলার নবাবী পেয়েছিলেন ? * মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের কয় বার যুদ্ধ হয়েছিল? কোন যুদ্ধে মীরকাশিম ইংরেজদের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেন ? * ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোন বছর কার কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ করেছিল ? * মহীশূরের যে দুজন সুলতান ইংরেজদের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের নাম কি ? * শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি কত খ্রীস্টাব্দে কাদের মধ্যে হয়েছিল ? * ভারতে সত্ত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে ? এই নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল ?

* সিন্ধুদেশের শাসকদের কি বলা হতো? * কোন্ রাইফেল ব্যবহারে দেশী সিপাহীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল? * কত খ্রীস্টাব্দে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার বিরোধের কারণ ও তার ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। সিরাজউদ্দৌলার পর কে বাংলার নবাব হয়েছিলেন? তিনি কি ভাবে ইংরেজ বিতাড়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন?

৩। মীরকাশিম কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন? তাঁর সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরোধের কারণ কি? এই বিরোধের ফল কি হয়েছিল?

৪। বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর চেয়ে কেন বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

৫। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করবার ফলে কি হয়েছিল?

৬। অধীনতামূলক মিত্রতা বা সাবসিডিয়ারি আলায়েন্স-এর প্রবর্তক কে? এই নীতির কার্যকারিতা উল্লেখ কর।

৭। কয়টি মহীশূরের যুদ্ধ হয়েছিল? টিপু সুলতান কোথায় পরাস্ত ও নিহত হন।

৮। সালবাই-এর সন্ধির গুরুত্ব কি?

৯। বেসিনের সন্ধি কাদের মধ্যে হয় তার ফল কি হয়েছিল? লর্ড ওয়েলেসলির ভাই কে? তিনি কোন্ কোন যুদ্ধে জয়ী হন?

১০। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় পেশোয়া কে ছিলেন? ঐ যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল?

১১। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের বিবরণ দাও।

১২। শিখশক্তি পতনের কারণগুলি উল্লেখ কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

২। মহীশূরে হায়দর আলীর অভ্যুদয় এবং ইংরেজ-মহীশূর সম্পর্ক সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। প্রথম মারাঠা যুদ্ধের কারণ এবং এই যুদ্ধে ইংরেজদের ভূমিকা কি ছিল?

৪। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

৬। ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৭। লর্ড ডালহৌসি কি ভাবে ভারতের শক্তিগুলিকে ইংরেজদের পদানত করেছিলেন?

৮। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ।
৯। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিরূপণ কর।
১০। কি কি কারণে মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল?
১১। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[দুই] নিচের ছকের **ক স্তম্ভে** কতকগুলি বিখ্যাত ঘটনা এবং **খ-স্তম্ভে** কতকগুলি সাল দেওয়া আছে। এগুলিকে ঠিক মত সাজিয়ে লেখ ঃ

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
পলাশীর যুদ্ধ	১৭৬৪ খ্রীঃ
বক্সার-এর যুদ্ধ	১৭৮৪ ,,
ব্যাঙ্গালোরের সন্ধি	১৭৯৯ ,,
চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ	১৭৫৭ খ্রীঃ
	১৮০২ ,,
	১৮১৭ ,,
সালবাই-এর সন্ধি	১৮৪৩ ,,
বেসিনের সন্ধি	১৭৪৫ ,,
তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ	১৭৮২ খ্রীঃ
সিপাহী বিদ্রোহ	১৮২৬ ,,
কোড়েগাঁও ও অস্টির যুদ্ধ	১৮১৮ ,,
সগৌলির সন্ধি	১৮৪৮ ,,
ইয়ন্দাবোর সন্ধি	

[তিন] **নিচের উক্তিগুলি থেকে অশুদ্ধ শব্দ কেটে দাও ঃ**

(ক) ইংরেজ ও সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধ হয় (১৭৫৭/১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে।)

(খ) (১৭৫৭/১৭৬৪/১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে) মুঘল সম্রাট ইংরেজ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

(গ) দক্ষিণ ভারতের বর্তমান কর্ণাটক অঞ্চলে (মীরকাশিম / হায়দর আলি / ক্লাইভ) নামে জনৈক প্রতিভাবান ব্যক্তি শক্তিশালী মহীশূর রাজ্য গড়ে তোলেন।

(ঘ) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ/ দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ / তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ)-এ একে একে সব মারাঠা নেতা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

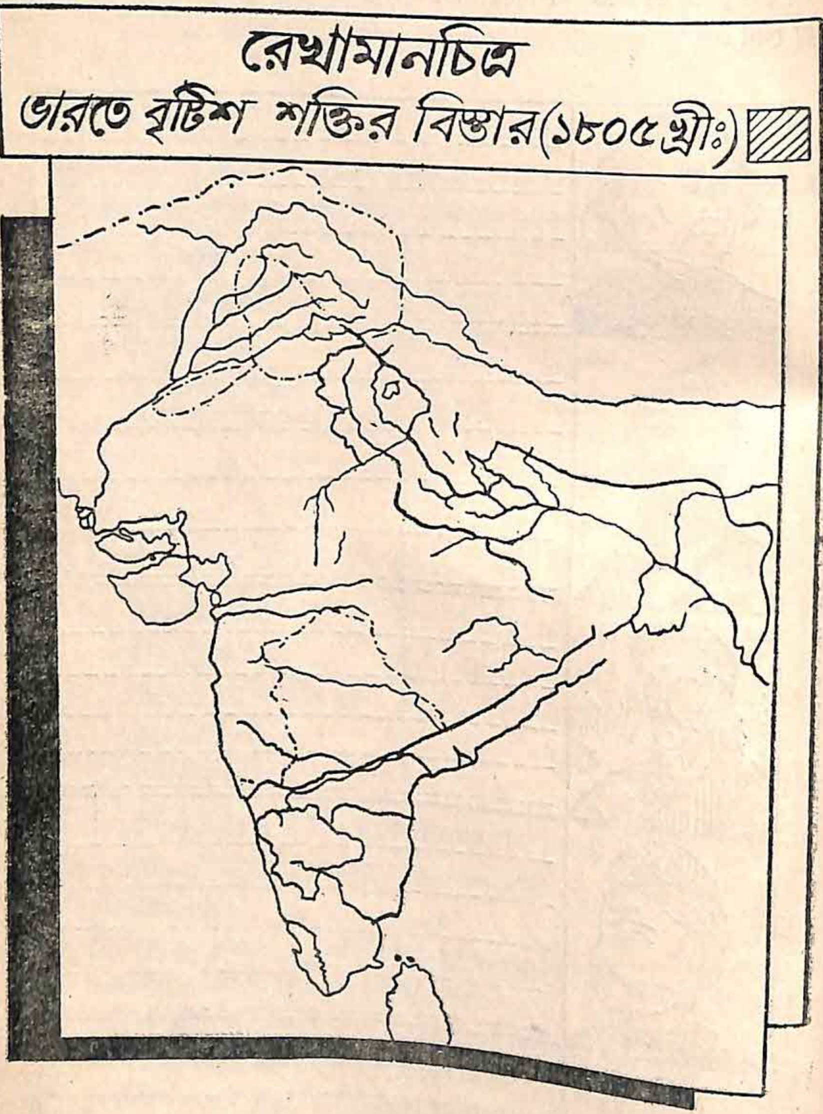
(ঙ) দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর (১৮৫৩ খ্রীঃ) ডালহৌসি পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেবকে বৃত্তি দিতে (স্বীকার / অস্বীকার) করলেন।

ব্যবহারিক অনুশীলন

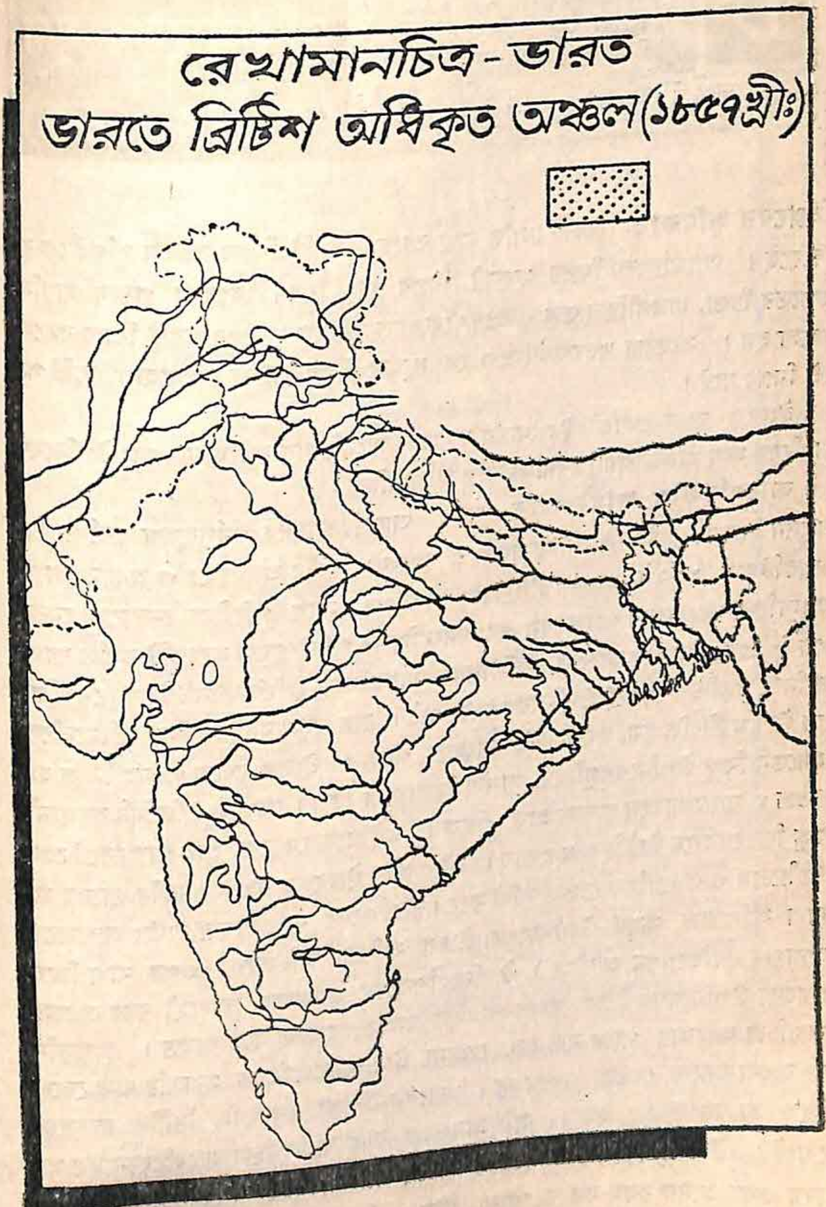
[এক] নিচের ছকের বাঁ-দিকের চিত্রগুলির সম্পর্কে ডানদিকের শূন্যস্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

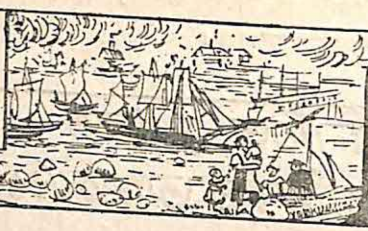
	
	
	
	
	

[দুই] (ক) নিচের রেখামানচিত্রে ভারতে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল মানচিত্রে প্রদর্শিত সংকেত চিহ্নের সাহায্যে নির্দেশ কর।



(খ) নিচের রেখামানচিত্রে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল রেখাচিত্রে প্রদর্শিত সংকেত চিহ্নের সাহায্যে দেখাও।



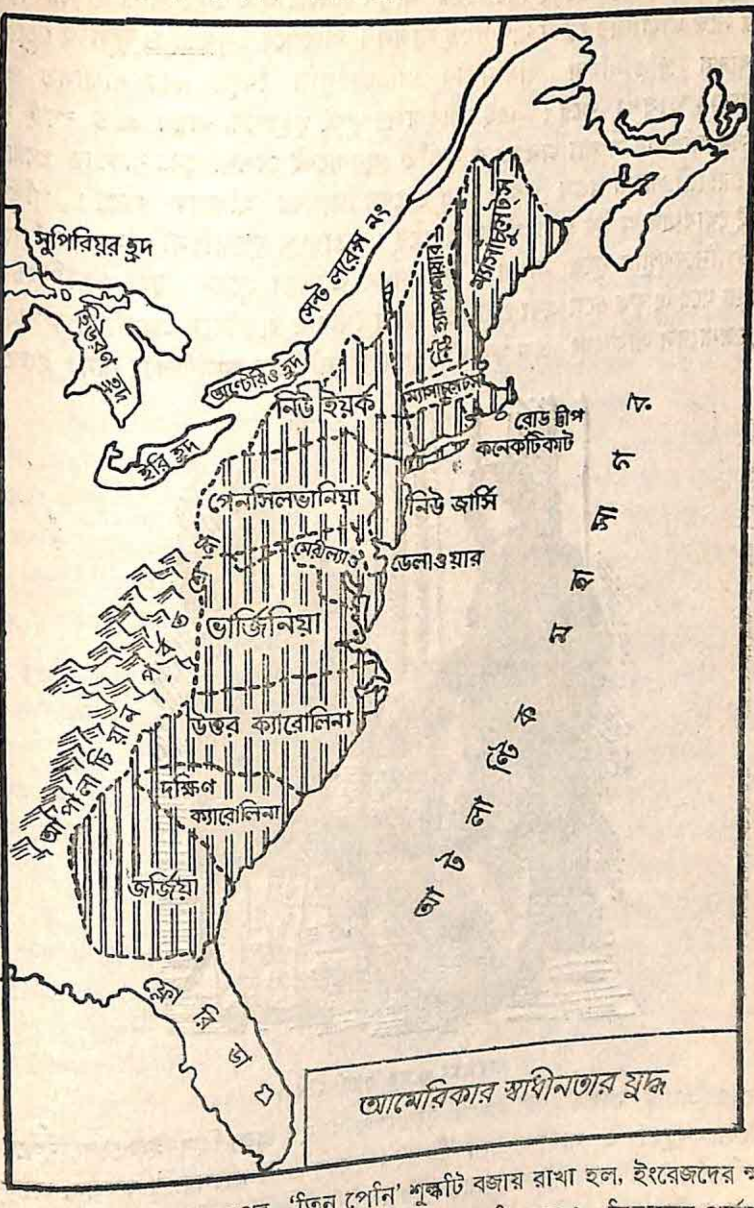
৮  যুক্তিবাদের যুগ (আঠার শতক)

বিপ্লবের ভূমিকা ঃ একটি চলতি কথা আছে, তিনটি বিপ্লব বর্তমান পৃথিবীকে রূপ দিয়েছে। আমেরিকান বিপ্লব ফরাসী বিপ্লব আর শিল্প বিপ্লবের প্রভাব আধুনিক জগতের চিন্তা, রাজনীতির তত্ত্ব ও আদর্শকে গড়ে তুলেছে। তবে চারটি বিপ্লব বললেই ভালো হয়। সতেরো শতকে ইংলণ্ডে যে দুবার বিপ্লব হয় তা জেনেছো। দুটি পর্বে এই বিপ্লব ঘটে।

ইংলণ্ডে রাজা-প্রজার এই সংঘর্ষের ফলাফল আমেরিকায় পৌঁছেছিল এবং উপনিবেশ-বাসীদের মনে স্বাধীনতার প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়েছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ আমেরিকানদের পর্বপুরুষরা বেশির ভাগ আসেন ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড থেকে। ধর্মীয় অত্যাচারে ও অন্যান্য কারণে কয়েকটি দল ১৬২০ সালে 'Pilgrim Fathers' নামে পরিচিত নেতাদের নেতৃত্বে অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি দেয় এবং আমেরিকার পূর্ব উপকূলে কয়েকটি বসতি স্থাপন করে। এইভাবে ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া, ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, নিউ ইয়র্ক, পেনসিল-ভ্যানিয়া প্রভৃতি কয়েকটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ক্রমে নতুন বসতিগুলির অধিবাসীদের যত্নে উদ্যমে শ্রীবৃদ্ধি হয়, জনসংখ্যাও বাড়তে থাকে। ইংলণ্ড থেকে গভর্নর নিযুক্ত হয়ে আসতেন কিন্তু উপনিবেশগুলিতে স্থানীয় বিধানসভা ছিল। সেখানে প্রতিনিধিরা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসনে অভ্যস্ত হতে থাকে। এইভাবে দেড়শো বছর প্রায় কেটে গেল, কিন্তু ভিতরে জমে উঠেছিল অসন্তোষ। ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের বিপ্লবের নজীর তাদের মনে জাতীয়ভাব ও গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি করে। ইংরেজদের 'বাণিজ্য তন্ত্র' অর্থাৎ আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে উপনিবেশবাসীদের বাণিজ্য অধিকারের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ (ন্যাভিগেশন অ্যাক্ট্স) ঔপনিবেশিকদের মনোভাব বিদ্রোহী করে তোলে। ইংরেজরা উপনিবেশগুলিকে কেবল ধনসম্পদ আহরণের ক্ষেত্র বলে ভাবত। মাতৃভূমির একচেটিয়া অধিকার পাছে নষ্ট হয়, সেজন্য উপনিবেশগুলিকে সরাসরি অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা করতে দেওয়া হতো না। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি ব্রিটিশ জাহাজেই ইংলণ্ডে চালান করতে হত। বাণিজ্যসংক্রান্ত আইনগুলি ছিল আমেরিকানদের স্বার্থ বিরোধী। উপরন্তু ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বাবদ যে অর্থব্যয় হত, তার জন্য তাদের ওপর অনেক রকম কর চাপানো ছিল। কিন্তু ফরাসীরা যখন কানাডায় পরাস্ত হল, তখন আক্রমণের আশঙ্কা দূর হল, অথচ বৃটিশ সরকার তাদের করমুক্ত করল না।

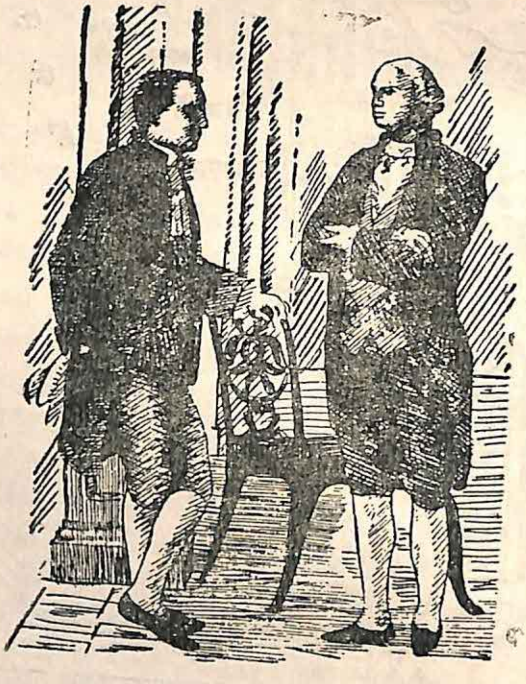
ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ ও তাঁর অযোগ্য মন্ত্রীদের অবিবেচনায় আমেরিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন জাগল। তীব্র প্রতিবাদের ফলে কয়েকটি চালু কর রহিত করা



আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ

হল বটে কিন্তু চায়ের ওপর 'তিন পেনি' শুল্কটি বজায় রাখা হল, ইংরেজদের ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্যই। উপনিবেশবাসীদের প্রবল আপত্তি হল ঃ বিলাতের পার্লামেন্টে তাদের যখন প্রতিনিধি নেই, তখন তারা ট্যাক্স দেবে না। সঙ্কট দেখা দিল যখন

কয়েক ব্যক্তি মিলে **বস্টন বন্দরে** জাহাজ থেকে চায়ের পেটিগুলো জলে ফেলে দিল। দাঙ্গা শুরু হল এবং ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন তেরোটি উপনিবেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ডের সঙ্গে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল। অবশেষে ১৭৭৬, ৪ **জুলাই** তেরোটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার অধিকারগুলি বিবৃত করে সম্মিলিত ভাবে **স্বাধীনতা ঘোষণা** করে; এই ঘোষণাপত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে স্পষ্ট বলা হয় যে সম-অধিকার সম্পন্ন জনগণের সম্মতি অনুসারেই দেশশাসনের ব্যবস্থার প্রয়োজন আর অত্যাচারী শাসন খতম করার জন্য তাদের বিপ্লবের অধিকার আছে। পৃথিবীর সর্বত্র এই ঘোষণার অসীম গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তারপর যুদ্ধবাহিনী গঠন ও অর্থ সংগ্রহ করে উপনিবেশগুলি যুদ্ধে নামল। পরিচালক ও নেতা হলেন **জর্জ ওয়াশিংটন**। সাত বছর ধরে এ যুদ্ধ চলে এবং প্রধানতঃ ফ্রান্স সৈন্য ও অর্থ দিয়ে আমেরিকাকে সাহায্য করে। জেনারেল লাফায়েৎ এক ফরাসী স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে আমেরিকায় যান। ইংলণ্ডের



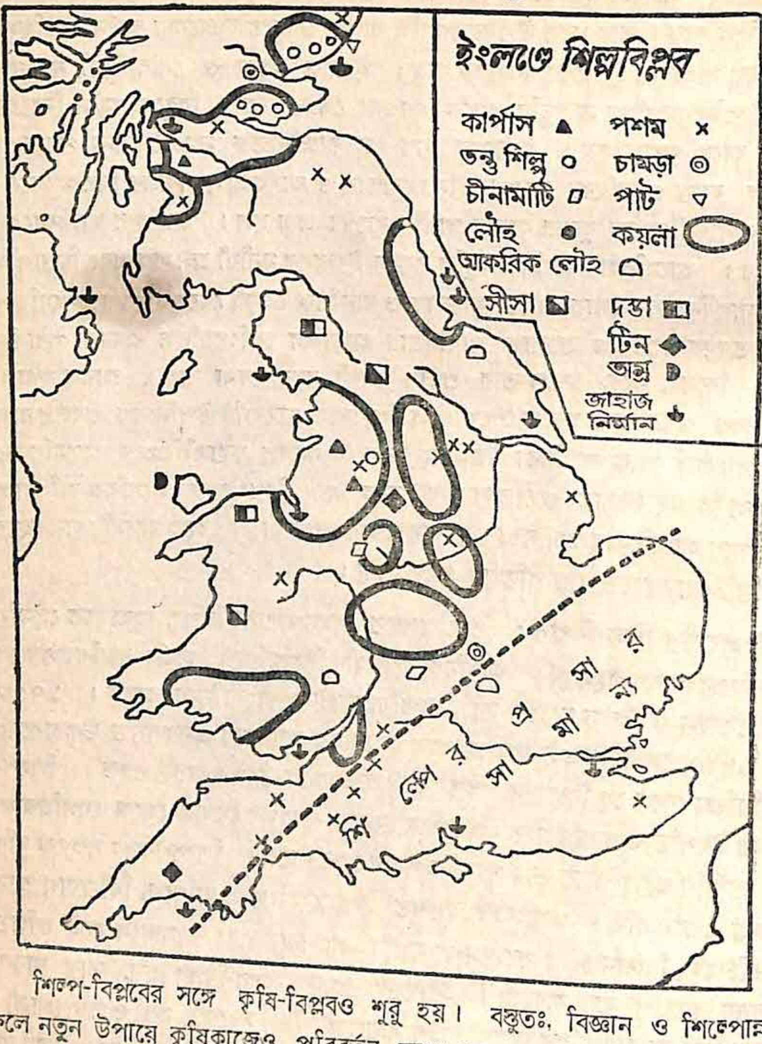
লাফায়েৎ ও জর্জ ওয়াশিংটন

পরাজয়ের একটি কারণ এই সময়ে য়ুরোপের অনেক রাজ্য ছিল ইংলণ্ডের বিপক্ষে, ফরাসীদের শত্রুতা ও সাহায্য তো ছিলই। তার ওপর মহাসমুদ্রের ব্যবধান, অতদূর থেকে নির্দেশ ও সৈন্য পরিচালনার অসুবিধায় ইংরেজরা বিষম বিপদে পড়ে। শেষে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮১ সালে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৭৮৩ সাল **ভার্সাই-এর সন্ধি** (versailles) স্বাক্ষরিত হলে যুদ্ধের অবসান ঘটে।

উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা পেয়ে United States of America (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) গঠন করল। আমেরিকার জয় ও ব্রিটিশদের ব্যর্থতার বড় কারণ হল, দুই দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব। তার ফলে উপনিবেশগুলি স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তাবোধ অর্জন করেছিল। ফরাসীদের সাহায্যও ইংলণ্ডের বিপক্ষে যায়। ইংরেজ সেনা ও নৌবাহিনী বলশালী হলেও উপনিবেশগুলির মাতৃভূমি থেকে পাওয়া স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে অটল বিদ্রোহী শক্তির কাছে পরাস্ত হয়। ইংলণ্ডের হার শুধু রাজনৈতিক নয়, নৈতিক পরাজয়। ইংলণ্ডের রাজা ও মন্ত্রীদের আপোসহীন মনোভাব ও কার্যকলাপ পরাজয় ডেকে আনে। এইভাবে পৃথিবীতে সে যুগের বৃহত্তম স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। জয় হল স্বাধিকারের গণতন্ত্রের। আমেরিকার উপনিবেশগুলি যেমন ইংলণ্ডের মনীষী জন লক্ এবং চিন্তাশীল ফরাসী দার্শনিকদের উদার নীতি, যুক্তিবাদ ও মানসিক উৎকর্ষ থেকে প্রেরণা পেয়েছিল, তেমনি তাদের সংগ্রাম ও জয়লাভ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল অন্যান্য পরাধীন দেশে। বিশেষ, করে, ফ্রান্সে তার প্রভাব বেশী করে দেখা যায়। কারণ ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক ও সৈন্যদল স্বচক্ষে দেখে এল কি ভাবে তেরোটি উপনিবেশ প্রবলপ্রতাপ ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিল। আসন্ন ফরাসীবিপ্লবে আমেরিকার এই সফল বিদ্রোহ উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে এবং বিপ্লবীদের 'মানবিক অধিকার' ঘোষণাপত্রে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার প্রভাব দেখা যায়। আর আমেরিকায় হেরে গিয়ে ব্রিটিশরা ভারতে শক্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়।

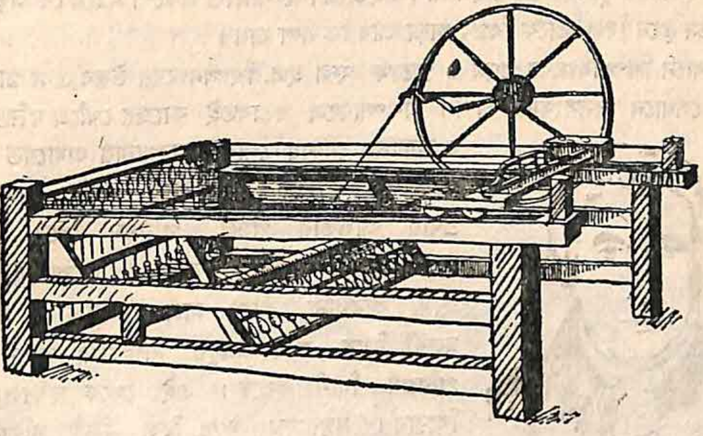
ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব : ভাব জগতে যেমন ফরাসী বিপ্লব, বস্তুজগতে তেমনি শিল্প-বিপ্লব অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক পৃথিবী শিল্পায়িত, অর্থাৎ শ্রমশিল্পের যে আশ্চর্য বিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে, তা শিল্পবিপ্লবেরই ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০, মোটামুটি এই একশো বছর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে বিভিন্ন দেশে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে, তাকে বিপ্লব বলাই সঙ্গত। শিল্প-বিপ্লবের উৎপত্তি ও দ্রুত উন্নতি হয় প্রথমে ইংলণ্ডে, তারপর সেখান থেকে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়ায় তার সূচনা ও প্রসার হতে থাকে। শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কে দুটি মূল কথা এখানে বলি। একটি হল, সঞ্চিত মূলধনকে শিল্পে বাণিজ্যে বিনিয়োগ আর দ্বিতীয়টি হল, বিজ্ঞান চর্চার ফলে নতুন যন্ত্রাদি আবিষ্কার এবং উৎপাদনে সেই ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগ বা ব্যবহার। ইংলণ্ডেই প্রথম শিল্প-বিপ্লব হয়, তার কারণ, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যই ছিল সবচেয়ে বড় ও সম্পদশালী। ইংরেজ বণিকরা উপনিবেশ থেকে প্রচুর কাঁচামাল পেয়ে ব্যবসা বৃদ্ধি করত। ক্রমে তা থেকে শিল্পের সাহায্যে পণ্য দ্রব্য তৈরি করে উপনিবেশের বাজারে তা বিক্রি করত। এইভাবে মূলধন (ক্যাপিটাল) সঞ্চয় এবং সেই অর্থ নতুন নতুন শিল্পে খাটানো হতে থাকে। তা ছাড়া ইংলণ্ডে কয়লা ও লোহার প্রাচুর্য থাকায় শিল্প-বিপ্লবের প্রসার সহজ হয়। এখানে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য এক সঙ্গে হাত মেলায়, তাই ইংলণ্ডেই শিল্প বিপ্লব এত দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে এবং দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ও শিল্পের আমূল পরিবর্তন

ঘটায়। পুরনো দিনের সওদাগরী ব্যবসা বা বাণিজ্য-তন্ত্রের বদলে, এখন থেকে ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে নয়া ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের প্রসার দেখা যায়।



শিল্প-বিপ্লবের সঙ্গে কৃষি-বিপ্লবও শুরু হয়। বস্তুতঃ, বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নতির ফলে নতুন উপায়ে কৃষিকাজেও পরিবর্তন দেখা গেল। পুরানো প্রথায় চাষের জমি টুকরো টুকরো ভাগ করে চাষীকে দেওয়া হত। এতে পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হত, উৎপাদনও বেশি হত না। এখন কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে জমি পতিত অবস্থায় ফেলে না রেখে দু'বছর বাদে অন্য এক ফসলের চাষ করা শুরু হল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যখন খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ল, তখন উর্বরতা ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষির উন্নতি জরুরী হয়ে উঠল। ভালো রকম সেচ-ব্যবস্থা, উন্নত ধরনের সার দেওয়া, ফসল পরিবর্তন প্রভৃতি নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কৃষির কাজে যে রূপান্তর সৃষ্টি হল তাকেই বলা হয়।

Agrarian Revolution বা কৃষি বিপ্লব। এই কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক উন্নতির ফলে ইংলণ্ডের চেহারা পাল্টে গেল।



স্পিনিং জেনি

শিল্প বিপ্লবের পেছনে যেমন যন্ত্রপাতির উদভাবন তেমনি তার পেছনে ছিল বাজার চাহিদা। দ্রুত উৎপাদনের জন্য নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে দেরী হল না। বয়নশিল্পকে আরও উন্নত ও দ্রুত করার জন্য **জন কে** আবিষ্কার করলেন 'flying Shuttle' বা চলন্ত মাকু। তারপর **হারগ্রীভস** উদভাবন করেন এক নতুন যন্ত্র '**স্পিনিং জেনি**', যার সাহায্যে এক সঙ্গে তাড়াতাড়ি আটটি সুতো কাটা যায়। ঐ সময়ে **আর্করাইট, ওয়াটার ফ্রেম** ('water-frame') নামে জল চালিত যন্ত্র বার করেন যাতে সুতো বোনার কাজে হাত লাগানোর দরকার হল না। তারপর আগের দুটি যন্ত্র একত্র সমাবেশ করে **ক্রমটন** তৈরি করেন **মিউল** ('mule') নামে এক রকম যন্ত্র আর **কার্টরাইট** আবিষ্কার করলেন **পাওয়ার লুম** ('Power Loom') অর্থাৎ শক্তি-চালিত তাঁত। এই সব আবিষ্কার বয়নশিল্প থেকে উৎপাদনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিল।

আর একদিকে এল বাষ্পশক্তি, আবিষ্কর্তা জেম্‌স ওয়াট। বাষ্পশক্তির প্রয়োগে প্রথমে স্টীম এঞ্জিন, তারপর রেলগাড়ি, বাষ্পীয় পোতের প্রচলন হল। ওদিকে কয়লার সাহায্যে লোহা গালাই পদ্ধতির আবিষ্কার হওয়াতে লৌহশিল্পের বিরাট সম্ভাবনা আয়ত্ত হল। **স্মীটন** তৈরী করলেন **ব্লাষ্ট ফার্ণেস** ('blast furnace') বা লোহা গলাবার বৃহৎ চুল্লী। এই সূত্রে সৃষ্টি হল নতুন ইস্পাত শিল্প যার ফলে রেললাইন, স্টীমারের খোল, কারখানার বড় বড় যন্ত্রপাতি তৈরি করা সহজসাধ্য হল। খনির ভিতরে শ্রমিকের কাজের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য **সেফ্‌টি ল্যাম্প** ('Safety lamp') উদ্‌ভাবন করেন **হামফ্রে ডেভি**। ইংলণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে খনি, কারখানা, বন্দর প্রভৃতির মধ্যে যোগাযোগ ও মালপত্র পরিবহনের জন্য পাকা রাস্তা তৈরি করার কৌশল আবিষ্কার করলেন

ম্যাকাডাম। জলপথে পরিবহনের জন্য কাটা হোল কয়েকটি খাল। পরবর্তী কালে যখন শিল্প কারখানায় বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার চালু হয় তখন টেলিগ্রাফ টেলিফোনের প্রচলন হওয়াতে দূরত্বের প্রশ্ন রইল না ; এইভাবে শিল্পোন্নতি একশো বছরে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিল, তাঁকে বিপ্লব ছাড়া আর কি বলা যায়।

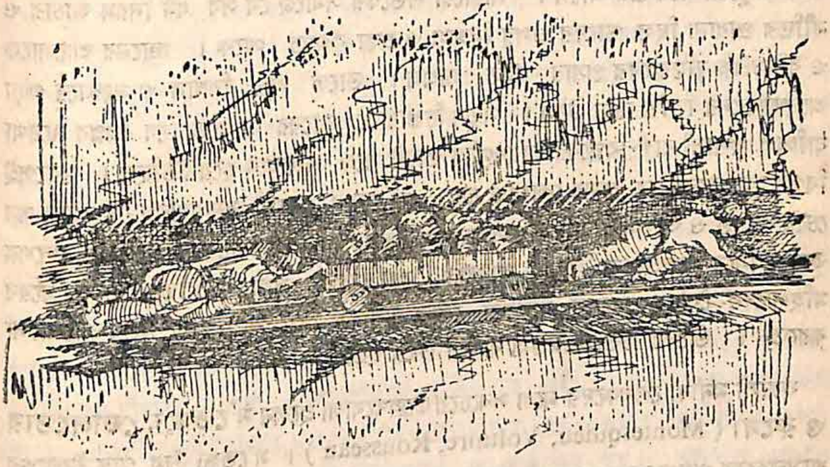
এখানে শিল্পবিপ্লবের প্রথম ও প্রত্যক্ষ ফল হল, শিল্পনগরের উদ্ভব এবং গ্রামাঞ্চল ছেড়ে সেখানে জনসংখ্যার চাপ। শিল্পাঞ্চলে স্বভাবতই কাজের খোঁজে দরিদ্র চাষী ও অন্যান্য বেকার লোক কারখানায় জমায়েত হত। শ্রমিকরা **'ফ্যাক্টরি সিস্টেম'** অর্থাৎ কারখানা প্রথার আওতায় পড়ল, পরিশ্রম দিয়ে নির্দিষ্ট হারে মজুরী পেতে লাগল। মালিকের হাতে জমি, কারখানা, কাঁচা মাল যন্ত্রপাতি ও মূলধন। মজুরী নিয়ে শ্রমিক-মজদুর মালিকের কাছে তার পরিশ্রম বিক্রী করছে। এই থেকে জন্মাল শ্রেণী-বিরোধ। মজুরদের মধ্যে ছিল কিছু সংখ্যক স্ত্রী-লোক ও অল্পবয়সের ছেলেমেয়ে। তাদের নির্মম ভাবে খাটানো হত কম মজুরীতে। বস্তির মধ্যে শ্রমিকদের দরিদ্র পরিবেশ, অমানুষিক পরিশ্রম, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঘোর অব্যবস্থা ক্রমেই অসহ্য হয়ে ওঠে। কাজ করার নির্দিষ্ট ঘণ্টা, বেতনহার বৃদ্ধি, জেলখানার সংস্কার, কর্মীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বড় রকম আন্দোলন হতে থাকে এবং ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে **ফ্যাক্টরি আইন** প্রভৃতি পাশ করে কুপ্রথাগুলি রোহিত করা হয়। কয়লার খাদে শিশু শ্রমিকদের ছবি থেকে আন্দাজ করতে পারবে, খনিতে ও শিল্প শহরে কি অবস্থার মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করত ও প্রাণধারণ করত। সেদিনের দুঃস্থ নিপীড়িত সমাজের চিত্র বিখ্যাত লেখক ডিকেন্স এর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে আছে।



জেমস্ ওয়াট

শিল্পবিপ্লবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল শুধু ইংলণ্ডে নয়, য়ুরোপের অন্যান্য শিল্প প্রধান দেশেও দেখা গেল। তবে ইংলণ্ড সেই সময়ে পৃথিবীর 'শ্রেষ্ঠ কারখানা' ছিল বলে সেখানে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সর্বপ্রথমে পরিস্ফুট হয়। প্রথমতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা দেখা দিল। নতুন শহরগুলি ছিল প্রধানতঃ শিল্পনগর। ক্রমে তাদের গুরুত্ব বাড়ল, জনাকীর্ণ হওয়াতে পার্লামেন্টে তাদের আসন নির্দিষ্ট হল এবং নির্বাচন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। ইংলণ্ডে তিনবার আইন-সংস্কার **রিফর্ম অ্যাক্ট** হওয়াতে শ্রমিকরা ভোটের অধিকার পেল। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হতে শিখল এবং নিজেদের দাবি উত্থাপন করতে লাগল। ইংলণ্ডে **'চার্টিস্ট আন্দোলন'** তার একটি দৃষ্টান্ত। শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে অনেকে ভাবতে লাগলেন। তাদের আন্দোলনের ন্যায্য দাবি থেকে এক নতুন সমাজচিন্তার উৎপত্তি হল। তার পরিণতি হয় সমাজতন্ত্রবাদে। ইংলণ্ডে **রবার্ট ওয়েন** (Robert Owen) শ্রমিকদের

অবস্থার উন্নতি এবং শিল্প থেকে উপার্জিত অর্থের বণ্টন সম্বন্ধে নতুন চিন্তা ও কর্মসূচীর সূচনা করলেন। মোটের উপর ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিকে অভাবনীয় সম্পদ বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ড ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে ও নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের খরচ বহন করতে সক্ষম হয়েছিল। অপর দিকে কুটীর শিল্পগুলি নষ্ট হতে লাগল এবং সেখানকার কারিগররা বেকার হয়ে গেল।



কয়লাখনির খাদে শিশু শ্রমিক

ফরাসী বিপ্লব ঃ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল ফ্রান্সে। ছয় বছরের মধ্যে (১৭৮৯সালে), দারুণ বিস্ফোরণ ঘটল। ফ্রান্সে বুরবোঁ (Bourbon) রাজবংশ অনেক দিন স্বৈরাচারী রাজত্ব করে, কিন্তু আঠারো শতক থেকে ফ্রান্সের দুর্বলতা ও পতনের সূচনা দেখা যায়। এই সময়ে ফ্রান্সের (ও সারা য়ুরোপেরই) সমাজ ছিল মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত—অধিকার ভোগী সামন্ত, অমাত্য, যাজক সম্প্রদায় আর অধিকারহীন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমশিল্পী কৃষক ও ভূমিদাস শ্রেণী। শেষোক্ত সম্প্রদায়কে একত্রে (Third Estate) তৃতীয় শ্রেণী বলা হত। এরাই ছিল সবচেয়ে উৎপীড়িত। প্রথম 'এস্টেট' যাজক শ্রেণী, দ্বিতীয় 'এস্টেট' অভিজাত শ্রেণী, এদের কোনো রকম কর দিতে হত না ; রাজস্ব যোগাতে হত ঐ 'থার্ড এস্টেট'কে। নানা রকম শুল্ক ও কর ছিল, যেমন লবন শুল্ক, পথ-কর, মাথট (মাথাপিছু) প্রভৃতি। একজন চাষীকে তার আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ ভূমি-কর, ২৮ ভাগ ধর্ম-কর, এর ওপর জমিদারের খাজনাও দিতে হত। অবশিষ্ট আর কিছু থাকত না। এছাড়া বছরে কিছু সময় জমিদার মালিকদের কাজে বিনা মজুরীতে মেহনত করতে হত, যেমন রাস্তাঘাট সেতু মেরামত ইত্যাদি। ভূমিদাসদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাও ছিল না। ফরাসী সমাজে ও অর্থনীতিতে এই রকম অন্যায় বৈষম্য দারুণ অসন্তোষ ঘনিয়ে তুলেছিল। তার ওপর রাজ্যের তহবিলে প্রচুর ঘাটতি, আয় ব্যয়ের কোনো হিসাব নেই এবং রাজস্ব আদায়কারীরা অনেক অর্থ

আত্মসাৎ করত। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক অসাম্য ও আর্থিক চাপ হল ফরাসী বিপ্লবের আসল কারণ। জনসাধারণ ক্রমেই বিক্ষুব্ধ ও সচেতন হচ্ছিল।

এই প্রসঙ্গে যে সব চিন্তাশীল লেখক ভাবজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন তাঁদের কথা বলা দরকার। এঁদের রচনায় প্রচলিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় তীক্ষ্ণ সমালোচনার ফলে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। আঠারো শতকের সমাজে যে সব ধর্ম নিয়ম আচার ও নীতির প্রাধান্য ছিল, তাদের ওপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কমতে থাকে। জ্ঞানের আলোকে ও বুদ্ধিচর্চায় যুক্তিবাদের প্রসার হতে লাগল। তাতে অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারে গড়া অচলায়তনের ভিত্তি নড়ে উঠল। নতুন চিন্তাধারা ভাবের জগতে যে বিপ্লব দেখা যাচ্ছিল, ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের কারণগুলি তারই সঙ্গে শক্তিমান হয়ে উঠছিল। ফ্রান্সেই বিপ্লব হল, য়ুরোপের অন্যত্র কোথাও নয়। এর কারণ, ফরাসী জনসাধারণ সে সময়ে সব চেয়ে জাগ্রত ও আপনার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল। পত্রিকায় পুস্তিকায় দেশের অবস্থা নিয়ে সমালোচনা হত, ক্লাবঘরে, ছোট ছোট সভা সমিতিতে ও বড় ঘরের মহিলাদের বৈঠকে অনেক নামকরা লোক মিলিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁদের চিন্তা ও মন্তব্য বাইরে গিয়ে ছড়াত।

ফরাসী মনীষী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন **মঁতেস্ক্যু, ভোলত্যের ও রুসো** (Montesquieu, Voltaire, Rousseau)। মঁতেস্ক্যু তাঁর গ্রন্থে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করে ফরাসী রাজতন্ত্রের সেচ্ছাচারিতা, যাজকশ্রেণীর নীতি প্রভৃতির সমালোচনা করেন। **ভোল্ত্যের** ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও লেখক, একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ। শাণিত ভাষায় তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঝরে পড়ত দেশের পঙ্গু বিকল ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার ওপর। যাজকদের ওপর ছিল তাঁর সব চেয়ে অক্রোশ, যারা নিজেরা অসৎ হয়ে ধর্মের নামে জনসাধারণকে অন্ধ বিশ্বাসে ডুবিয়ে রেখেছে। তাঁর তীক্ষ্ণ কঠোর সমলোচনায় ছিল বিপ্লবের বীজ। আর **রুসো** ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মূল প্রবক্তা। তাঁর জগদবিখ্যাত ('Contract Social') সমাজ চুক্তি (১৭৬৩) নামক গ্রন্থে তিনি এক সরল পবিত্র সমাজের চিত্র কল্পনা করেন যেখানে সুখ, সমতা ও শান্তি অব্যাহত। তিনি বলেছেন মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মায় কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত। জনগণের ইচ্ছাই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় পরিস্ফুট হবে কারণ তাদের স্বাধীন সম্মতির ওপরই শাসকের অধিকার নির্ভর করে। সেদিনকার য়ুরোপে রাজার 'ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার' যুগে, রুসোর এই মতবাদ বিপ্লবের সূচনা করে। মঁতেস্ক্যু, ভোলত্যের ও রুসো ছাড়াও **'এনসাইক্লোপিডিয়া'** বা বিশ্বকোষের একজন লেখক **দিদেরো** (Diderot) সমাজ ধর্ম সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়গুলি নতুন যুক্তিবাদী আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। 'ফিজিওক্র্যাট' (Phisiocrat) নামে পরিচিত বিশেষজ্ঞরা নতুন ভাবে অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেন ও দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য কৃষির উন্নয়নের ওপর জোর দেন। ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবে নেতৃত্ব করেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ঘোষণাপত্রে প্রচারিত হল **মানবিক অধিকার** এবং **সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার** আদর্শ। প্রথমে গঠিত হল সংবিধান

রচনার জন্য এক সভা, তারপরে হল আইন সভা। পরে ১৭৯২ সালে এল জনসাধারণ, কৃষক শ্রমশিল্পীর মিলিত চেষ্টায় চরমপন্থী জেকোবিনদের নেতৃত্বে বৃহত্তর বিপ্লব। সাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হল **জাতীয় সভা** (National Convention)। দেশ চালনার ভার নিয়ে বিপ্লবীরা দেখল, চারদিকে বিপদ। ভেতরে জেকোবিন জিরোন্দিস্তদের (চরমপন্থী ও মধ্যপন্থী) দ্বন্দ্ব ও বিরোধ, বাইরে পলাতক অভিজাত শ্রেণীর ষড়যন্ত্র, শত্রু রাজ্যের আক্রমণ ভয়। এই সঙ্কটে শিশু রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে কঠোর নীতির প্রয়োজন। তাই দেশের নিরাপত্তার জন্য রাজা-রানীর প্রাণদণ্ড হল (১৭৯৩), প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম ফরাসী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র (Republic)। রাজতন্ত্র খতম হওয়াতে ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এক জোটে ফ্রান্স আক্রমণ করে। ফ্রান্স থেকে পাছে বিপ্লব অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে, সেই ভয়ে বিপ্লবী ফ্রান্সকে পরাস্ত করার দরকার হয়ে ওঠে।

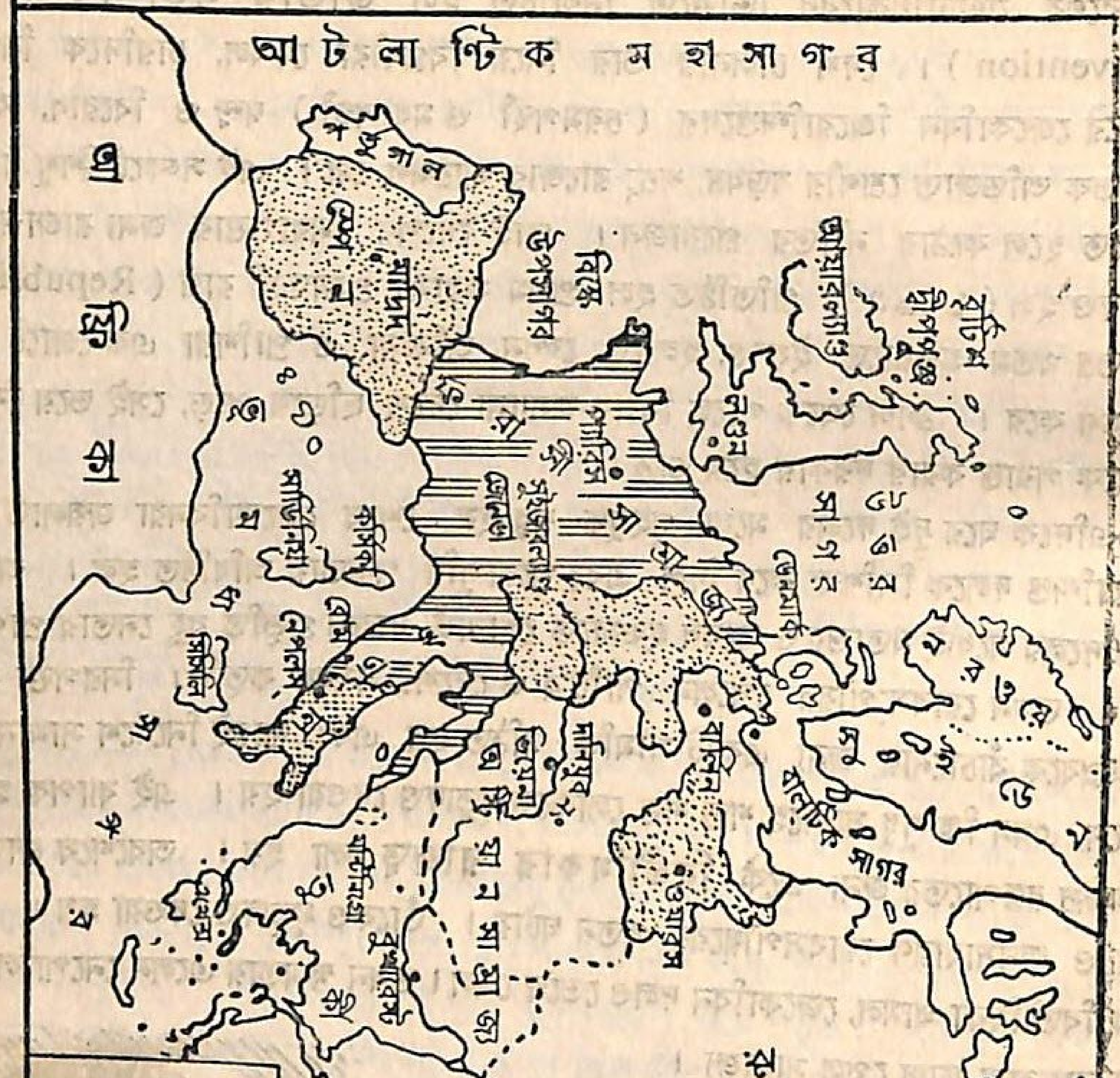
এদিকে ঘরে দুই দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, শেষে জেকোবিনরা জয়লাভ করে জিরোন্দিস্ত দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিল এবং পুরোপুরি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল। আবার নিজ দলের মধ্যেই মতান্তর ও সংঘর্ষ হওয়াতে হোবার্ট, দান্তন প্রভৃতি বহু নেতার প্রাণদণ্ড হল। তখন রোবস্‌পীয়র পেলেন পার্টির ও দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব। নিরপত্তা রক্ষা ও বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্য একটি সমিতি গঠিত হয় এবং তারই নির্দেশে সামান্যতম কারণে, এমন কি শুধু সন্দেহে শত শত লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই ব্যাপক হত্যা ও অজস্র রক্তপাতের জন্য একে **বিভীষিকার রাজত্ব** বলা হয়। অবশেষে জাতীয় সভা ও জনসাধারণ রোবসপীয়রের পতন ঘটায়। তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর পরে বিভীষিকা থামল, জেকোবিন দলও ভেঙ্গে গেল। তখন ক্ষমতায় এলেন নেপোলিয়ন, যাঁরা বাহুবলে ফ্রান্স পেল সাম্রাজ্য।



নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন : য়ুরোপীয় শক্তিজোটের বিরুদ্ধে যখন বিপ্লবী ফ্রান্সকে যুদ্ধ করতে হয় তখন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতি তারপর কনসাল (রাষ্ট্র প্রমুখ) এবং শেষে মুকুটধারী সম্রাট—নেপোলিয়নের এই উত্থান কাহিনী বিস্ময়কর। তাঁর প্রচণ্ড উচ্চাশা, বিশ্ব-বিশ্রুত বিজয়কাহিনী তাঁর কয়েকটি ব্যর্থ অভিযান ও মারাত্মক ভুল, (যেমন, রুশ অভিযান ও 'মহাদেশ অবরোধ প্রথা',) ওয়াটারলুর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের হাতে তাঁর শোচনীয় পরাজয়, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তাঁর নির্বাসন ও মৃত্যু এসব কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। কনসাল ও সম্রাট হিসাবে তাঁর কয়েকটি কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি প্রথমে চার্চকে রাষ্ট্রের অধীনে

এনে দুই প্রান্তের মধ্যে একটা আপোষ করলেন। শাসনব্যবস্থা পাকা করার জন্য দেশের বিভিন্ন বিভাগ বা জেলাকে কেন্দ্র সরকারের শাসনাধীন করলেন। প্রচলিত



আইনগুলির সংস্কার করে, শ্রেণীবিভাগ করে সেগুলিকে বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন-সঙ্কলন তাঁর বড় কীর্তি। কারণ এই 'কোড নেপোলিয়ন' য়ুরোপে আদর্শরূপে গণ্য হয়। আইনতঃ সকলে সমান, প্রতিভার জোরে যে কোন ব্যক্তি উচ্চপদ পেতে

অধিকারী, তাঁর এই নীতি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ থেকে পাওয়া। এছাড়া জাতীর শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি নির্মাণ, মুদ্রানীতির সংস্কার, জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ কাজ তাঁর সংগঠন শক্তির পরিচয়। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও শাসনতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ হলেও, রিপাবলিক ফ্রান্সের অসীম সাহসী সুনিপুণ যোদ্ধা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব কিছু কম নয়। তবে সম্রাট হয়ে তিনি সেই বিপ্লবকে নষ্ট করেন।

এক দিক থেকে নেপোলিয়নের কার্যকলাপ সার্থক হয়েছিল। তিনি যখন বিপ্লবী ফ্রান্সের সেনাপতিরূপে ইটালি ও জার্মানিতে যুদ্ধ চালান, যখন বিপ্লবের মূল আদর্শগুলি সেখানে প্রচারিত হয়। তারপর বিজয় অভিযান সমাপ্ত হলে সব দেশে নেপোলিয়নের বিভিন্ন শাসন সংস্কার, বিশেষ করে তাঁর বিধিবদ্ধ আইন-ব্যবস্থা (Code Napoleon) বিজিত দেশগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ফরাসী সমাজে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত দেখে সেখানকার অধিবাসীরা অনুপ্রাণিত হয়। তা ছাড়া, নেপোলিয়নের শাসনভূক্ত দেশগুলিতে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এবং নেপোলিয়নের স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে সারা য়ুরোপ বিদ্রোহ করে। স্পেন, পোর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশের মুক্তি সংগ্রাম (১৮১৩-১৪) নেপোলিয়নের পতনের মূল কারণ বলা যায়।

উনিশ শতকে ইটালি ও জার্মানিতে ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন জাগে তারও পেছনে আছে ফরাসী বিপ্লবের এই স্বাধীনতা ও জাতীয়তার আদর্শ। সে দিক থেকে ভারতেও ফরাসী বিপ্লবের আবেদন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মানসিক উৎকর্ষ ও যুক্তিবাদ, মানবিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনা এবং জাতীয়তা বোধ— এইসব উদার নীতি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়দের মধ্যে কিছু কিছু সঞ্চারিত হয়। মোটের ওপর, বর্তমান জগতে জাতীয়তাবাদ (ন্যাশলিজম) বিদেশীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রের (ডিমোক্রেসি), প্রসার সমাজবাদী (সোশ্যালিস্ট) চিন্তার প্রসার প্রভৃতি প্রগতিশীল আন্দোলন—এ সবই ফরাসী বিপ্লবের উত্তরাধিকার ও স্থায়ী ফল বলে স্বীকৃত হয়েছে।

এক নজরে

* ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ধর্মবিরোধই ছিল য়ুরোপের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ক্রমশ অতিপ্রাকৃত ধর্মবিশ্বাস থেকে মানুষের দৃষ্টি প্রাকৃত বিজ্ঞান ও প্রাকৃত ধর্মে নেমে আসে। একেই জ্ঞানদীপ্ত বলে। এর প্রভাবে ইউরোপে বিচার-বিশ্লেষণের যুগ আরম্ভ হয়।

* অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকায় ইংলণ্ডের মোট ১৩টি উপনিবেশ ছিল। এগুলি ইংলণ্ডের রাজা গভর্নর নিয়োগ করে শাসন করতেন। এইসব উপনিবেশের উপর ইংলণ্ডের অন্যায়-আচরণ উপনিবেশ বাসীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল।
* ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তেরটি উপনিবেশ মিলিত ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা বৃটিশ সরকার আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে।
* ১৭৫০ থেকে ১৮৫০, এই একশ' বছরে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে বিভিন্ন দেশে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে তাকে বিপ্লব বলে। শিল্পবিপ্লবের উৎপত্তি ও দ্রুত উন্নতি হয় প্রথমে ইংলণ্ডে।
* ফরাসী বিপ্লবেরর প্রাক্কালে রুশো, ভলটেয়ার, মন্টেগু প্রমুখ দার্শনিকগণ ফরাসী জাতির চিন্তাজগতে পরিবর্তন এনেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয় ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। বিপ্লব চলাকালীন ফরাসী জাতীয় সভায় সদস্যরা এক ঘোষণাপত্রে প্রচার করলেন মানবিক অধিকার এবং সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ।
* আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও বহিরাক্রমণজনিত সংকটকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। সাধারণ সৈনিক থেকে সেনাপতি। তারপর কনসাল এবং শেষে মুকুটধারী সম্রাট নেপোলিয়নের এই উত্থানকাহিনী বিস্ময়কর। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, ওয়াটারলুর যুদ্ধে তাঁর চরম পরাজয় ও ইংলণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ ততোধিক বিস্ময়কর। সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত নেপোলিয়ন মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* আমেরিকায় কি ভাবে উপনিবেশগুলি গড়ে উঠেছিল ?
* আমেরিকায় উপনিবেশের সংখ্যা কটি ছিল ?
* আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতা কে ছিলেন ?
* আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান কিভাবে ঘটেছিল ?
* শিল্প বিপ্লবের উৎপত্তি প্রথম কোথায় ঘটে ?
* ইংলণ্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব হওয়ার কারণ কি ?
* কৃষিবিপ্লব কাকে বলে ?
* চলন্ত মাকু কে আবিষ্কার করেছেন ?
* স্পীনিং জেনি কে আবিষ্কার করেছেন ?

* ওয়াটার ফ্রেম-বা জলচালিত যন্ত্র কে আবিষ্কার করেছেন ?
* পাওয়ার লুম বা শক্তিচালিত তাঁত কে আবিষ্কার করেন ?
* বাষ্পশক্তির আবিষ্কর্তা কে ?
* লোহা গলাবার বিরাট চুল্লী কে তৈরি করেছেন ?
* সেফটি ল্যাম্প কে আবিষ্কার করেছেন ?
* পাকা রাস্তা তৈরি করার কৌশল কে আবিষ্কার করেছেন ?
* কোন বছর ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় ?
* রুশো কে ছিলেন ? তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থখানির নাম কি ?
* ভোলত্যের কে ছিলেন ?
* মঁতেস্কো কে ছিলেন ? তিনি তাঁর গ্রন্থে কাদের সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন ?
* দিদেরো কে ছিলেন ?
* জেকোবিন কাদের বলা হতো ?
* রোবসপীয়র কে ছিলেন ?
* নেপোলিয়ন কে ছিলেন ?
* কোড নেপোলিয়ন কি ?
* কোন যুদ্ধে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ?
* নেপোলিয়নকে কোথায় নির্বাসন দেওয়া হয় ? কত খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি কি ভাবে গড়ে উঠেছিল ?
২। আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলির শাসন কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৩। আমেরিকার উপনিবেশগুলির ব্যবসাবাণিজ্য কি ভাবে চলত ?
৪। বোষ্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের পেটিগুলি জলে কেলে দেওয়া হয়েছিল কেন ?
৫। আমেরিকার ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি কত তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ? এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালক ও নেতা কে ছিলেন ? স্বাধীনতা যুদ্ধ কত দিন ধরে চলেছিল ?
৬। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান কি ভাবে ঘটেছিল ?
৭। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ কি ?
৮। শিল্প-বিপ্লবের অর্থ কি তা বুঝিয়ে বল।
৯। ইংলণ্ডে প্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার সঙ্গত কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। শিল্প বিপ্লবের পরোক্ষ ফল কি হয়েছিল ?

১০। কৃষিবিপ্লব কাকে বলে? এই বিপ্লবের পটভূমি সংক্ষেপে আলোচনার কর।
১১। ফরাসী-বিপ্লবে সময় দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল?
১২। ফরাসী বিপ্লবে চিন্তানায়কদের ভূমিকা আলোচনা কর।
১৩। নেপোলিয়নকে বিপ্লবের সৈনিক বলা হয় কেন?
১৪। শাসক হিসেবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব কি?
১৫। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলগুলি উল্লেখ কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। আমেরিকায় ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি কি ভাবে গড়ে উঠেছিল?
২। ইংলণ্ডের সঙ্গে উপনিবেশগুলির বিরোধের সূত্রপাত কিভাবে ঘটে?
৩। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। শিল্পবিপ্লবের অর্থ ও প্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। 'ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব প্রথম শুরু হয় বয়নশিল্পে'-এর কারণ কি?
৬। বাষ্পশক্তির আবিষ্কার শিল্পে বিপ্লব সৃষ্টিতে কতখানি সহায়ক হয়েছিল?
৭। ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৮। রুশো কে ছিলেন? তাঁর মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৯। ভোলত্যের কে ছিলেন? তিনি ফ্রান্সের মানুষকে কিভাবে বিপ্লবমুখী করে তুলেছিলেন?
১০। 'মতেস্কু্য কে ছিলেন? তাঁর মতবাদ কিভাবে ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল?
১১। নেপোলিয়ন কে ছিলেন? তিনি কি ভাবে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
১২। নোপোলিয়নের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কেন?
১৩। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
১৪। ফরাসী-বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল আলোচনা কর?

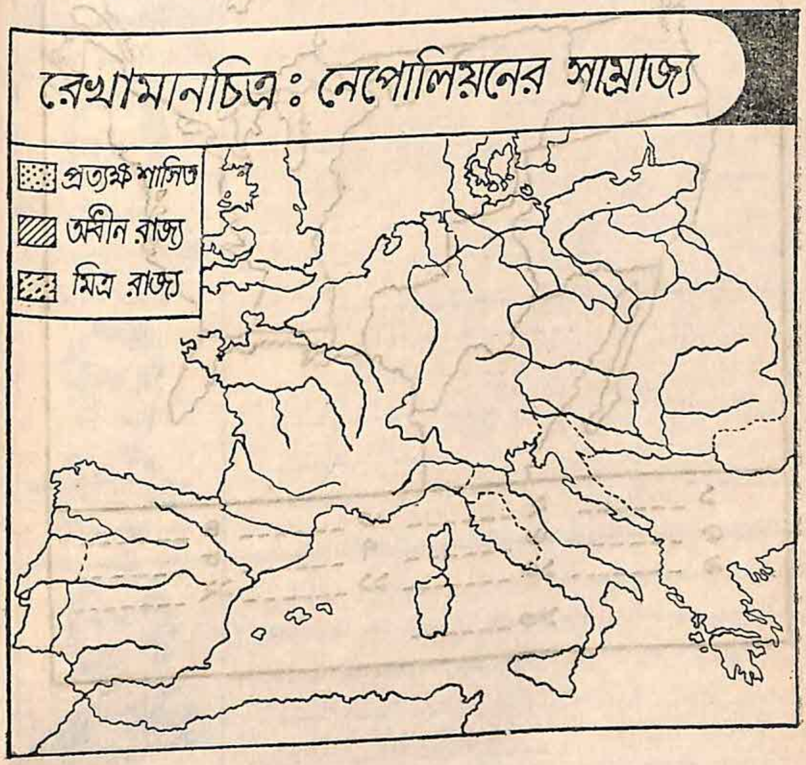
[তিন] দুই এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) আমেরিকায় ইংলণ্ড কটি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল?
(খ) চায়ের উপর কত শুল্ক বজায় রাখা হয়েছিল?
(গ) আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালক ও নেতা কে ছিলেন?
(ঘ) কোন ইংরেজ সেনাপতি ঔপনিবেশিকদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছিলেন?
(ঙ) কত খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
(চ) কি কি যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বয়নশিল্পের উৎপাদন মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল?

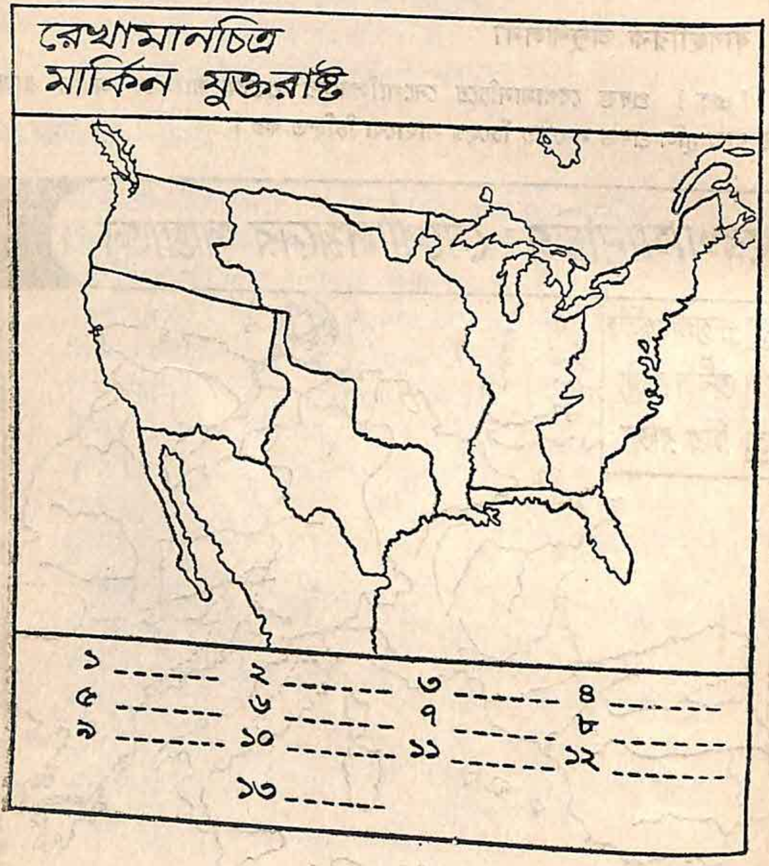
(ছ) পাকা রাস্তা তৈরি করার কৌশল কে আবিষ্কার করেছেন ?
(জ) কোন স্বৈরাচারী রাজবংশ ফ্রান্সে দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিল ?
(ঝ) Social Contract বা 'সমাজ চুক্তি' নামক গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

ব্যবহারিক অনুশীলনী

[এক] প্রদত্ত রেখামানচিত্রে নেপোলিয়নের প্রত্যক্ষ শাসিত, অধীন রাজ্য ও মিত্র রাজ্যগুলি প্রদত্ত সংকেত চিহ্নের সাহায্যে চিহ্নিত কর।



[দুই] প্রদত্ত রেখা-মানচিত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ১৩টি উপনিবেশের সীমা যে-কোন সংকেত চিহ্ন এবং ১—১৩ সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ কর এবং রেখাচিত্রে নির্দিষ্ট স্থানে লেখ।



[তিন] নিচের ছকের বাঁ-পাশের চিত্রগুলি সম্পর্কে ডান পাশের শূন্যস্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ



জর্জ ওয়াশিংটন



ভোলত্যের



মঁতেস্কু



রুসো



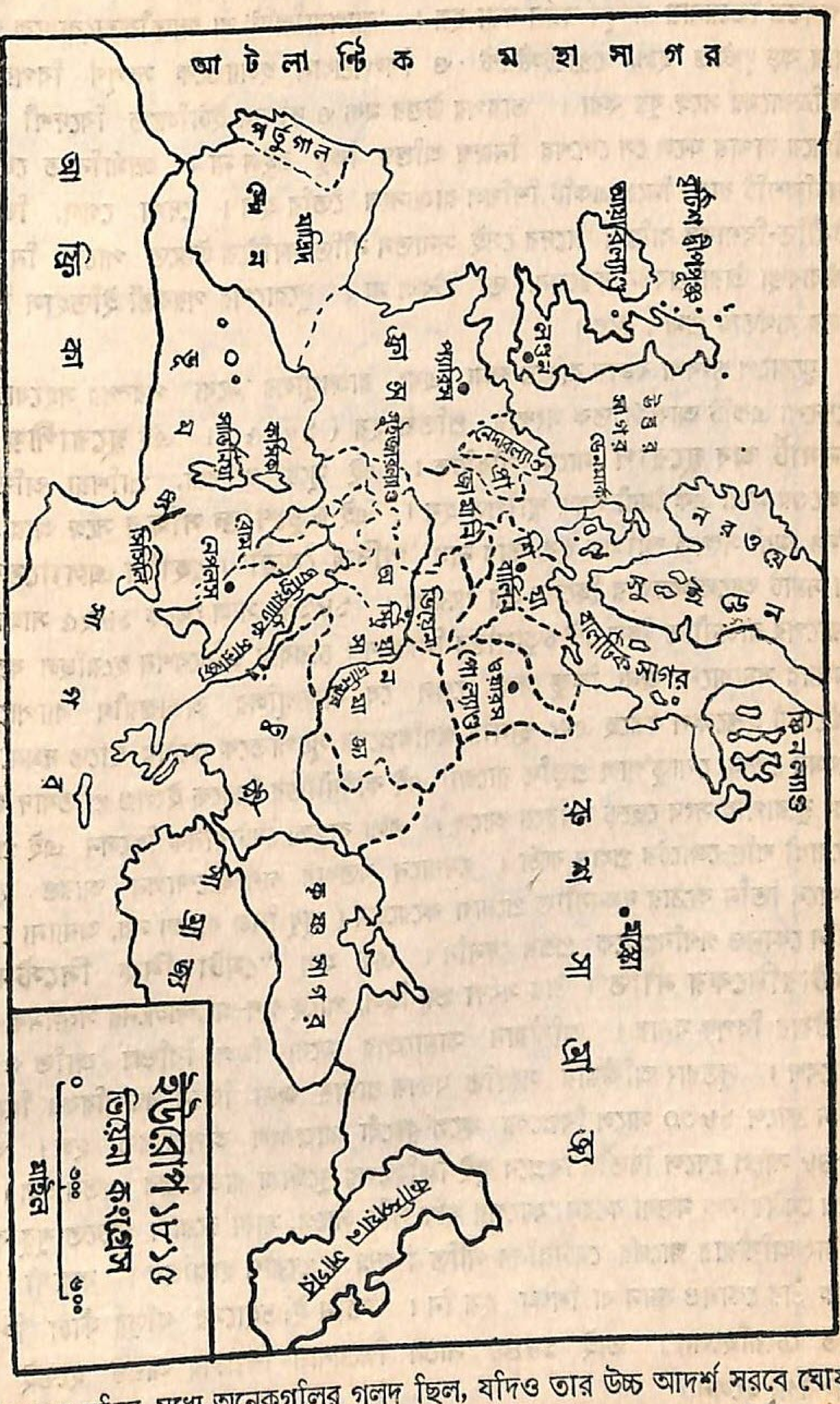
নেপোলিয়ন



য়ুরোপের পুনর্গঠন : নেপোলিয়নের পতন হলে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা য়ুরোপের পুনর্গঠন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তার সমাধানের জন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী **ভিয়েনা** শহরে মিলিত হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স মেটারনিক (অষ্ট্রিয়ার চান্সেলার), ইংলণ্ডের কাসল্রি ও ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, রাশিয়ার সম্রাট প্রথম আলেকজান্দার এবং ফ্রান্সের তালের্াঁ। রাজনীতি জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী **মেটারনিক** নেপোলিয়নের পতনে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তির প্রধান কারণ যে, কূটনৈতিক চালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত য়ুরোপের রাজনীতির তিনি কর্ণধার ছিলেন। তিনি ছিলেন ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল এবং উদারনীতির বিরোধী। জাতীয়তাবাদ আর গণতন্ত্রের বিপক্ষে তিনি সব রকম চেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত য়ুরোপে এবং নিজ দেশ অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যে বিপ্লবের কাছে হার মানতে বাধ্য হন।

য়ুরোপে শান্তি-প্রচেষ্টা, সেখানকার রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করাই ছিল **ভিয়েনা সম্মেলনের** (Congress of Viena) মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনের কার্যকলাপে তিনটি মূলনীতি লক্ষ্য করা যায়—(১) বিপ্লবের আগে, রাজ্যগুলিকে পূর্ব শাসনাধীনে ফিরিয়ে আনা। একে **বৈধ অধিকার** নীতি বলা হয়। (২) নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যাঁরা যুদ্ধ করেছেন সেই বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা এবং নেপোলিয়নের মিত্রপক্ষ রাষ্ট্রগুলির সীমা সংকুচিত করা। (৩) য়ুরোপের বড় রাজ্যগুলির মধ্যে **শক্তিসাম্য** বজায় রাখা। এই সর্তকতামূলক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভবিষ্যতে কোনও বড় রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে যুদ্ধ বিগ্রহে য়ুরোপের নিরাপত্তা ও শান্তি নষ্ট করতে না পারে। এইভাবে বিজয়ীদের পুরস্কার ও বিজিতদের শাস্তি হিসাবে রাজগুলির পুনর্বণ্টন ও ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা নেওয়া হল। তার ফলে পোপ রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডে লাভবান হল। ফ্রান্সকে ১৭৯২ সালের পূর্বেকার সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হল, যাতে ফ্রান্স আর কখনও সেই গণ্ডী অতিক্রম করে অন্য রাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস করতে না পারে। **'বৈধ অধিকার'** নীতির মধ্য দিয়ে ফ্রান্স, স্পেন ও নেপল্স-এ পুরাতন বুরবোঁ রাজবংশ, এবং পিডমন্ট-সার্ডিনিয়াতে স্যাভয় বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হল, বিপ্লবের ফলে যেসব রাজ্য হস্তান্তরিত হয়েছিল, সেগুলি অবৈধ বলে বাতিল করা। শক্তি-সাম্য নীতি অনুসারে ফ্রান্সের উত্তরে বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে নেদারল্যাণ্ড রাষ্ট্র গঠন করা হল। পূর্ব-সীমান্তে প্রাশিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল এবং ইটালির

উত্তরভাগে অস্ট্রিয়ার অধিকার বাড়িয়ে ফ্রান্সকে তিনদিক থেকে শক্তিশালী রাজ্য দিয়ে ঘিরে ফেলা হল।



ভিয়েনা চুক্তির মধ্যে অনেকগুলির গলদ ছিল, যদিও তার উচ্চ আদর্শ সরবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রভৃতি বড় বড় আদর্শ কিন্তু বাস্তবে

কার্যকর হয় নি। কারণ ভিয়েনা কংগ্রেস মেটারনিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত, সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণপন্থী ছিল। ফরাসী বিপ্লবের দুটি বড় আদর্শ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র ভিয়েনায় সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। 'ন্যাশনালিটি' বা জাতীয়তাবোধকে অগ্রাহ্য করার বড় দৃষ্টান্ত হল, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও শিল্পপ্রধান হল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বেলজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত করা। তারপর উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ইটালিতে বিদেশী শাসক চাপিয়ে রাখার ফলে সে দেশের নিজস্ব অস্তিত্ব কিছু রইল না। জার্মানিতে ছোট বড় উনচল্লিশটি রাজ্য নিয়ে একটি শিথিল রাজ্যসংঘ তৈরি হল। দেখা গেল, ভিয়েনার কূটনীতি-বিশারদ ব্যক্তিরা তাঁদের সেই সনাতন নীতি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। যে রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁরা প্রবর্তন করলেন, তা টিকল না। য়ুরোপের পরবর্তী ইতিহাস ভিয়েনা চুক্তির ব্যর্থতাই প্রমাণ করে।

য়ুরোপে শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় (১৮১৫)। এই **য়ুরোপীয় সংঘ কন্‌সার্ট অব য়ুরোপ** নামে পরিচিত। এই সূত্রে রাশিয়া, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই **চতুঃশক্তি সন্ধির** সঙ্গে আর একটি ঘনিষ্ঠ মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তার নাম **'পবিত্র মৈত্রী' (হোলি এল্যায়েন্স)**। রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডার ছিলেন এর পুরোধা। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৫ সাল পর্যন্ত য়ুরোপের রাজনীতি ছিল এই চতুঃশক্তির নিয়ন্ত্রণে। চারবার অধিবেশন হয়েছিল কয়েকটি সমস্যার সমাধানের জন্য, কিন্তু দেখা গেল যে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রাষ্ট্রজোট হস্তক্ষেপ করছে এবং স্থানীয় গণবিপ্লবের সূত্রপাতকে কঠোর হাতে দমন করছে (যেমন স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি রাজ্যে) এই কার্যনীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড প্রতিবাদ জানায় এবং য়ুরোপীয় সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বলা বাহুল্য মেটারনিক ছিলেন এই প্রগতি-বিরোধী শক্তি-জোটের প্রধান কর্তা। যেখানে যতবার গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, সেখানে তিনি কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেছেন। শুধু নিজ রাজ্যে নয়, অন্যান্য দেশেও তিনি কোনও গণবিপ্লবকে প্রশ্রয় দেননি। এই হল **"মেটারনিক সিস্টেম'** বা **'মেটারনিকের নীতি'**। তাঁর সর্বদা ভয় ছিল, পাছে গণ-আন্দোলনের সংক্রামক স্পর্শে অস্ট্রিয়ার বিপদ ঘনায়। অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের সমাবেশ। সুতরাং অস্ট্রিয়ার সংহতি বজায় রাখার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেমন ফ্রান্সে ১৮৩০ সালে বিপ্লবের ফলে বুরবোঁ রাজবংশ অপসারিত হল। আবার ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিপ্লবে লুই ফিলিপের বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পতন হল। এই দেখে মেটারনিক মন্তব্য করেন 'ফান্সের যদি সর্দি লাগে, সারা য়ুরোপ হাঁচতে শুরু করে।' সুতরাং অস্ট্রিয়ার স্বার্থের 'মেটারনিক-নীতি'র জন্ম ও প্রয়োগ হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব থেকে তাঁর কোনও জ্ঞান বা শিক্ষা হয় নি। তিনি ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই ১৮৪৮ সালে ভিয়েনায় বিপ্লবের আরম্ভ হতেই তিনি দেশত্যাগী হলেন।


ইটালির ঐক্যসাধন
ম্যাৎসিনি
কাভুর
অস্ট্রিয়া
সুইজারল্যাণ্ড
১৮৫৯
লম্বার্ডি
১৮৬৬
ভিনিসিয়
পারমা
১৮৬০
ফ্লোরেন্স
তাসকেনি
১৮৬০
কর্সিকা
১৭৬৮
রোম
১৮৭০
গ্যারিবল্ডি
ভিক্টর এমানুয়েল

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র :

ইটালির ঐক্যস্থাপন : ১৮১৫ সালে ইটালি ফরাসী বিপ্লবের আগের অবস্থায় ফিরে গেল। অর্থাৎ ভূগোলের মানচিত্রেই তার অস্তিত্ব, তার নিজস্ব কোনও স্বাধীন সত্তা রইল না। সেখানে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, আর ধর্মযাজকদের প্রাধান্য। ইটালি তখন বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল. (১) পিড্‌মণ্ট—সার্ডিনিয়া রাজ্য, তার মধ্যে জেনোয়া, স্যাভয় ও নীস্ প্রদেশ (২) লম্বার্ডি—ভিনিসিয় রাজ্য। অস্ট্রিয়ার তাঁবেদার, রক্ষণশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী। (৩) পর্মা, মডেনা, টাসকেনি নামে তিনটি ছোট রাজ্য আস্ট্রিয়ার সম্রাটের আত্মীয়দের দ্বারা শাসিত। (৪) পোপের কয়েকটি রাজ্য। ও (৫) নেপল্‌স ও সিসিলি, একত্রে একটি রাজ্য বুরবোঁ রাজবংশের শাসনাধীন। সুতরাং ইটালির ঐক্য সাধনে যথেষ্ট বাধাবিপত্তি ছিল। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত না হলে ইটালির পক্ষে একটি সুসংবদ্ধ রাজ্যে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকে যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের স্ফুরণ দেখা যায়, তা ফরাসী বিপ্লবেরই ফল। 'স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব'—বিপ্লবের এই বাণী য়ুরোপে যখন ছড়িয়ে পড়ে. তখন বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং গণতন্ত্রের দাবী জোরদার হয়। পরাধীন ইটালিতেও সেই নতুন উদ্দীপনা জাগল। সৈনিক নেপোলিয়ন যখন ইটালি জয়ের অভিযানে যান, তখন সে দেশের লোক বিপ্লবের মর্মকথা জানতে পারে। আবার সম্রাট নেপোলিয়নের শাসনাধীনে থেকে তাদের স্বাধীনতার কামনা জাগ্রত হয়। ইটালির ঐক্য সাধনে বিভিন্ন পন্থা ও মত ছিল। (১) রিপাবলিক বা সাধারণ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, যেটি **'কর্বোনারি'** নামে গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য ছিল। আদর্শবাদী **ম্যাৎসিনির** পরিচালিত **'তরুণ ইটালি'** (Young Italy) দলের স্বপ্ন ছিল, সমগ্র ইটালিকে একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে ঐক্যবদ্ধ করা। (২) পোপের কর্তৃত্বে বিভিন্ন রাজ্য নিয়ে একটি রাজ্যসংঘ গঠন। (৩) স্যাভয় রাজবংশের নেতৃত্বে পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া রাজ্যকে কেন্দ্র করে সমগ্র ইটালি জুড়ে একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপন।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে বিপ্লব ও প্যারিসে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়ে মিলান ও ভিনিসে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে ম্যাৎসিনি রোমকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করলেন এবং পোপের শাসন-ক্ষমতাকে অস্বীকার করলেন। ওদিকে সার্ডিনিয়ার নিয়মতান্ত্রিক রাজা চার্লস এ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ার কাছে পরাস্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর ছেলে দ্বিতীয় ইমান্যুয়েল রাজা হলেন। ১৮৪৮ সালে ইটালির বিদ্রোহ এবং মুক্তি আন্দোলন ব্যর্থ হল। বোঝা গেল যে পোপের নেতৃত্বে ইটালির ঐক্য সাধন সম্ভব নয়, এবং ম্যাৎসিনি ও তাঁর প্রজাতন্ত্রী দলের মাধ্যমেও ইটালির স্বাধীনতা আসবে না। এখন থেকে **কাভুরের** ভূমিকাই প্রধান হল। এই বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক ব্যক্তি ছিলেন সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী। রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের সহযোগিতায় তিনি ধীরে ধীরে ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় নামলেন। ইটালির জাতীয় আন্দোলনে এই প্রথম এক রাজবংশের সমর্থন পেল। কাভুর বুঝেছিলেন যে ইটালির ঐক্যসাধনের প্রধান বাধা হল অস্ট্রিয়া। তাকে পরাস্ত করতে হলে সামরিক

শক্তি এবং শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সহযোগিতা হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের পক্ষে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগদান করলেন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সফল হল না। তবে তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালির জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ভেবেছিলেন যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইটালির মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করলে ফ্রান্সের লাভ হবে।

কাভুর ও তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাতে স্থির হল যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়াকে সাহায্য করবেন। অস্ট্রিয়া পরাস্ত হলে ইটালির অনেক অংশ পিডমণ্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। সাহায্যের বিনিময়ে ফ্রান্স নীস্ ও স্যাভয় প্রদেশ দুটি লাভ করবে। অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাস্ত হয়ে লম্বার্ডি থেকে বিতাড়িত হল। মধ্য ইটালির শাসকরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফরাসী সম্রাট হঠাৎ কাভুরকে কিছু না জানিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের এই আচরণে সমগ্র ইটালি ক্ষুব্ধ হল। ফরাসী সম্রাটের এই পিছু হটার কারণ হল, তিনি পোপের বিরুদ্ধ পক্ষ যোগ দিলে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী স্বদেশবাসীর কাছে হেয় হবেন। যাই হোক, মধ্য ইটালির রাজ্যগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিল। তারা সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইল। গণভোটের মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হল।

ইটালির ঐক্যসাধন অনেকটা অগ্রসর হল কিন্তু তখনও অস্ট্রিয়ার অধীনে ভিনিস, পোপের রাজ্য এবং দক্ষিণে নেপ্‌লস ও সিসিলির ঐক্যসাধন বাকি ছিল। ১৮৬০ সালে সিসিলিতে বুরবোঁ রাজবংশের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিলে কাভুর পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন করেন। সেই সময় ইটালির দেশপ্রেমী সাহসী বীর গ্যারিবলডি এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে সিসিলি আক্রমণ করেন ও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন। সিসিলির রাজা পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন **গ্যারিবলডি** সিসিলি রাজ্যকে পিডমণ্ট রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তারপর গ্যারিবলডির স্বেচ্ছাবাহিনী নেপ্‌লস আক্রমণ করে সহজেই জয় করল। এই সময় কাভুরের নির্দেশে গ্যারিবলডিকে থামতে হল। কাভুরের আশঙ্কা ছিল যদি গ্যারিবলডি রোম আক্রমণ করেন, তাহলে তৃতীয় নেপোলিয়ান হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যাইহোক, রোম ব্যতীত পোপের রাজ্যগুলি ভিক্টর ইমান্যুয়েল অধিকার করলেন এবং নেপ্‌ল্‌সে গ্যারিবলডির সঙ্গে মিলিত হলেন। জনমত অনুযায়ী নেপ্‌ল্‌স ও সিসিলি সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল। এখন থেকে ভিক্টর ইমান্যুয়েল ইটালির রাজা বলে ঘোষিত হলেন (১৮৬১) দুর্ভাগ্যক্রমে কাভুর ইটালির পূর্ণ ঐক্য দেখে যেতে পারেন নি। তখনও ভিনিস ও রোম অধিকার বাকি ছিল। ১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে ইটালি প্রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করে। অস্ট্রিয়া পরাস্ত হলে ভিনিস ইটালির দখলে এল। অবশিষ্ট রইল রোম। রোমের দখলে প্রধান বাধা ছিলেন তৃতীয় নেপোলিয়ন। ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিকদের সমর্থনের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হত, তাই তিনি রোমে এক ফরাসী বাহিনী রেখেছিলেন।

কিন্তু ১৮৭০ সালে যখন প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হল, তখন রোম থেকে ফরাসী সৈন্যদল ফিরিয়ে আনতে হল। এই যুদ্ধে তৃতীয় নেপোলিয়ন পরাস্ত হলে ইটালির সৈন্য বাহিনী ভিক্টর ইমান্যুয়েলের নেতৃত্বে রোমে প্রবেশ করল। রোম ইটালির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলে ইটালির মুক্তি ও ঐক্য সিদ্ধ হল (১৮৭০)। রোম এখন নবীন রাজ্য ইটালির রাজধানী হল।

ইটালির ঐক্য যে বাস্তবে রূপায়িত হল, সেজন্য কাভুরের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী ম্যাৎসিনির আদর্শ যেখানে সফল হতে পারল না, বীর গ্যারিবলডির বিজয় অভিযান অর্ধপথে যেতে ইটালির ঐক্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল, সেখানে কাভুরের কূটনীতি ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করে, তাদের সাহায্য নিয়ে, ইটালির ঐক্য-সঙ্কল্পকে সিদ্ধির পথে নিয়ে এল। তাঁর কৌশল ও বাস্তব জ্ঞান এটি সম্ভব করেছিল। অবশ্য ম্যাৎসিনি, গ্যারিবলডি ও ভিক্টর ইমান্যুয়েল প্রত্যেকের অবদান স্বীকার করতেই হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী কাভুরই রাজাকে সামনে রেখে ইটালিকে দিয়ে গেলেন এক রাজ্য, এক পতাকা।

জার্মানির ঐক্য সাধন ঃ ঊনিশ শতকের গোড়ায় জার্মানির ভিতরকার অবস্থা অনেকটা ইটালির মতই ছিল। একটা গোটা দেশ নয়, বহু বিভক্ত একটি ভৌগোলিক এলাকা মাত্র ; নেপোলিয়ন 'পবিত্র রোমান' সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দেন ও 'রাইন রাষ্ট্রসংঘ' গঠন করে জার্মানির ঐক্য কামনা জাগিয়ে তোলেন। ইটালি তার উত্তর অঞ্চলকে অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল, জার্মানির লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রসংঘ থেকে অস্ট্রিয়ার প্রভাব দূর করা। উভয় ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়াই ছিল ঐক্য সাধনের মস্ত বাধা। ইটালিতে মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় পিডমন্ট-সার্ডিনিয়া, জার্মানিতে নেতৃত্ব দেয় প্রাশিয়া। সুতরাং ইটালির ও জার্মানীর সমস্যা অনেকটা এক রকম—কি ভাবে প্রধান শত্রু অস্ট্রিয়াকে তাড়ানো যায়। ভিয়েনা কংগ্রেসে জার্মানীর যে পুনর্গঠন হল, তাতে জাতীয়তাবাদীরা হতাশ হল। প্রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হলেও জার্মানিতে প্রাধান্য রইল অস্ট্রিয়ার হাতে।

মেটারনিক জার্মানিতে তাঁর প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য সব রকম জাতীয় ও গণ-আন্দোলন দাবিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর নীতি ও পদ্ধতির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে এনে তিনি সেখানকার অধ্যাপকদের উপর কড়া নজরের জন্য নির্দেশ দিলেন। ছাত্রদের ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হল। ১৮৩০ সালে কয়েকটি রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিক কঠোর হস্তে তা দমন করেন এবং জার্মান রাজ্যগুলিতে জনগণের অধিকার হ্রাস করলেন। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা রইল না। এতে জার্মানরা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হল, তাদের দেশাত্মবোধ এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা আরও প্রবল হল। ১৮৩৩ সালে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি কাস্ট্‌মস ইউনিয়ন' বা শুল্ক প্রতিষ্ঠান গঠনের ফলে রাজ্যগুলির ভিতরে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেওয়া হয়। তাতে রাজ্যগুলির আর্থিক উন্নতি ও ঐক্য তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে।

১৮৪৮ সালের বিপ্লবে জার্মানদের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ প্রবল হয়। তারা চাইল, যে দেশে এক জাতির মানুষ, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের স্থানে একটি

রাজ্যসরকার থাকা উচিত। তা হলে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে গণ-প্রতিনিধিরা **ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট** (জাতীয়) সভায় মিলিত হলেন (১৮৪৮-৪৯)। এই অধিবেশনে দুটি সমস্যার আলোচনা হলঃ জার্মান রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ আর শাসক নির্বাচন। শেষে ঠিক হল সম্মিলিত জার্মান রাষ্ট্রসংঘ থেকে অস্ট্রিয়াকে বাদ দিতে হবে। জার্মানিতে অস্ট্রিয়ার কর্তৃত্ব মানতে কেউ রাজি ছিলেন না। এই সংযুক্ত জার্মান রাজ্যের সম্রাট পদ নেওয়ার জন্য প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডরিক উইলিয়মকে অনুরোধ করা হয়। প্রতিনিধিদের কাছ থেকে রাজপদ গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হল। বোঝা গেল, জার্মানির ঐক্য পার্লামেণ্টের মারফৎ বিধিসঙ্গত উপায়ে আসবে না, আসতে পারে একমাত্র সামরিক শক্তি খাটিয়ে, এক শক্ত সমর্থ রাজ-তন্ত্রের পরিচালনায়। ক্রমেই অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। একই এলাকায় দুই শক্তির প্রাধান্য চলে না। তাই অস্ট্রিয়াকে হটানো দরকার এবং সেটা সম্ভব হবে যুদ্ধে পরাস্ত করে। এই সময় প্রাশিয়ার নতুন রাজা প্রথম উইলিয়ম **বিসমার্ককে** তাঁর প্রধানমন্ত্রী করে (১৮৬২) প্রাশিয়ার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করলেন। সেনাবাহিনী আরও দৃঢ়বদ্ধ ও শক্তিশালী হল। বিসমার্ক ছিলেন সে যুগের বড় রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সভা-সমিতির মাধ্যমে ভোট আর বক্তৃতা দিয়ে কঠিন, জটিল সমস্যার সমাধান করা যাবে না, 'রক্তপাত আর অস্ত্রে'র দ্বারাই তা সম্ভব হবে (Blood and Iron)।



বিসমার্ক

বিসমার্ক এবার তাঁর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে উদ্যোগী হলেন এবং অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার জন্য পর পর তিনটি যুদ্ধে নামলেন। ১৮৬৪ সালে তিনি অস্ট্রিয়াকে রাজি করিয়ে একত্রভাবে ডেনমার্ককে আক্রমণ করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, জার্মানির অন্তর্গত কিন্তু ডেনমার্কের অধীন দুটি রাজ্য (শ্লেসউইগ ও হলস্টাইন) প্রাশিয়ার অধিকারভুক্ত করা। ডেনমার্ক পরাস্ত হলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া শ্লেসউইগ ও হলস্টাইন যথাক্রমে করায়ত্ত করল। বিসমার্কের উদ্দেশ্য আংশিক সফল হল, কিন্তু তাঁর আসল অভিপ্রায় ছিল হলস্টাইন রাজ্যটিকেও অধিকার করা। এখন বিসমার্ক যে ভাবে অগ্রসর হলেন সেটি তাঁর অসামান্য বিচক্ষণতা ও কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। ছলে বলে কৌশলে অস্ট্রিয়াকে পরাজয়ের আঘাত হেনে তাকে জার্মানি থেকে বহিষ্কৃত করার জন্য এই ব্যাপারে প্রয়োজন হল ইংলণ্ড ও রাশিয়ার নিরপেক্ষতা। সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি কৌশলে ফ্রান্স ও ইটালিকে স্বপক্ষে টানলেন। বিসমার্ক তৃতীয় নেপোলিয়নকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যদি বিসমার্কের বিরোধিতা না করেন বা সহায় হন, তার বিনিময়ে তিনি বেলজিয়াম ও জার্মানির মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি রাজ্যখণ্ড পাবেন। আর ইটালিও লম্বার্ডি ভিনিসিয়া রাজ্যটি লাভ করবেন। ১৮৬৬

সালে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ হল তা যেমন দ্রুত তেমনি চূড়ান্ত। একে 'সাত সপ্তাহের যুদ্ধ' বলা হয়। **স্যাডোয়ার যুদ্ধে** অস্ট্রিয়ার পরাজয়ে জার্মানি নিষ্কণ্টক হল।

তবে বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার প্রতি উদারতা দেখান, কোন কঠোর সর্ত আরোপ করেন নি। বরং অস্ট্রিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন, ভবিষ্যতে উত্তর দিক অর্থাৎ জার্মানি থেকে নজর ফিরিয়ে পূর্ব দিকে তার অগ্রসর হওয়া উচিত। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে নরম আচরণের আর একটি বিশেষ কারণ বিসমার্ক জানতেন, তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুদ্ধে কিছু পেলেন না, প্রতিশোধ নিতে চাইবেন। ফ্রান্সের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে জার্মানির যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অস্ট্রিয়াকে হাতে রাখা চাই। এইবার তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধের জন্য বিসমার্ক তাঁর কূটনীতি প্রয়োগ করলেন। নেপোলিয়ন তাঁর দাবি জানিয়ে বিসমার্ককে যে খবর পাঠান সেই 'এমস্ টেলিগ্রাম'টি এমন ভাবে বদল করে সাজিয়ে বিসমার্ক প্রকাশ করলেন, যাতে মনে হয় নেপোলিয়ন দক্ষিণ জার্মানির দিকে আক্রমণে প্রস্তুত। দক্ষিণ জার্মানির চারটি রাজ্য বিসমার্কের মতবিরোধী ছিল। তারা জার্মান রাষ্ট্রে সংযুক্ত হতে সম্মত ছিল না। নেপোলিয়নের আক্রমণ ভয় দেখিয়ে বিসমার্ক তাদের স্বদলভুক্ত করলেন। এটি হল তাঁর শ্রেষ্ঠ কূটনৈতিক চাল। ১৮৭০ সালে **সেডানের যুদ্ধে** তৃতীয় নেপোলিয়ন শোচনীয় ভাবে হারলেন। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হল তাতে বিসমার্কের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানি এক রাষ্ট্রে পরিণত হল। প্রাশিয়ার রাজা হলেন নতুন সাম্রাজ্যের সম্রাট, বিসমার্ক হলেন তাঁর চান্সেলার।

ইটালির ও জার্মানির ঐক্য সাধনে যে সব বাধা ছিল তা নিয়ে গোড়ায় কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখন কাভুর ও বিসমার্কের কার্যনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে দু একটি কথা বলি। কাভুরের পরিকল্পনা ছিল, পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়া ইটালির বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলিকে ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত করবে এবং শেষে একটি অখণ্ড ইটালি রাজ্যের সঙ্গে আপনার অস্তিত্ব মিলিয়ে দেবে। বিসমার্ক চেয়েছিলেন জার্মানিকে প্রাশিয়ার মধ্যে টেনে আনতে হবে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রাশিয়ার প্রাধান্য থাকবে এবং প্রাশিয়াই জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত হবে। যাই হোক, কাভুর যেমন নবীন ইটালির স্রষ্টা, বিসমার্ক তেমনি জার্মান জাতি ও রাষ্ট্রের নির্মাতা।

আব্রাহাম লিঙ্কন : (আমেরিকার গৃহযুদ্ধ)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে **স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে** সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু ক্রীতদাস নিগ্রোদের কোন অধিকার ছিল না। তারা ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য হত, মানুষ বলে নয়। প্রথমে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশের মধ্যে ম্যাসাচুসেট্‌স্ ছাড়া আর সকল রাজ্যেই ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। কৃষিকাজের জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানী করা হত। এই প্রথা একটি ঘৃণ্য সামাজিক ব্যাধি বলে এর উচ্ছেদ প্রয়োজন, এই মনোভাব জেগে ওঠে। ১৭৮৭ সালে উত্তর ও পশ্চিম আমেরিকায় এক আইনের সাহায্যে দাস-ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ক্রীতদাস প্রথা লুপ্ত হল না, কারণ নিগ্রো দাসদের সন্তানরা আইনত জন্মসূত্রে ক্রীতদাস রূপেই গণ্য হত। উত্তরাঞ্চলে শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস

শ্রমিকের কোন চাহিদা ছিল না, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে তুলা ও তামাকের চাষ বাড়তে থাকায় সেখানে এই প্রথা রহিত করার জন্য কোনও সাড়া জাগল না। নিগ্রো দাসদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, তাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার এবং পীড়ন চলত। তাতে য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক সহৃদয় মানব প্রেমিক ব্যথিত হন। তাঁদের আন্তরিক চেষ্টাতেই দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়।

উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে প্রথম শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে। হ্যারিয়েট বীচার স্টো নামে এক আমেরিকান লেখিকা তাঁর বিখ্যাত **'টম কাকার কুটীর'** উপাখ্যানে দক্ষিণ ক্রীতদাসদের দুঃসহ কঠোর জীবনের এক মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করেন। ক্রীতদাসদের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হবার কোনও অধিকারই ছিল না, মনিবরা তাদের ঘটি বাটির মত কেনা বেচা করত। দক্ষিণাঞ্চলে দাসত্ব প্রথার সমর্থকরা বলত, নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা উচ্চশ্রেণীর মানুষের অধীনে থাকবে, এ ত ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়। সব মানুষ সমান হতে পারে না, এই যুক্তি একেবারেই অসার। আসল কথা এই যে, দাসত্ব প্রথা লোপ পেলে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির বিস্তার আর্থিক ক্ষতি হত। আগেই বলেছি উত্তরাঞ্চল শিল্পপ্রধান ছিল। সেখানে স্বাধীন শ্রমিকের (Free Labour) চাহিদা ছিল, আর দক্ষিণাঞ্চল ছিল দাসপ্রথার পক্ষপাতী। ক্রমে দেখা গেল যে পশ্চিম দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে দাসত্ব প্রথা নিয়ে মতান্তর তীব্র হয়ে উঠছে। পশ্চিমের নতুন রাষ্ট্রগুলিতে দাসপ্রথা থাকবে কি না তাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ১৮২০ সালে **'মিসৌরী মীমাংসা'** দ্বারা বলা হল যে মিসৌরীতে দাসপ্রথা থাকবে কিন্তু তার উত্তরের রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথার প্রচলন করা যাবে না। এই আপসে মূল সমস্যার সমাধান হয় নি। ১৮৫০ সালে **'ক্লে' মীমাংসা** ১৮৫৪ সালে **'কানসাস, নেব্রাসকা অ্যাক্ট,'** ১৮৫৭ সালে 'ড্রেড স্কট' ইত্যাদি চুক্তিগুলি এই প্রশ্ন-মীমাংসার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। এই দাসপ্রথা নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের দুই অঞ্চলে তীব্র মতবিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হল।

১৮৬০ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন রিপাবলিকান দলের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন। দক্ষিণাঞ্চলের ধারণা হল যে লিঙ্কন এখন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ করবেন। সেই আশঙ্কায় দক্ষিণের রাষ্ট্র-গুলি যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে একটি নতুন রাষ্ট্রসংঘ গঠনের সঙ্কল্প করল। এই সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণের এগারোটি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে **'কনফেডারেট স্টেটস্'** নামে একটি পৃথক্ রাষ্ট্রসংঘ গঠন করল। জেফারসন ডেভিস এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন। রাজনৈতিক সংকট ঘনিয়ে ওঠায় লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে বেরিয়ে যাবার অধিকার অস্বীকার করে নতুন রাষ্ট্রসংঘকে অবৈধ বলে ঘোষণা করলেন। তখন অন্যান্য বাইশটি রাজ্য লিঙ্কনের নেতৃত্বে নবগঠিত রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। শুরু হল আমেরিকার ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধ।

আব্রাহাম লিঙ্কন বাস্তবিক উদারচিত্ত মানবপ্রেমিক এবং দাসত্বপ্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন যে 'যদি দাসত্বপ্রথা অন্যায় না হয় কোনও কিছুই

অন্যায় নয়। তাঁর নীতি ছিল এই রকম। যুক্তরাষ্ট্রে যে যে অঞ্চলে দাসত্বপ্রথা আগে থেকেই চলে আসছে, সেই সব জায়গায় জোর করে এই প্রথা বিলোপ করা হবে না। কিন্তু নতুন কোনও রাষ্ট্রে এই কুপ্রথা চালু করা যাবে না। তাঁর মনে এই আশা ছিল যে নিকট ভবিষ্যতে আমেরিকার এই নিন্দনীয় প্রথা লোপ পাবে।



আব্রাহাম্-লিঙ্কন

দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করলেও তিনি এই প্রশ্ন নিয়ে গৃহযুদ্ধ করতে চান নি। যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব তার ঐক্যবদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। এই ঐক্য রক্ষাই ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য ও আদর্শ। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে দাসগণের স্বাধীনতা নয়,যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যরক্ষার জন্যতিনি গৃহযুদ্ধে নেমেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মহৎ আদর্শঃ 'জনগণ কর্তৃক, জনগণের জন্য, জনগণের শাসন' (Government by the people, for the people, of the people)। ১৮৬১-৬৫ এই চার বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলে। বিদ্রোহী রাষ্ট্রসংঘের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র আরও শক্তিশালী ছিল। অর্থবলে, নৌবলে, লোকবলে ও শিল্পসম্পদে সব দিকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল বেশি। তবে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিরও দৃঢ়তা একতা ও বীরত্বের অভাব ছিল না। তাদের সেনাপতিদের মধ্যে **লী** ও **জ্যাকসনের** নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিকে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির প্রতিরোধ শক্তি ও মনোবল অক্ষুন্ন ছিল। রণনীতি ও রাজনীতিতে পারদর্শী লিঙ্কন বুঝলেন যে দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করা প্রয়োজন। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলির সমস্ত ক্রীতদাস স্বাধীন বলে গণ্য হবে। এই ঘোষণার ফলে দাক্ষিণাঞ্চলের বহু লক্ষ ক্রীতদাস স্বাধীন হয়ে গেল। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান হলে যুক্তরাষ্ট্র আবার ঐক্যবদ্ধ হল। এই ভ্রাতৃযুদ্ধের মধ্যে লিঙ্কন দক্ষিণের জনগণের প্রতি কোনও রকম বিদ্বেষ বা শত্রুতা দেখান নি। ১৮৬৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু গৃহযুদ্ধ শেষ হবার কয়েকদিন পরেই এক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টা ; মহানুভব দৃঢ়চেতা আব্রাহাম লিঙ্কন সেই যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষাকর্তা।

গৃহযুদ্ধের ফলাফল বিচার করলে দেখা যায়, ক্রীতদাস প্রথার অবসানই সবচেয়ে বড় সুফল। কিন্তু এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয় ও প্রচুর অর্থব্যয় হয়। দক্ষিণাঞ্চলের তুলার আবাদগুলির জায়গায় বড় বড় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে এবং সেখানে অর্থনৈতিক জীবনে এক বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। গৃহযুদ্ধে দাসত্বপ্রথার অবসান হলেও নিগ্রো সমস্যার সমাধান হয়নি। দক্ষিণের শ্বেতকায় অধিবাসীরা নিগ্রোদের রাজনৈতিক অধিকার অস্বীকার করে গুপ্ত সমিতি গঠন করে নিগ্রোদের উপর দারুণ অত্যাচার চালায়। গৃহযুদ্ধের অবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত

বৈষয়িক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ পৃথিবীর মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে স্বীকৃত হয়।

য়ুরোপে শিল্প বিপ্লব ঃ আধুনিক যুগের সভ্যতাকে শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা বলা যায়। ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের জন্ম আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। য়ুরোপে তার প্রসার আরম্ভ হতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। কারণ ফ্রান্স তখন রাষ্ট্র বিপ্লবে বিপর্যস্ত এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় রাষ্ট্র নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইংলণ্ড থেকে শিল্প বিপ্লব ফ্রান্সে বিস্তৃত হল, মোটামুটি ১৮৩৫ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে। নেপোলিয়ন অবশ্য ফ্রান্সে শাসন ও শৃংখলা ফিরিয়ে এনে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করেন কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় শিল্প-বিপ্লব সম্ভব হয় নি। লুই ফিলিপ-এর রাজত্বকালে (১৮৩০-১৮৪৮) ফ্রান্স বৈদেশিক যুদ্ধে জড়িত না হওয়ায় দেশে শিল্পের প্রসার হয়। কিন্তু লুই ফিলিপ অর্থনৈতিক সমস্যা, শ্রমিকদের দুর্দশা এবং বেকার প্রশ্নের কোনও সমাধান করতে পারেন নি। এই সময়ে **লুই ব্ল্যাঙ্ক** জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের দাবী তোলেন। ক্রমে ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক দলের (Socialists) উদ্ভব হয়। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর তৃতীয় নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসার হতে থাকে। জার্মানির ঐক্য সাধন সম্পূর্ণ হলে সেখানে শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। জার্মান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রাশিয়াই শিল্পক্ষেত্রে বেশি উন্নতি করেছিল। জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় এখন সেখানে খুব দ্রুতগতিতে শিল্পের উন্নতি হতে থাকে এবং জার্মানি য়ুরোপের বাইরে বাণিজ্য বিস্তারে প্রাধান্য লাভ করবার চেষ্টা করে—শিল্প বিপ্লবের যা অনিবার্য ফল। জার্মানিতে সেই শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় এবং সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব হয়। বিসমার্ক অবশ্য এই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করতে সচেষ্ট হন এবং একটি শ্রমিক কল্যাণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জার্মানিতে সমাজ উন্নয়নমূলক কয়েকটি আইন প্রবর্তন করেন। একে "রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রবাদ" বলা হয়। তার মূল নীতি হল, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রই যথোচিত বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ফ্রান্সের পর অন্যান্য রাজ্যেও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। তবে বেলজিয়ামে ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি দেখা দিয়েছিল।

পৃথিবীতে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব ঃ ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের একশ' বছরের ভিতর (১৭৫০-১৮৫০) সমগ্র য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লব ছড়িয়ে যায়। তার প্রভাব শুধু য়ুরোপেই আবদ্ধ ছিল না, সমগ্র পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। শিল্পের উন্নতি আর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার সমস্যা দেখা দিল। সেইজন্য অনুন্নত অথচ প্রাকৃতিক সম্পদশালী আফ্রিকা ও এসিয়ার দিকে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলির নজর পড়ল। য়ুরোপের বণিকরা কম দামে ঐসব অঞ্চল থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে নিজ দেশে চালান দিতে শুরু করল আর সেই মাল থেকে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করে আফ্রিকার ও এসিয়ার বিভিন্ন দেশে বিক্রী করে প্রচুর অর্থ লাভ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব দেশে রাজনৈতিক

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করল। তখন ঐ দুটি বিশাল মহাদেশের অসংখ্য মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে আর্থিক শোষণে পিষ্ট হতে লাগল।

ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন এদিকে আফ্রিকা আর ওদিকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠল। উনিশ শতকের শেষভাগে আফ্রিকার শ্বেতকায় জাতিদের প্রভুত্ব স্থাপিত হলে এক জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাঞ্চু সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন য়ুরোপের বণিকরা চীনদেশে ঢুকতে আরম্ভ করে। অল্পকালের মধ্যে চীনের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে চীনদেশ পাশ্চাত্ত্য জাতিদের অর্থনৈতিক শোষণের সুবর্ণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। যন্ত্র-সভ্যতা সৃষ্টির এই ফল।

জাপানে আমেরিকাই বাণিজ্য কর্তৃত্ব বিস্তারে সর্বপ্রথম উপস্থিত হন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের পর জাপানে যখন শিল্প বিপ্লব এবং বিস্ময়কর শিল্পোন্নতি হল তখন বিদেশীদের হস্তক্ষেপ দূর হল। পাশ্চাত্ত্য জগতের আদর্শে জাপান তখন্ সাম্রাজ্যবাদ নীতি অনুসরণ করে বিশ্বের এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সেই নীতির ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের ফল বিষময় হয়ে দেখা দিল। ভারতের নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হতে বসল। আঠারো শতকের প্রথমভাগে ভারতে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হত। বয়নশিল্পে ভারতের যথেষ্ট সুনাম ছিল পশ্চিম জগতে এবং এদেশে যে সব মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হত তাতে যথেষ্ট লাভ হত। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে এই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেল। যন্ত্রে চালিত ইংরেজদের বয়নশিল্পের সঙ্গে ভারতের তাঁতীরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারল না। পশ্চিমের উন্নত যন্ত্রশিল্প এবং ক্রমশঃ বেড়ে ওঠা পুঁজিবাদের চাপে ভারতের কুটীর শিল্পগুলি প্রায় বিলুপ্ত হল। অল্পকালের মধ্যেই ভারতের বাজারে ইংলণ্ডের কারখানায় তৈরি নানাবিধ কাপড় ও অন্যান্য জিনিসে ছেয়ে গেল। ভারতে যেসব শিল্প কারখানা হতে লাগল উনিশ ও বিশ শতকে সেগুলির মালিকানা ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজ বাণিজ্য কোম্পানিগুলির হাতে। এরা ভারতে টাকা খাটিয়ে যে মুনাফা পেত, তাতে ভারতীয়দের কোনও লাভ হত না। নানাবিধ কুটিরশিল্পে যে সব দক্ষ শিল্পী ও কারিগর কাজ করত, তারা বেকার হয়ে গেল। ভারতবর্ষ আবার কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হল এবং বিদেশী শাসকদের নির্মম আর্থিক শোষণে ভারতের জনসাধারণ দারিদ্র্য এবং অভাবে ডুবে রইল।

পৃথিবীর ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে দ্রুত শিল্পায়ন যেমন আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি রচনা করল, তেমনি অপরদিকে শ্রমিক সমস্যা ও আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়ে দিল বিভিন্ন দেশে। পুরানো ধনতন্ত্র গড়ে উঠেছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে। কিন্তু উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে যে নতুন ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ প্রসারিত হল, তাতে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক ক্রমে সংঘর্ষে পরিণত হল। তখন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার দরকার হয়। ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের

অন্যত্র ধীরে ধীরে '**ট্রেড ইউনিয়ন**' গড়ে ওঠে। শ্রমিকরা সোচ্চার হতে থাকে, ন্যায্য দাবি পেশ করে ও দাবি গ্রাহ্য না হলে ধর্মঘট পালন করে। ক্রমে ধর্মঘট করার বৈধ অধিকার স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্মানিতে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও প্রসার হয়। সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয় কারখানা স্থাপন, শ্রমিকদের কর্ম সংস্থান ও কাজ করার অধিকার, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, উৎপন্ন দ্রব্যের আয় শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় ব্যক্ত করতে থাকেন। এই নতুন সমাজ ব্যবস্থার তত্ত্বগুলি মৌলিক ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন মনীষী কার্ল মার্কস, ইংলণ্ড প্রবাসী জার্মান দার্শনিক। গভীর অধ্যয়ন এবং আরও গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে তিনি ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেল্স শ্রেণী-দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও পরিণতি দেখালেন। তিনিই বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা। পুঁজিপতি ও সর্বহারাদের মধ্যে সংঘর্ষে শ্রমিকবর্গের জয় সুনিশ্চিত ঘোষণা করে ১৮৪৮ সালে তিনি দুনিয়ার মজদুরকে ঐক্যবদ্ধ সংহত হতে আহ্বান জানান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'ডাস ক্যাপিট্যাল' (Das Kapital)।



কার্ল মার্কস

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রের প্রসার ও ঔপনিবেশিক নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে তার পদ্ধতি সম্পর্কে সুনিশ্চিত মন্তব্য করেন। ভারতবর্ষের ওপর শিল্প বিপ্লবের যে প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া হয় তা মোটেই দেশের অনুকূল নয়।

এক নজরে

* নেপোলিয়নের পতনের পর য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা য়ুরোপে শান্তি-প্রচেষ্টা, সেখানকার রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের জন্য অস্ট্রিয়ার সম্রাটের আমন্ত্রণে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে সমবেত হন। এই সম্মেলনকে ভিয়েনা সম্মেলন বা ভিয়েনা কংগ্রেস বলা হয়।
* ভিয়েনা সম্মেলনে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকেরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তাতে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। অবশেষে ভিয়েনা বৈঠকের প্রতিক্রিয়াপন্থী সিদ্ধান্ত গুলি একে একে পরিবর্তিত হলো, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের নীতি জয়যুক্ত হয়েছিল।
* ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবলিডর চেষ্টায় ইটালির স্বাধীন ও জাতীয় ঐক্য- ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্পন্ন হয়।
* বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি য়ুরোপের অন্যতম একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

* আমেরিকার দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। দাস প্রথাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে আব্রাহাম লিঙ্কন খুবই সাহসের পরিচয় দেওয়ায় আমেরিকার ঐক্য বিনষ্ট হয় নি।

* শিল্প বিপ্লব ইংলণ্ডে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে য়ুরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ইউরোপে এবং সারা পৃথিবীর জনজীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

* আধুনিক এবং বিজ্ঞান সম্মত সমাজতন্ত্রের জনক হলেন কার্ল-মার্কস। তিনি মানব সমাজকে মালিক শ্রেণী বা মূলধনী এবং শ্রমজীবী শ্রেণী এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি পৃথিবীর সব শ্রমিক কেই সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের কাজে লাগতে বলেছেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* অস্ট্রিয়ার রাজধানীর নাম কি? * অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে কারা কি জন্য মিলিত হয়েছিলেন? * মেটারনিক কে ছিলেন। * মেটারনিক-এর নীতি কি ছিল? * কনসার্ট অব য়ুরোপ কাকে বলে? * পবিত্র মৈত্রী কাকে বলে? এর মুখপাত্র কে ছিলেন? * কার্বোনারি কাকে বলে? * দ্বিতীয় ইমান্যুয়েল কে ছিলেন। * কাভুর কে ছিলেন? * ইটালির ঐক্য আন্দোলনে দু'জন নেতার নাম কর? * কোন বছর ইটালির ঐক্য সম্পূর্ণ হয়? * বিসমার্ক কে ছিলেন? তিনি কোন নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন? * সাত সপ্তাহের যুদ্ধ কাকে বলে? * মেডানের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? এই যুদ্ধে কার পরাজয় ঘটেছিল? * টমকাকার কুটীর গ্রন্থের লেখকের নাম কি? * আব্রাহাম লিঙ্কন কত খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিল? * কনফেডারেট স্টেট্স কিভাবে গঠিত হয়? এর রাষ্ট্রপতি কে নির্বাচিত হয়েছিলেন? * আমেরিকার ঐতিহাসিক গৃহযুদ্ধ কোন বছর শুরু হয়? কত দিন ধরে যুদ্ধ চলেছিল? * আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্রষ্টা কে? এবং রক্ষাকর্তাই বা কে? * কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ফরাসী বিপ্লবের ফলে কোন কোন আদর্শ ঊনিশ শতকে য়ুরোপকে প্রভাবিত করে? ঐ আদর্শ কোন কোন দেশগুলিতে প্রেরণা সঞ্চার করে? কোথায় তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়?

২। ভিয়েনা কংগ্রেস কখন বসে? সেখানে প্রধান প্রতিনিধি কারা ছিলেন?

৩। চতুঃশক্তি জোট-এর কি উদ্দেশ্য ছিল? ইংলণ্ড ঐ জোট কেন বর্জন করে?

৪। ভিয়েনা কংগ্রেসে মেটারনিকের নীতি ও পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৫। ১৮৩০ ও ১৮৪৮ সালে কোথায় বিপ্লব দেখা দেয়? তার ফলে কি পরিবর্তন হয়েছিল?
৬। ঐক্য-আন্দোলনের পূর্বে ইটালির রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৭। ইটালির ঐক্য সাধনে বিভিন্ন পন্থা ও মতগুলি কি ছিল?
৮। ম্যাৎসিনি ও কাভুরের কর্মপন্থায় পার্থক্য কি ছিল?
৯। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট সাফল্য লাভ করেছিল কি?
১০। স্যাডোয়া ও সেডানের যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?
১১। বিসমার্ক কয়টি যুদ্ধ করে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন? তাঁর মূল নীতি কি ছিল।
১২। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের আসল কারণ কি? ঐ সময় উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে কি পার্থক্য লক্ষ করা যায়?
১৩। আব্রাহাম লিঙ্কন কোন আদর্শ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?
১৪। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ আর যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যসংহতি রক্ষা এই দুটির মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে কর?
১৫। য়ুরোপে শিল্পবিপ্লব কোথায় কোথায় প্রসারিত হয়? তার ফল কি হয়েছিল?
১৬। য়ুরোপে দ্রুত শিল্পায়নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।
১৭। কার্ল মার্কস কে? কি তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত তিনি প্রচার করেন। শ্রেণী দ্বন্দ্ব কি কারণে অনিবার্য হয়?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ঊনবিংশ শতকে য়ুরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?
২। ভিয়েনা সম্মেলনের বৈধ অধিকার নীতি ব্যাখ্যা কর।
৩। মেটারনিক কে ছিলেন? মেটারনিক নীতি বলতে কি বোঝ? এই নীতি কি কার্যকর হয়েছিল?
৪। ভিয়েনা বন্দোবস্ত ইটালির জনগনের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল? এর ফল কি হয়েছিল?
৫। ইটালির ঐক্য-স্থাপনে ম্যাৎসিনির অবদান বর্ণনা কর।
৬। কাভুর কে ছিলেন? ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে কাভুরের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৭। ইটালির ঐক্য-সাধনে গ্যারিবল্ডির অবদান কি ছিল?
৮। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা উল্লেখ কর।
৯। শিল্পায়ন কাকে বলে? য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে কি ভাবে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল?

১০। মেহনতী মানুষের ওপর শিল্প-বিপ্লব-কি প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

১১। য়ুরোপে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম উদ্যোক্তা কে ছিলেন ? তাঁর মতাদর্শ কি ছিল।

১২। কার্ল-মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ সম্পর্কে কি জান ?

১৩। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখঃ (ক) সাত সপ্তাহের যুদ্ধঃ (খ) টম-কাকার কুটির (গ) কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।

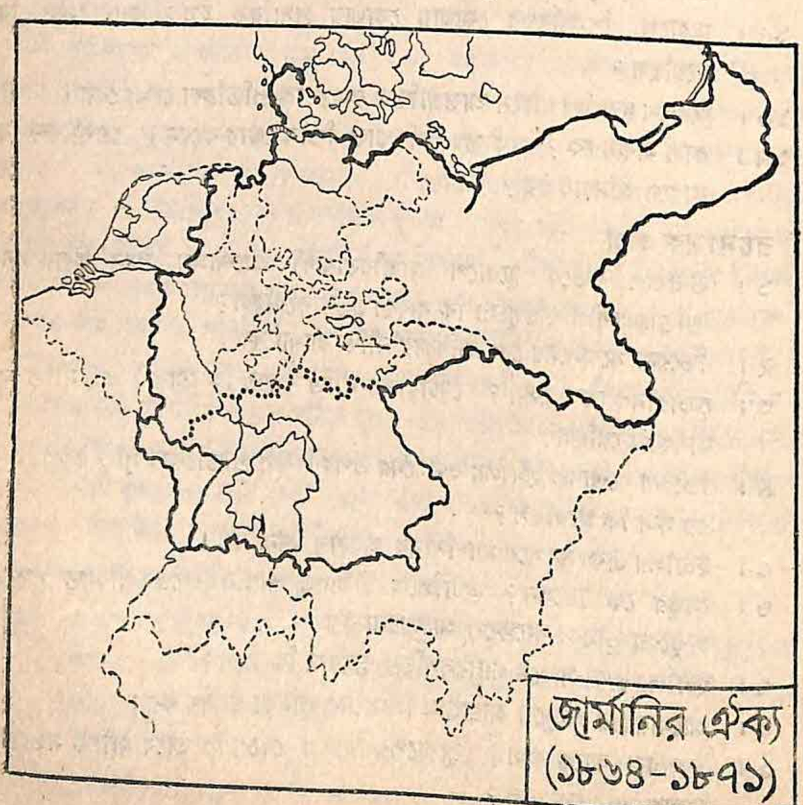
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

দুই এক কথায় উত্তর দাওঃ

(ক) ম্যাৎসিনি ইটালিতে যে গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন তাঁর নাম কি ? (খ) প্রুশিয়ার নতুন রাজা প্রথম উইলিয়ম কাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন ? (গ) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ? (ঘ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ কত দিন স্থায়ী হয়েছিল ? (ঙ) আব্রাহাম লিঙ্কনের কি ভাবে মৃত্যু হয়েছিল ? (চ) কার্ল মার্কস এর রচিত বিখ্যাত পুস্তকখানার নাম কি ?

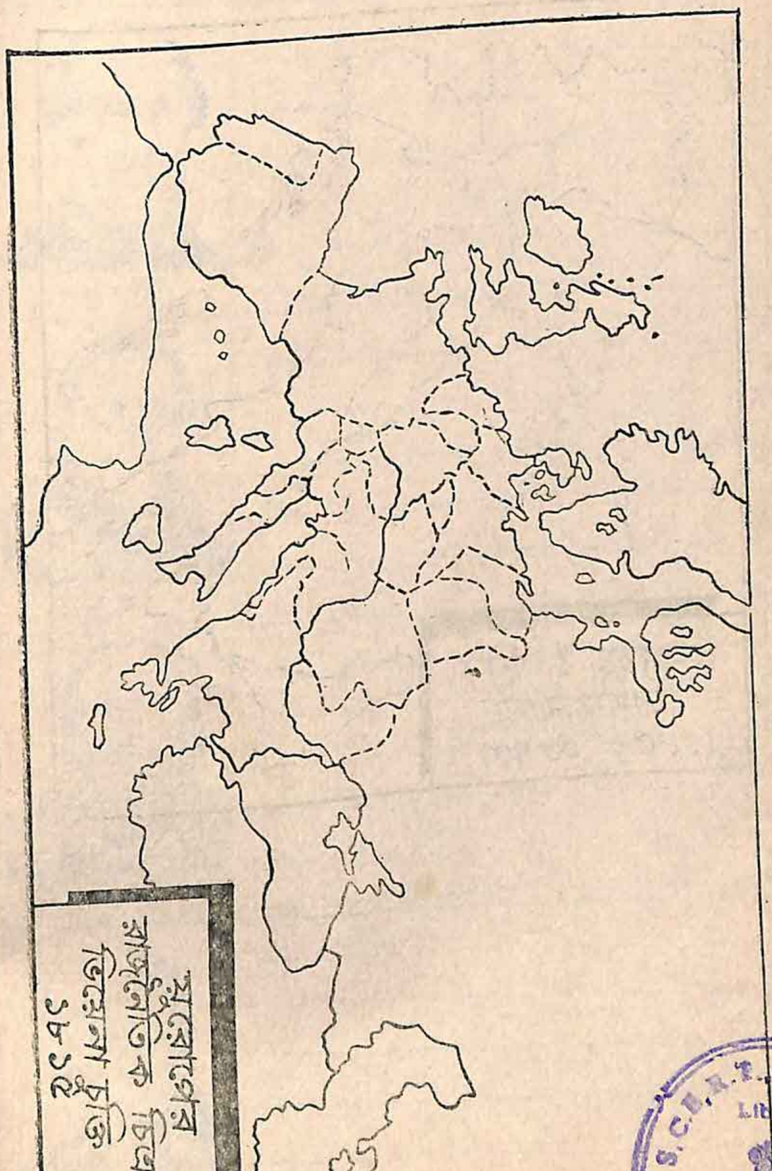
মানচিত্র অনুশীলন

[এক] জার্মানির রেখমান চিত্রে নিম্নলিখিতগুলি অবস্থান নির্দেশ কর ঃ প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, মিউনিক বার্লিন, হ্যানোভার, স্যাক্সনি, ড্রেসডেন



[দুই] প্রদত্ত রেখামানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান দেখাও :

স্পেন, সার্ডিনিয়া, নেপলস, অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্য, জার্মানি, প্যারিস, পোল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ভিয়েনা



[তিন] (খ) নিচের রেখা মানচিত্রে ঐক্যবদ্ধ ইটালির নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থান নির্দেশ কর: লম্বার্ডি, ভিনিসিয়, পারমা, পার্মা, মডেনা, তাসকেনি, রোম, সার্ডিনিয়া।



ব্যবহারিক অনুশীলনী

[এক] নিচের ছকের বাঁদিকের চিত্রগুলির পরিচয় ও এঁদের সম্বন্ধে ডানপাশের শূন্যস্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ



ম্যাৎসিনি



কাভুর



গ্যারিবল্ডী



বিসমার্ক

[দুই] নিচের চিত্রগুলি সম্পর্কে ডানপাশের শূন্যস্থানে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ


আব্রাহাম লিংকন


কার্ল মার্কস্


ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্



১০ চীন ও জাপান

চীন ঃ অতি প্রাচীন সুসভ্য চীন দেশ চিরদিন নির্লিপ্ত, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একমাত্র ভারতের সঙ্গে তার সংস্পর্শ ছিল সুদূর অতীত কাল থেকে। কিন্তু পশ্চিম জগতের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না। চীন বরাবরই বিদেশীদের সন্দেহ করত এবং তাদের সংস্রব এড়িয়ে চলত। কিন্তু চীন নিরাসক্ত হলেও য়ুরোপের কয়েকটি জাতি চীনের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জন্য। ষোল শতকে পোর্তুগীজ বণিকরা দক্ষিণ চীনে ম্যাকাও-তে উপস্থিত হয় তারপর সতেরো শতকে স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ ব্যবসায়ীরা এসে চীনের দক্ষিণ উপকূলে ক্যান্টন শহরে বসবাস আরম্ভ করে। আর স্থলপথে রাশিয়াও চীনের উত্তর ভাগে প্রভাব বিস্তার করে এবং বাণিজ্যের জন্য সুবিধা লাভে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। চীনদেশে সেই সময়ে মাঞ্চু বংশ রাজত্ব করত। বিদেশী বণিকদের প্রতি চীনের মনোভাব ছিল বিরূপ, তাই তাদের কাজকর্মে বাধা দেওয়াই ছিল চীনের নীতি।

এইভাবে চলল অনেক বছর। তারপর ইংরেজদের সঙ্গে চীনের বিরোধ বাধল দুটি কারণে ঃ ইংরেজ বণিকরা ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানি শুরু করে। তাতে চীন-দেশে আফিমের প্রচলন ও চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে চীন সরকার এই স্বাস্থ্যহানিকর মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে দেয়। তবুও ইংরেজরা গোপনে আফিমের কারবার চালাতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ চীনে ইংরেজরা এই ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এখন সেটি বন্ধ করা হল। লিন্ নামে চীন সরকারের এক কর্মচারী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কুড়ি হাজার আফিমের বাক্স পুড়িয়ে দেয়। আফিমের কারবার বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াতে **প্রথম অহিফেন যুদ্ধ** (১৮৩৯-৪২) আরম্ভ হল। চীন পরাস্ত হলে সন্ধি স্থাপিত হল (১৮৪২)। এই **নানকিং সন্ধির সর্ত** ছিল—ইংরেজরা হংকং দ্বীপটি পাবে আর কাণ্টন, ফুচাউ, নিংপো, আময় ও সাংহাই—পাঁচটি বন্দর য়ুরোপীয় বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (**ফ্রী বা ট্রিটি পোর্টস**)। ইংরেজদের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তিও সম্পন্ন হয়। এই থেকে প্রমাণ হয় যে চীন বিদেশী বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না, বরং পাশ্চাত্ত্য জাতিরাই চীনে ব্যবসা চালাবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। ইতিহাসে এই নানকিং সন্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ চীনের পরাজয়ের অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতি (ফ্রান্স, আমেরিকা) চীনে অনুপ্রবেশ করে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে এবং সেই সঙ্গে চীনে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে।

এর ফলে বিদেশী শক্তিবর্গের প্রতি চীনের মনোভাব ক্রমেই বিরূপ হতে থাকে।

তারা আরও সুবিধা লাভের আশায় সন্ধির সর্তগুলি পালটে নতুন অধিকার দাবি করে। তাই আবার বিরোধ দেখা দিল। ১৮৫৬ সালে সন্ধিসর্ত অমান্য করার অপরাধে এক ফরাসী পাদরিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং একটি ব্রিটিশ জাহাজ বে-আইনী বাণিজ্যে লিপ্ত বলে আটক করা হয়। তখন ১৮৫৬ সালে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এক সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করায় **দ্বিতীয় চীন** যুদ্ধ বাধল। এই সময়ে চীনে এক ব্যাপক বিদ্রোহ চলছিল, যার নাম **তাইপিং বিদ্রোহ**। সেই জন্য চীন সহজেই পরাস্ত হল এবং ১৮৬১ সালে **তিয়েনসিনের সন্ধি** করতে বাধ্য হল। এর ফলে ইংরেজ হংকং এর কাছে কোলুন বন্দর লাভ করল এবং এগারোটি বন্দর বিদেশী বাণিজ্যের স্বার্থে খুলে দেওয়া হল। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রচুর অর্থ পেল।

বিদেশী বণিকরা এখন থেকে আরও অধিকার বাড়িয়ে নিল। চীনের রাজধানী পিকিং-এ বিদেশী দূতাবাস স্থাপিত হল। আর এই সন্ধির ফলে স্থির হল যে এখন বিদেশী নাগরিক চীন দেশে কোন অপরাধ করলে তার বিচারের অধিকার চীনের কোনও আদালতের থাকবে না। অর্থাৎ চীনদেশের আইন বিদেশীদের ওপর প্রযোজ্য হবে না। এতে বিদেশীদের যে **'এক্সট্রা-টেরিটোরিয়ালরাইট'** (**অতি-রাষ্ট্রীক অধিকার**) দেওয়া হল, প্রকৃতপক্ষে তা চীনের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করে দিল। দুর্বল পরাজিত চীন এই অমর্যাদাকর সর্ত মেনে নিতে বাধ্য হল। এইবার চীনে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের প্রাধান্য বা সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ক্রমশঃ প্রকট হল। চীন তাদের যতই অপছন্দ করুক, বাধ্য হয়ে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য রাজ্যের সঙ্গে কতকগুলি সন্ধি করে এবং তাদের একটির পর একটি দাবি স্বীকার করে নিতে হল। এইভাবে চীন একে একে সাখালিন দ্বীপপুঞ্জ, লুচু দ্বীপ, আনাম, টংকিং এবং উত্তর ব্রহ্মের ওপর অধিকার হারাল। এর প্রধান কারণ, চীনের অসহায়তা ও দুর্বলতা। মাঞ্চু রাজবংশ এই সময়ে খুব হীনবল হয়ে যায়। দেশের ভিতরে তখন নানা সমস্যা। দীর্ঘ তেরো বছর ধরে **তাইপিং বিদ্রোহ** চলতে থাকে। তাতে বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। একদিকে আর্থিক সঙ্কট অপর দিকে অরাজকতা। শেষে নিজ স্বার্থেই পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ চীনের অনুরোধে বিদ্রোহ দমন করতে সাহায্য করে। কিন্তু চীনের দুরবস্থা কমল না। দেশে অনাবৃষ্টি বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায়। চীনের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দুর্দশার পূর্ণ সুযোগ নিল পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি চীনকে আফ্রিকার মতো ভাগাভাগি করে নিজেদের প্রভাব ও এলাকা বিস্তারের প্রতিযোগিতায় নামল। এর ফলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে চীনের অস্তিত্ব লোপ হতে পারত। কিন্তু ১৯০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Open Door Policy' ('উন্মুক্ত দ্বার নীতি')—যার মানে, সকলের সমান প্রবেশ অধিকার ঘোষণা করা হলে চীনের অখণ্ডতা কোনো মতে বজায় রইল।

সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন প্রকাশে চীনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা গেল (যেমন তাইপিং বিদ্রোহ), তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশী শক্তিদের প্রাধান্য বিস্তার এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চীনে এক জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় যাকে **'বক্সার বিদ্রোহ'** বলা হয়। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয়ে অনেকেই মাঞ্চু রাজবংশের দুর্বলতায় ক্রুদ্ধ

হয়। ১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহ তীব্র আকার ধারণ করে। এই বিদ্রোহ পাছে মাঞ্চু রাজত্ব উচ্ছেদ করে, সেই ভয়ে বিধবা সম্রাজ্ঞী সে-সি জাতীয় আন্দোলনকে বিদেশী দলনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। চীনারা বিদেশী পাদরিদের খুব সন্দেহ ও ঘৃণা করত। তাই তাদের ওপরেই মার-ধোর ও নির্যাতন শুরু হল। অনেক খ্রীস্টান নিহত হলেন, বিদেশী দূতাবাসগুলি বিধ্বস্ত হল। অবশেষে এক আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ থামানো গেল। মাঞ্চু শাসন টিঁকে রইল। এই বিদ্রোহে 'মুষ্টি যোদ্ধা (বক্সার) সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি বড় অংশ নিয়েছিল, তাই এর নাম 'বক্সার বিদ্রোহ'। বিদ্রোহ দমন হল কিন্তু এই সুযোগে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ও জার্মানি চীনের ওপর কয়েকটি সর্ত চাপিয়ে দিল, যথা ক্ষতিপূরণ, কতকগুলি বাড়তি বাণিজ্য অধিকার এবং বিদেশী সৈন্যদল মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা।


সান-ইয়াৎ সেন

ইতিমধ্যে ১৮৯৮ সালে চীনের শিক্ষিত সমাজ দেশের দুর্বলতা মোচনের জন্য চেয়েছিল শিক্ষা ও শাসন সংস্কার সম্রাট কোয়াং সু এই আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন এবং কিছু সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল দলের বিরোধিতায় তা কার্যকর হয় নি। মাত্র এক শো' দিন এই সংস্কার প্রচেষ্টা স্থায়ী হয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়াশীল দলের সাহায্যেই সম্রাজ্ঞী সে-সি ক্ষমতা দখল করেন।

আন্দোলন ও বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও জাতীয় চেতনার বিকাশ হল। রুশ-জাপানের যুদ্ধে (১৯০৫) জাপান জয়ী হলে চীনাদের উদ্দীপনা জাগল। তারা দাবি করল মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ এবং শাসনতন্ত্রের সংস্কার। প্রকৃতপক্ষে এই হল প্রথম জাতীয় আন্দোলন যার পুরোধা ছিলেন দক্ষিণ চীনের নেতা **সান-ইয়াৎ সেন**। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় জাতীয়তাবাদী দল (**কুয়োমিং তাং**) সশস্ত্র বিদ্রোহ করে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। ১৯১১ সালের এই বিপ্লবের কথা আবার চীন বিপ্লব অধ্যায়ে বলা হবে। ১৯১২ সালে মাঞ্চু সম্রাট সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য হলেন। সারা চীনদেশে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হল। সান-ইয়াৎ সেন হলেন তার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। অল্পকাল পরেই সেনাপতি ইয়ান-সি-কাইকে শাসনভার দিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি বিদেশীদের সহায়তায় নিজ ক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা করায় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ ক্ষুন্ন হল। ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে শাসন ক্ষমতা দখল করল কয়েকজন ওয়ার-লর্ড বা সমর নায়ক। চীনদেশে আবার অরাজকতা দেখা দিল। তখন সান-ইয়াৎ সেনকে নেতা রূপে দেশের গণ-আন্দোলনে আবার নামতে হল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে।

জাপানঃ চীনের মতো জাপান বহুকাল বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের

স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এসেছে। কিছুকাল পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের কাছে নতি স্বীকার করলেও উনিশ শতকের শেষ ভাগে জাপান নিজের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্য পশ্চিমী-সভ্যতার ধাঁচে নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে এবং ক্রমে এতই শক্তি অর্জন করে যে বিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমের সভ্য সমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলি তাকে সমকক্ষ হিসাবে গণ্য করে। জাপান দীর্ঘকাল মধ্যযুগের পরিবেশে বেষ্টিত ছিল। ক্ষমতার অধিকারী **'ডেমিওরা'**, তাদের অনুচরবর্গ **সামুরাই** এবং প্রকৃত শাসক **শোগানদের** কথা তোমরা মধ্যযুগের ইতিহাসে পড়ে এসেছ। **'মিকাডো'** নামে মাত্র সম্রাট সর্বোচ্চ সম্মানের পাত্র হয়ে সমাজ থেকে অনেক দূরে বাস করতেন। কিন্তু জাপানের এই রকম বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ব আধুনিক জগতে টিকল না, যখন উনিশ শতকের মাঝামাঝি পাশ্চাত্ত্য জাতিরা সুদূর প্রচ্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিস্তারের চেষ্টা করছিল। আফিমের যুদ্ধ যেমন চীনের ঘুম ভাঙ্গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি তেমনি জাপানের চৈতন্য দেয়।

আমেরিকা পশ্চিম দিকে রাজ্যসীমা বাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে অপর পারে প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হল। ১৮৫৩ সালে মার্কিন নৌবাহিনীর এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি **কমোডর পেরী** টোকিও উপসাগরে চারটি জাহাজ নিয়ে হাজির হলেন এবং জাপানী বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। এতদিন আমেরিকার কোনও জাহাজকেই জাপানের বন্দরে আশ্রয় দেওয়া হত না। পেরী জাপানের কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করলেন বন্দর আশ্রয় এবং জাহাজে মাল তোলার জন্য সুবিধা দিতে হবে। কোন উত্তর না পেয়ে পেরী চলে গেলেন এবং পরের বছর আটটি রণতরী এবং চার হাজার সৈন্য নিয়ে আবার হাজির হলেন। তখন জাপান ভয় পেয়ে তাঁর দাবি মেনে নিলে দুটি বন্দরে মার্কিন জাহাজ প্রবেশ করার অধিকার পেল। এর পর রাশিয়া ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে জাপানের ঐ রকম চুক্তি হল। খ্রীস্টান পাদরিদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা আর বিদেশী রাষ্ট্রগুলির 'অতি-রাষ্ট্রিক' অধিকার স্বীকৃত হল। চীনের মতো জাপান এখন পাশ্চাত্ত্য শক্তি প্রসারের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল।

এই অমর্যাদাকর চুক্তি স্বাক্ষরে জাপানীরা চটে গিয়ে শোগানকে পদচ্যুত করল এবং রাজ্যশাসনের ক্ষমতা সম্রাটের হাতে তুলে দিল। তারা বুঝল মধ্যযুগের সামন্ত প্রথায় রাজ্য চালনা আর চলবে না। বর্তমান যুগে পশ্চিম দেশগুলির মতো জাপানকে শিক্ষা-দীক্ষায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের শক্তি সম্পদ বৃদ্ধিতে ও যুদ্ধ বাহিনীর পুনর্গঠনে আধুনিক হতে হবে। নইলে তাদের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। অতএব পশ্চিম জগতের অনুকরণ করা ছাড়া উপায় নেই। এসব কারণে ১৮৬৭ সালে জাপানের যে রূপান্তর শুরু হল, তাকে 'জাপানী বিপ্লব' বলা হয়। এরই নাম **'মেইজি রেস্টোরেশন'** অর্থাৎ (মেইজি উপাধি নিয়ে) সম্রাটের ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এখন থেকে জাপানের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে বেড়ে গেল। ইংরাজীতে আবশ্যিক শিক্ষা, সৈন্য ও নৌবাহিনীর সংস্কার, শিল্পের উন্নয়ন, কলকারখানা নির্মাণ, ভূমিব্যবস্থার সংশোধন, রেল ও তার বিভাগের প্রবর্তন, দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও

পরিবহনের সুব্যবস্থা ইত্যাদি কর্মসূচী নিয়ে জাপান দৃঢ় পদে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হল। এখন থেকে জাপানে সামন্ত যুগের অবসান হল, শোগান ও সামুরাইদের একাধিপত্য শেষ হল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে। মিকাডো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। বাণিজ্য প্রসারের জন্য অনেক জাহাজ ও ডক নির্মিত হল। ব্যাঙ্ক, বণিকসভা' শেয়ারের বাজার খোলা হল বিদেশীদের সঙ্গে কারবারের জন্য। পঁচিশ বছরের মধ্যে এই ভাবে জাপান নিজেকে আধুনিক, শক্তিম্যন রাষ্ট্রে পরিণত করল। এই নব জাগরণে যাঁরা পথ দেখালেন তাঁদের মধ্যে **ইয়ামাগাতা, ইটো** প্রভৃতির নাম মনে রাখা উচিত। নৌ-শক্তিতে ইংলণ্ড, সেনাগঠনে জার্মান আর শিল্পবিজ্ঞানে উভয় দেশ ছিল জাপানের 'মডেল'। নানা ক্ষেত্রে উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির ফলে জাপানে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখা দিল। এখন তার প্রধান লক্ষ্য হল বিদেশীদের সঙ্গে পুরানো অসম চুক্তিগুলিকে নাকচ করা। এর জন্য দরকার হল বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি। জাপানের একটি প্রতিনিধি দল আলোচনার জন্য য়ুরোপে গিয়ে ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে। জাপান বুঝল বিশ্বের রাজনীতিতে শক্তিমানদেরই কদর। এই ধারণায় জাপান ফর্মোসা দ্বীপ ও লু-চো দ্বীপগুলি দখল করে আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ দেখাল।

চীন জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫): জাপানের সব চেয়ে নিকটের দেশ হল কোরিয়া। আগে কোরিয়া ছিল চীনের কিন্তু চীন সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পাশ্চাত্ত্য জাতিরা কোরিয়াতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। মানচিত্রে কোরিয়া উপ-দ্বীপটি দেখায় যেন জাপানের বুকে উদ্যত ছুরি। সেজন্য জাপানের ভয় ছিল পাছে কোরিয়া বিদেশীর হাতে চলে যায়, বিশেষ করে রাশিয়ার। কারণ ইতিমধ্যে রাশিয়া, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কোরিয়া পরহস্তগত হলে জাপানের সমূহ বিপদ। ১৮৭৬ সালে জাপান কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং চীনের সঙ্গে চুক্তি করে যে এক পক্ষ অপর পক্ষকে না জানিয়ে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠাতে পারবে না। ১৮৯৪ সালে কোরিয়ায় বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে চীন সৈন্য পাঠিয়ে চুক্তিভঙ্গ করল। তখন জাপান প্রস্তাব করে যে চীন ও জাপানের মিলিত কর্তৃত্বে কোরিয়ার শাসন-তন্ত্রের সংস্কার করা হবে। চীন এই প্রস্তাবে সম্মত হল না। **চীন জাপানের যুদ্ধ** বাধল। নয় মাস কাল যুদ্ধে নানা স্থানে জাপান জয়লাভ করতে থাকে। চীনের তখন বিপন্ন অবস্থা। রাজধানী পিকিং বিপদের মুখে, মাঞ্চুরিয়ায় আক্রমণ আর পোর্ট আর্থার জাপানের দখলে। সুতরাং বাধ্য হয়ে চীন **সিমোনোসেকির** সন্ধি (১৮৯৫) করল। এর ফলে জাপানের অধিকারে ফর্মোসা এবং আরও কয়েকটি দ্বীপ এসে গেল, ক্ষতি-পূরণের অর্থ ছাড়া চীনের কয়েকটি বন্দরে জাপান বাণিজ্যের অধিকার লাভ করল। জাপানের এই জয় তার নতুন শক্তির প্রমাণ এবং পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি সতর্কতার বাণী ঘোষণা করল। এইবার রাশিয়া বিজয়ী জাপানের গতিরোধ করতে প্রস্তুত হল। সুদূর প্রাচ্যে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় শঙ্কিত হয়ে রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সঙ্গে জোটবদ্ধ হল। এই ত্রি-শক্তি চাপ দিয়ে জাপানকে বাধ্য করল চীনের কাছে পোর্ট আর্থার ও লিয়াও তাং উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে। জাপানকে নতি স্বীকার করতে

হল। এরপর থেকে জাপান রাশিয়ার শত্রু হয়ে উঠল এবং ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হতে লাগল। এদিকে ইংলণ্ড রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি এবং এসিয়া মহাদেশে তার প্রতিপত্তি বিস্তারের নমুনা দেখে চিন্তিত হল। তাই জাপানের সঙ্গে ইংলণ্ড অচিরেই এক মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করল। ১৯০২ সালে **ইঙ্গ-জাপান** মৈত্র সম্পন্ন হলে পূর্ব দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ১৮৯৭ সালে রাশিয়া সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে রেলপথ নির্মাণ করে এবং পোর্ট আর্থার হস্তগত করে। বক্সার বিদ্রোহের সময়ে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে রাশিয়া সেখানে সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর পর মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্যদল সরিয়ে নিতে রাজি হয়েও রাশিয়া তা করল না। উপরন্তু স্বদেশ থেকে রেলপথে পোর্ট আর্থারের মধ্য দিয়ে কোরিয়াতে এক সৈন্য বাহিনী নিয়ে এল। তার প্রতিবাদে জাপান প্রস্তাব করল, রাশিয়াকে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে কোরিয়াতে জাপানের বিশেষ স্বার্থ আছে। এক কথায় কোরিয়া হচ্ছে জাপানী প্রভাবের এলাকা। তার বদলে জাপান মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার প্রাধান্য মেনে নেবে। দুটি প্রস্তাবই রাশিয়া যখন প্রত্যাখান করল, তখন জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল (১৯০৪)। **মুকদেন**-এর স্থল-যুদ্ধে, সুশিমা প্রণালীর নৌযুদ্ধে রাশিয়া চূড়ান্ত-ভাবে পরাস্ত হল। শেষকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেলট-এর মধ্যস্থতায় যুদ্ধ থামল এবং পোর্টস মাউথ সন্ধি স্বাক্ষরিত হল।

রুশ-জাপানের যুদ্ধ ও তার ফলাফল ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুদূর প্রাচ্যে নব জাগ্রত রাষ্ট্রশক্তির হাতে পশ্চিমের এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের এই শোচনীয় পরাজয়ে সারা এসিয়ায় মহা উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। রাশিয়াতে এই পরাজয় সম্রাটের শাসনতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের অনাস্থা এল এবং **১৯০৫ সালে এক রুশ বিপ্লবের** সৃষ্টি করল। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি এখন জাপানকে বলিষ্ঠ শক্তি রূপে গণ্য করল। জাপানের লাভ হল—পোর্ট আর্থার লিয়াও-তাং উপদ্বীপ এবং সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ। রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া থেকে হটে আসতে হল এবং কোরিয়াকে জাপানের প্রভাবভুক্ত বলে স্বীকার করা হল। জাপানের এই চমকপ্রদ জয়ে চীনে আলোড়ন জাগল জাতির উন্নয়ন ও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন আনার উদ্দেশে। ১৯১১ সালে চীনে বিপ্লবের পথ তৈরি হল। ওদিকে ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে জাপান উগ্র জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হল। য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে এখন সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হল জাপানের। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিল। তারপরে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দিল এবং চীনদেশে জার্মানির অধিকৃত সানটুং প্রদেশ ও কিয়াও-চাং অধিকার করল। চীনের তখন ঘোর দুরবস্থা। জাপান এই সুযোগে চীনের কাছে **'একুশ দফা দাবি'** পেশ করল। বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলে চীনের ওপর জাপানের দাবিগুলি সমর্থন করা হল।

একুশ দফা দাবির মধ্যে অনেকগুলি অসঙ্গত ছিল। তবু ১৯১৯ সালে প্যারিসে শান্তি বৈঠকে জাপানের দাবি গ্রাহ্য হল। জাপান বুঝেছিল যে য়ুরোপের শক্তিবর্গ

তাকে ঘাঁটাতে চাইবে না। সেজন্য পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদের প্রশ্রয়ে জাপান তাদের সমকক্ষ আসন পেল। জাপান কুড়ি বছরের (১৯১৯-৩৯) সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করে নিজেকে এমন দৃঢ় ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ করল যে কোনও শক্তি তার সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে পারলো না। ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। তার জন্য জাতি সংঘের (লীগ অব্ নেশনস) উদাসীনতা ও নিষ্ক্রিয়তা অনেকটা দায়ী।

এক নজরে

* অতি প্রাচীন কাল থেকে চীন দেশ বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। একমাত্র ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে তার সংস্পর্শ ছিল সুদূর অতীত কাল থেকে।
* চীনে আসবার সমুদ্রপথ আবিষ্কার হলে য়ুরোপীয় বণিকরা চীনে বাণিজ্য করবার জন্য যাতায়াত শুরু করল।
* চীনের সঙ্গে আফিং-এর ব্যবসায় ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল প্রধান।
* আফিং-এর কারবার বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করায় চীনের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম আফিং যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ থেকেই চীন দেশে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়।
* ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৫১ খ্রীঃ) চীনে তাইপিং বিদ্রোহ দেখা দেয়।
* ১৮৫৬ সালে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এক সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করায় দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ বাধে।
* বিদেশী শক্তির বিস্তার এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে চীনে এক জাতীয় আন্দোলন হয় তাকে বলে বক্সার বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের চাপে পড়ে চীন দেশীয় সরকার কিছু সংস্কার কাজে অগ্রণী হয়েছিল।
* ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে সান-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুরাজ বংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে চীন দেশে প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে।
* ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অবধি জাপানের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক। মিকাডো নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁর কোন শাসন ক্ষমতা ছিল না—শাসনের সব ক্ষমতা ছিল শোগানদের হাতে।
* ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে জাপানের সম্রাট শোগানদের প্রভাব মুক্ত হয়ে রাজ্য শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এই ঘটনা মেইজী পুনঃপ্রতিষ্ঠা নামে অভিহিত হয়।
* এরপর থেকে জাপান দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলে অবশেষে জাপান একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকরা কখন চীনে এসেছিল ?
* কি কি কারণে ইংরেজদের সঙ্গে চীনের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল ?
* কত খ্রীস্টাব্দে প্রথম অহিফেন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ?
* প্রথম অহিফেন যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়েছিল ?
* প্রথম অহিফেন যুদ্ধ সমাপ্তিতে কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ?
* দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে কাদের মধ্যে হয়েছিল ?
* দ্বিতীয় চীন যুদ্ধে কে পরাস্ত হয়ে কোন সন্ধি করেছিল ?
* অতিরাষ্ট্রিক অধিকার কাকে বলে ?
* তাইপিং বিদ্রোহ কতদিন ধরে চলেছিল ?
* Open door policy বা উন্মুক্ত দ্বার নীতি কারা কত খ্রীস্টাব্দে ঘোষণা করেছিল ?
* বক্সার বিদ্রোহ কত খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল ?
* চীনে প্রজাতন্ত্র কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ?
* মিকাডো কাকে বলে ?
* মেইজি রেস্টোরেশন কাকে বলে ?
* সিমোনোসেকির সন্ধি কবে কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?
* কত খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী স্বাক্ষরিত হয় ?
* কত খ্রীস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ?
* কত খ্রীস্টাব্দে জাপান কোরিয়া অধিকার করেছিল ?
* জাপান চীনের কাছে কত দফা দাবী পেশ করেছিল ?

সংক্ষিপ্ত রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ কোন সময় হয়েছিল ? এই যুদ্ধের কারণ কি ? প্রথম চীন যুদ্ধকে অহিফেন যুদ্ধ বলার কারণ কি ?
২। নানকিং সন্ধি কখন ও কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? সন্ধির সর্তগুলি কি ?
৩। তাইপিং বিদ্রোহ সম্পর্কে যা জান লেখ।
৪। দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধের কারণ ও তিয়েনসিনের সন্ধির সর্তগুলি কি ছিল ?
৫। চীন দেশে বক্সার বিদ্রোহ সম্পর্কে যা জান লেখ।
৬। কি ভাবে চীন দেশে মাঞ্চুরাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে ?
৭। জাপানে মেইজি রেস্টোরেশন বলতে কি বোঝ ?
৮। মেইজি শাসনের যুগে জাপানের উন্নতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৯। কোরিয়ার অধিকার নিয়ে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীস্টাব্দে চীন ও জাপানের মধ্যে সংঘর্ষের কাহিনী বর্ণনা কর।
১০। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জাপানের ভূমিকা আলোচনা কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রথম চীন যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
২। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ ও তিয়েনসিনের সন্ধির শর্তাবলী আলোচনা কর।
৩। চীনে বিদেশী শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৪। বক্সার বিদ্রোহ ও তার ফলাফল বর্ণনা কর।
৫। সান ইয়াৎ সেন ও ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের গণ-বিপ্লব সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৬। জাপানের পুরানো সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

[এক] **দুই এক কথায় উত্তর দাও :**

(ক) ১৮৫৩ সালে কোন বিদেশী জাপানে আসেন ?
(খ) ১৮৬৮ সালে জাপানে কি বিপ্লব হয় ?
(গ) মেইজি রেস্টোরেশন-এর শাসনতন্ত্রে কি পরিবর্তন হলো ?
(ঘ) জাপান কোন কোন স্থানে রাশিয়াকে পরাস্ত করে ?
(ঙ) ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী কখন সম্পন্ন হয় ?
(চ) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে জাপান চীনের কাছে কি দাবি পেশ করে ?

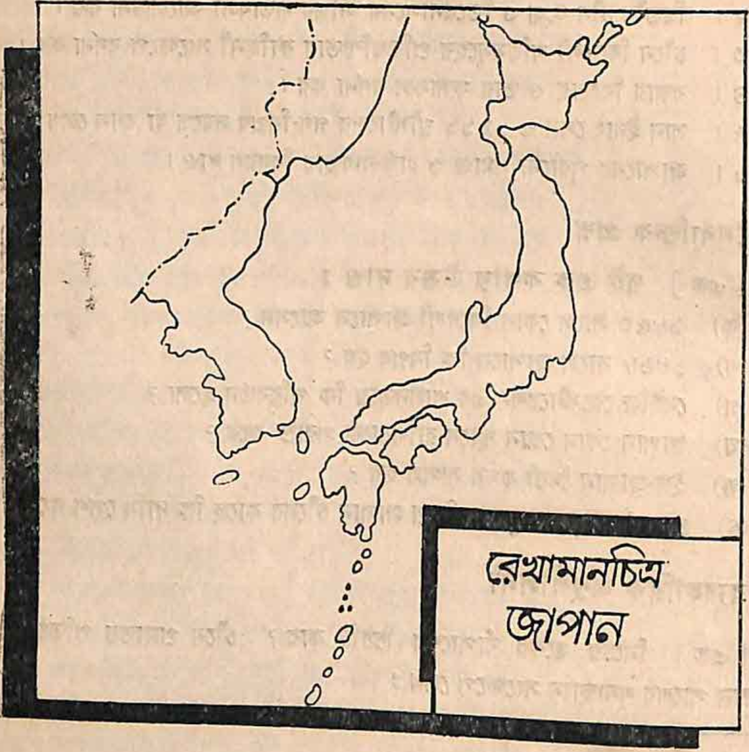
ব্যবহারিক অনুশীলনী

[এক] নিচের ছকের বাঁপাশের চিত্রটি কার ? চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এঁর অবদান পাশের শূন্যস্থানে সংক্ষেপে লেখ ঃ



সান-ইয়াৎ-সেন

[দুই] নিচের রেখামানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলির সঠিক অবস্থান নির্দেশ কর কিউসু, সিকোকু, হিরোশিমা, ওসাকা, ফুজিয়ামা, টোকিও হোনসু, হোকাইডো ।





১৮৫৮, ১লা নভেম্বর মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে বিলাতের পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল এবং 'ভারত শাসন আইন' মহারাণীর হাতে ভারতের দায়িত্ব তুলে দিল। ভারতের শেষ গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নামে পরিচিত হলেন। বিলাতে মন্ত্রিসভার একজন সদস্য 'ভারত-সচিব' পদে নিযুক্ত হলেন এবং পরামর্শের জন্য পনেরো জন সদস্য নিয়ে একটি পরিষদ (ইণ্ডিয়া কাউন্সিল) গঠিত হল। ঘোষণাপত্রে বলা হল যে ভারতবাসীদের রীতি-নীতি ও ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে যোগ্যতার বিচারেই তাদের রাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। কোম্পানির আমলে দেশীয় রাজাদের সঙ্গে যে সব সন্ধির সর্ত ও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলি এখন মেনে নেওয়া হল। 'স্বত্বলোপ নীতি' উঠে গেল এবং দত্তক পুত্র সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবে, জানানো হল। 'সিপাহী বিদ্রোহের' মূল কারণ অসন্তোষ দূর করাই ছিল ঘোষণাপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সাম্রাজ্য প্রসার ঃ ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে সীমান্ত-পারে অবস্থিত রাজ্যগুলিকে আয়ত্তে আনাই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল নীতি। লর্ড লরেন্স যুদ্ধ-বিরোধী হলেও ভুটানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে বাঙলার উত্তর সীমান্তে দুয়ার অঞ্চল ইংরেজদের অধিকারে আনলেন। এদিকে আফগানিস্তানের আমীর শের আলি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী করলেন আর কাবুলে ইংরেজ দূত রাখতে অস্বীকার করলেন। তখন বড় লাট লিটন দেখলেন, কাবুলের উপর রুশ প্রভাব খুব বিপজ্জনক। আফগানিস্তানকে 'পার্টিশন করে একটা ভাগ ইংরেজ অধিকার রাখলে ব্রিটিশ ভারতের সীমানা বেড়ে যাবে। এই হল লিটনের 'ফরওয়ার্ড পলিসি' বা 'অগ্রসর নীতি'। ইংরেজরা কোয়েটা দখল করলে **গণ্ডামকের সন্ধি** হয়। লিটনের 'অগ্রসর নীতি' ত্যাগ করে রিপন গণ্ডামকের সন্ধি নাকচ করলেন। তবুও গণ্ডগোল থামল না। কান্দাহার এলাকায় সেনাপতি রবার্টস জয়ী হলে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। আমীর আবদর রহমান ইংরেজদের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গণ্য হলেন। ভারত আফগান সম্পর্কে এক রকম সমাধান হল। রুশ-আফগান ব্রিটিশ সীমান্তটি নির্দিষ্ট করে ১৮৮৫ সালে স্যার মার্টিমার ডুরাণ্ড আপোস নিষ্পত্তি করে একটি সীমারেখা টানলেন **'ডুরাণ্ড লাইন'** বলে ইহা ইতিহাসে পরিচিত।

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ ঃ ১৮৫২ সালে রেঙ্গুনে ইংরেজদের মর্যাদা আর বাণিজ্যের স্বার্থ দুটিই ক্ষুন্ন হচ্ছে দেখে ডালহৌসি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে নিম্ন মার্তাবান ও

বেসিন শহর অধিকার করে ডালহৌসি প্রোম ও পেগু প্রদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করলেন। ফলে সাসউইন নদীর তীর পর্যন্ত ইংরেজ অধিকার বিস্তৃত হল এবং বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

লর্ড ডাফারিনের সময়ে ১৮৮৫ সালে বর্মার রাজা থিবোর সঙ্গে আবার সংঘর্ষ বাধল। ১৮৮৬ সালে এক ঘোষণাপত্রে উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলে গোটা বর্মা দেশ এখন ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। চীন সরকার তখন ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকার করে নেয় এবং বর্মা ও চীনের মধ্যে সীমান্ত রেখা টানার ব্যবস্থা করা হয়।

নেপাল ও ভূটানের মাঝখানের ছোট রাজ্য সিকিম শক্তিশালী ইংরেজদের হাতে দার্জিলিং জেলা ও শিলিগুড়ি পর্যন্ত এলাকাটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সিকিমের সীমান্ত থেকেই তিব্বত আরম্ভ। এই জন্য ব্রিটিশ সিকিমকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে তিব্বত চীনের কর্তৃত্বে আসে। ১৮৮৫-৮৬ সালে চীনের সম্মতি আদায় করে ব্রিটিশ সরকার রাজধানী লাসায় একটি বাণিজ্য মিশন বা দৌত্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু তিব্বতীরা প্রবল বাধা দেয়। ১৮৯০ সালে একটি যৌথ কমিশন সিকিম-তিব্বতের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেয়।

এর কিছুকাল পরে তিব্বতীরা চীনের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য চাইল আর রাষ্ট্র-প্রধান দালাই লামাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করে রাশিয়ার সাহায্যের পক্ষপাতী হলেন। তখন লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে **কর্নেল ইয়ং হাসব্যাণ্ডের** নেতৃত্বে তিব্বতে একটি মিশন বা দৌত্য পাঠান। তিব্বতীরা মিশনকে সীমান্তের ভিতর আসতে দিল না। উভয় পক্ষের সংঘর্ষের পর একটি চুক্তি পত্রে ব্রিটিশ সরকার বাণিজ্য বিষয়ে কয়েকটি অধিকার পায় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ অনেক অর্থ আদায় করে নেয়।

শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলন ঃ ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ঐ কলেজে ভারতীয় ও বিদেশী দুই দলই একে অন্যের ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হলেন। বেণ্টিঙ্কের সময়ই সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংরাজী শিক্ষার সমর্থন করলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাইয়ে এলফিন্‌ষ্টোন কলেজ স্থাপন এই সময়কার ঘটনা। এ বিষয়ে রাজা রামমোহনের প্রচেষ্টা সর্বাগ্রে স্মরণীয়। ১৮৩৫ সালের পর থেকে **ইংরেজী** শিক্ষার জন্য কিছু অর্থব্যয় করা হত। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ভারতীয়দের জন্য অজস্র পরিশ্রম করেন এবং নিজের স্কুলে অনেক সময়ে মাইনে ছাড়াই ভাল ছাত্রদের ভর্তি করতেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল ছাড়াও শেরবোর্ন সাহেবেরও একটি স্কুল ছিল। ক্রমে দেশী স্কুলগুলো বাড়তে লাগল। বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করলেন যে ভবিষ্যতে চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিত প্রার্থীদেরই অন্যদের চেয়ে বেশি সুবিধা দেওয়া হবে। তাতে ইংরাজী স্কুলগুলি আরও উৎসাহ পেল। **স্যার চার্লস উডের** ১৮৫৪ সালের বিখ্যাত **এডুকেশন ডেস্‌প্যাচের** ভিত্তিতে ১৮৫৭ সালের আইনে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা—এই তিনটি প্রেসিডেন্সিতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য ব্রিটিশ

সরকার প্রথমে সরকারী ভাবে কোনও চেষ্টা করেনি। মিশনারীদের উদ্যোগেই স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভ হয়। চার্চ মিশনারী সোসাইটির পরিচালনায় স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। বীটন (বেথুন) কলেজ স্থাপন ও বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সহযোগিতা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে স্মরণীয় ঘটনা। তা ছাড়া এই কাজে ব্রাহ্মসমাজ ছিল অগ্রণী। আর্যসমাজ, ভারত সেবক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যমও প্রশংসনীয়। সমাজ ও ধর্মের ব্যাপারে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন। হিন্দু সমাজে বহুদিনের যে সব কু-প্রথা ছিল তা ইংরেজ সরকার এখন দূর করার চেষ্টা করলেন, আইন দ্বারা শিশু হত্যা নিবারণ করা হল। তারপর ধর্মের নামে পূর্বে নারীকে স্বামীর চিতায় প্রাণ দিতে হত। ১৮২৯ সালে বেণ্টিঙ্ক আইন পাশ করে সতীদাহ প্রথা রোধ করেন। ঠগীদমন বেণ্টিঙ্কের আমলের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। উইলিয়ম শ্লীম্যান ও অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের সাহায্যে সরকার ঠগীদের দমন করেন। আর একটি হল দাসত্ব প্রথা নিবারক আইন। এ ছাড়া বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে। শেষকালে বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। উড়িশার খণ্ডজাতি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে নরবলি দিত, তাও বন্ধ করা হয়।

রাজা রামমোহন রায় সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের কাজে অগ্রণী ছিলেন। যুগের উপযোগী পরিবর্তনগুলি তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজেরও বড় ভূমিকা ছিল। ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে থিওসফিকাল সোসাইটি, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলিও বড় অংশ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের দান চিরস্মরণীয়, তাঁর যুক্তিবাদী তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ভারতের বড় সামাজিক সমস্যা জাতিভেদ ও হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলি দৃপ্ত ভাষায় উচ্চারিত হয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন: সূচনা: আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইটালি ও জার্মানির ঐক্য, সংগ্রাম, স্বাধীন জাপানের উত্থান, প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ভারতের জাতীয়তাবোধের বিকাশে সাহায্য করে। উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতে যে নবজীবনের স্পন্দন দেখা যায়, সেটি ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে সম্ভব হয়েছিল।

নব্য যুগ: ইংরেজী ভাষা য়ুরোপীয় ইতিহাস সাহিত্য পাঠ করে শিক্ষিত ভারতীয়রা 'ন্যাশনালিজম ও ডিমোক্রেসি' অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হন এবং শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় য়ুরোপ থেকে পাওয়া জাতীয়তাবাদের ধারণায় পুষ্ট হয়ে এ বিষয়ে অগ্রণী হন এবং উচ্চ পদ অধিকারের দাবি জানান, সভা-সংবাদপত্রে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করেন।

স্বাদেশিকতার বীজের প্রথম নমুনা হল **'হিন্দুমেলা'**। সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত হল জাতীয় আন্দোলন। গঠিত হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা **'ভারত সভা'** ১৮৭৬ সালে। কয়েক বছর পর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের **জাতীয়**

কংগ্রেস। শাসনকাজে অংশ গ্রহণের দাবি নিয়ে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলন জাগে এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৫৩)। জাতীয় ভাব ও আন্দোলনের প্রসারে দেশীয় পত্র-পত্রিকাগুলির দান অসামান্য। গত শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইংরেজী ও দেশী ভাষায় প্রকাশিত কাগজগুলির মধ্যে বাঙলার 'সংবাদ প্রভাকর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' বোম্বাই-এর 'মারহাট্টা', 'কেশরী', মাদ্রাজের 'হিন্দু', ; এবং পরবর্তীকালে লাহোরের 'ট্রিবিউন' প্রভৃতি কাগজগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার করার জন্য বলিষ্ঠ জনমত গঠন করতে এইসব সংবাদপত্র যথেষ্ট সহায়তা করে। **দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত** প্রভৃতি ইতিহাস লেখকরা এই নির্মম শোষণের পরিণতি দেখিয়ে ভারতের চরম অর্থসঙ্কটের বিবরণ লিখে গেছেন। তাই অনেক দিনের জমে ওঠা অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার উন্মেষে কবি সাহিত্যিকদের ছিল বড় ভূমিকা। রমেশচন্দ্র দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অবদান আছে। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও বাণী বিপ্লবী স্বদেশী যুগে সকল দেশপ্রেমিকদের মনে অভূতপূর্ব উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। মারাঠী লেখক দেশমুখ, সখারাম দেউস্কর, ঐতিহাসিক রানাডে, তামিল লেখক সুব্রহ্মণ্য ভারতী, হিন্দী লেখক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিদের নানাবিধ রচনা ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। উনিশ শতকে **স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর এসিয়াটিক সোসাইটি** প্রতিষ্ঠার পর ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয় এবং প্রাচীন কালের অনেক লুপ্ত কীর্তির পুনরুদ্ধার হতে থাকে। তখন দেশের বিস্মৃত ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাণীর ঘোষণাপত্র কিছু কাল শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক বজায় রইল। নীলকর সাহেবদের জুলুম ও অত্যাচারের তিক্ত স্মৃতি ছিল অনেক দিন। তাই কয়েক বছর পরেই রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। নীল চাষীদের বিদ্রোহ গণবিক্ষোভের প্রথম নমুনা। নীলবিদ্রোহকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পুরোপুরি সমর্থন করে কাগজে সভাসমিতিতে বড় রকম আন্দোলন চালান।

স্বাদেশিকতার উদ্বোধন ঃ ঃ হিন্দুমেলা ঃ বিজাতীয়পনার বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ বসু হিন্দু সভ্যতার ঐশ্বর্য তুলে ধরে 'হিন্দু মেলা'র উদ্বোধন করলেন ১৮৬৭ সালে। নবগোপাল মিত্র রাজনারায়ণের উৎসাহে ও প্রেরণায় এই মেলার আয়োজন করেন। জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশী ব্যায়াম ও শরীর চর্চা এবং দেশী শিল্পের প্রদর্শনী খুলে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত স্বদেশী ভাব ও কার্যপ্রণালী উৎসাহিত করাই 'হিন্দু মেলা'র মূল লক্ষ্য ছিল।

'ভারতসভা' নামে নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও বিভিন্ন

ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, এই ছিল সংগঠনের লক্ষ্য। এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ চারদিকে বক্তৃতা ও স্বাদেশিকতা প্রচার করতেন। সংঘবদ্ধ আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে ভারতের নেতারা একটি '**সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সন্মেলনে**' মিলিত হলেন, ১৮৮৩, ডিসেম্বর মাসে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা আসেন। ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন বসে। '**ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস**' প্রতিষ্ঠা হলে সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে মিশে গেল। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ঐ কংগ্রেসই ভারতে যাবতীয় আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়।


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসঃ ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা এবং প্রথম বিশ বছর রাজনৈতিক আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্ব গ্রহণ করে। দুজন ইংরেজের সমর্থনে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, অ্যালান হিউম ও স্বয়ং বড়লাট ডাফরিন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম লক্ষ্য ছিল, জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য ভারতবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয়দের দাবি ও অভিযোগগুলি সরকারের কাছে পেশ করা। কিন্তু ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে মতান্তর দেখা দিতে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হল—একটি **মডারেট** বা মধ্যপন্থী, অপরটি **এক্সট্রিমিস্ট** বা চরমপন্থী নামে পরিচিত।


বালগঙ্গাধর তিলক

'মধ্যপন্থী'দের নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরোজ শা মেহতা ও গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে। ওদিকে উগ্র ও 'চরমপন্থী'দের প্রবক্তা ছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বাঙলার বিপিনচন্দ্র পাল। এই তিনজনকে একত্র করে বলা হত '**লাল-বাল-পাল**'। বাঙলাদেশে চরমপন্থী মতবাদের প্রচারে আর যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং বরোদা প্রবাসী অরবিন্দ ঘোষ। চরমপন্থীরা নিজের দেশে নিজেদের শাসন করার অধিকার সজোরে ব্যক্ত করেন এবং অন্দোলন করতে থাকেন।

বঙ্গ ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনঃ স্বদেশী আন্দোলনের নতুন পর্ব শুরু হয়

বঙ্গ-ভঙ্গের সময় থেকে। প্রশাসনের সুবিধা বলে সরকারী সিদ্ধান্তে সাব্যস্ত হল ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হবে। বড়লাট কার্জনের আসল মতলব ছিল, বঙ্গবিচ্ছেদ করে জাতীয়তা ও স্বদেশী আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করা। মুসলমানদের বোঝানো হল, এই নতুন শাসনব্যবস্থায় তাদের অনেক সুবিধা ও উন্নতি হবে। পূর্ব-বাঙলা ও আসামের নতুন রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে কার্জন সাহেব সরকারের পক্ষে টেনে আনলেন। বাঙলা ও মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবের স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিদের প্রবল প্রতিরোধ ব্রিটিশ সরকারকে নাজেহাল করল, যার ফলে তাদের বাধ্য হয়ে ১৯১১ সালে দুই বাঙলাকে আবার যুক্ত করতে হল। 'স্বদেশী' অর্থাৎ স্বদেশী জিনিস ব্যবহার এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন এই দুটি ছিল আন্দোলনের মুখ্য আদর্শ ও কার্যনীতি। নতুন প্রেরণায় ভারতের নানা জায়গায় দেশী কল-কারখানা গড়ে উঠল। বাঙলায় তখন কোথাও জনসভা ও মিছিল, কোথাও বিলাতী জিনিস পোড়ানো, রাস্তাঘাটে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। একা **রবীন্দ্রনাথই** অজস্র স্বদেশী গান রচনা করেন এবং বঙ্গভঙ্গের চরম বেদনাকে তিনি সঙ্গীত ও ভাষণে ব্যক্ত করে দেশবাসীদের মনে অপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন। যেদিন আইন চালু হল (বাংলা ১৩২২, ৩০ আশ্বিন), সেদিন তার প্রতিবাদে বাঙালী জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও মিলন ঐক্যের চিহ্ন হিসাবে 'রাখীবন্ধন' উদযাপিত হল, ঘরে ঘরে 'অরন্ধন' পালন করা হল।

জাতীয় শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠান ঃ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বুঝেছিলেন যে ভাবপ্রবণ হয়ে কাজ করতে গেলে তার ফল স্থায়ী হয় না। গ্রামের উন্নতি, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাবলম্বন, এইগুলিই হল প্রকৃত স্বদেশসেবার ভিত্তি। শুধু 'বয়কট' করে ও বিদেশী পণ্য জ্বালিয়ে দিলে দেশ স্বাধীন হবে না। শিক্ষা হবে খাঁটি দেশী অর্থাৎ মাতৃভাষায় জ্ঞান অর্জন। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি বজায় রেখে স্বদেশী ভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় **'ডন সোসাইটি'** প্রতিষ্ঠা করেন। তারই ভিত্তিতে **জাতীয় শিক্ষা পরিষদ** স্থাপিত হয়। বাঙলার যুব শক্তিকে প্রেরণা দিয়েছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মিলন চেষ্টা তেমন সফল হতে পারেনি। বোধ হয় স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে 'হিন্দু' ভাবটি ক্রমেই ফুটে উঠেছিল। অরবিন্দের **ভবানী পূজা**, মহারাষ্ট্রের লোকমান্য তিলকের **শিবাজী উৎসব** দেখে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে কুণ্ঠা ও সংশয় জেগেছিল। তবু মুসলিমদের মধ্যেও জাতীয় আন্দোলনে নেমে নির্যাতন স্বীকার করেছিলেন আবুল হোসেন, আবদুল রসুল ও লিয়াকত হোসেন।

চরমপন্থী ও বিপ্লবী আন্দোলন ঃ ১৯১৫ সালে **হোম রুল লীগ** প্রতিষ্ঠা করে তিলক ঘোষণা করলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দাস হিসাবে আমরা থাকতে চাই না। অরবিন্দ বললেন, গণশক্তি গঠন করতে হলে চাই বিপ্লবী কর্মসূচী। লাজপৎ রায়ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে পাঞ্জাবে কৃষক-আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়।

এদিকে স্পষ্ট বোঝা গেল নরম ও গরম দুই পক্ষের সংঘর্ষ ঘনিয়ে এসেছে। ১৯০৭

সালে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে দলাদলি তীব্র হয়ে দেখা দিল, স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা আর বয়কট নীতি নিয়ে। **উগ্রদল** কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, নরমপন্থীরা কোনো মতে কংগ্রেসে তাঁদের কর্তৃত্ব বজায় রাখলেন। চরমপন্থীরা শক্তিশালী হচ্ছে দেখে ১৯০৯ সালে ইংরেজ সরকার এক দফা শাসন সংস্কার দিয়ে বিক্ষুব্ধ দেশকে কিছু শান্ত করতে চেষ্টা করেন। এরই নাম **মলি মিণ্টো সংস্কার**। কিন্তু এই নতুন আইনে দেশবাসীর প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়, কারণ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে সরকার পাকাপাকি ভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও পক্ষপাত-নীতি আমদানী করলেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে বিপ্লবীদের আবির্ভাব হয়। এই বিপ্লবীদের হাতিয়ার ছিল দেশী বোমা, পিস্তল ও পরে বাইরে থেকে আমদানি আগ্নেয়াস্ত্র। আইন মেনে আন্দোলনে আর তাঁদের আস্থা ছিল না ; তাই সশস্ত্র বিপ্লব করে ভারতকে বিদেশীর শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করতে তাঁরা কঠিন সঙ্কল্প নিলেন। অরবিন্দ ঘোষ ও তার ভাই বারীন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বিপ্লবীরা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। **'যুগান্তর অনুশালনী'** প্রভৃতি বিপ্লবী গুপ্ত দল ও সমিতি গঠিত হল। শহীদ হলেন **ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী**। **আলিপুর বোমার মামলায়** আসামীদের বিচার ও দণ্ড হল। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে ইতিমধ্যে অনেক গুপ্ত সমিতি বিপ্লবী আন্দোলন চালাতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে গোড়ার দিকে বোম্বাই-এর ফাড়কে, চাপেকার নামে দুই ভাই, পরের দিকে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী বীর সাভারকারের নাম স্মরণীয়। ১৯০৯ সাল থেকে বিপ্লবীদের তৎপরতা বাড়তে থাকে এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা থেকে বোঝা গেল বিপ্লবীরা রীতিমত সংঘবদ্ধ হচ্ছে। ফ্রান্স জার্মানি ও ইংলণ্ডে ভারতীয় বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে ওঠে। বিদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বসু' তারকনাথ দাস, স্বনামধন্য বাঘা যতীন ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, পিংলে ও কর্তার সিং প্রভৃতি দুঃসাহসী কর্মীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরকারের দমন-নীতি কিছু কাল বিপ্লবীদের থামিয়ে রাখল বটে, কিন্তু কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগল। কারণ, কংগ্রেস তখন পর্যন্ত জনসাধারণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারছে না। জনমত তৈরি না হলে জাতীয় আন্দোলন জোরদার হবে না এবং তার জন্য চাই কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ।

এক নজরে

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হলে মহারানীর ঘোষণাপত্র অনুসারে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার সরাসরিভাবে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে।
* ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নামে পরিচিত হলেন।
* শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করেছিল।
* লর্ড বেণ্টিঙ্ক-এর সময় থেকেই ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয়। ১৮৫৭ সালের আইনে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা এই তিন প্রেসিডেন্সিতে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।
* পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় জনসমাজে এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই ভারতবাসীর স্বদেশানুরাগ ও ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগ্রত করেছিল।
* ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়।
* ভারতের মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান ভূমিকা ছিল।
* ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের মধ্যে মতান্তর দেখা দেওয়ায় দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়—একটি মধ্যপন্থী ও অপরটি চরমপন্থী।
* মধ্যপন্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজ শ্যা মেহতা ও গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। অপরপক্ষে উগ্র বা চরমপন্থীদের খ্যাতিমান নেতা ছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, বাঙলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল।
* ১৯০৯ সালে সরকারী সিদ্ধান্তে বাংলা দ্বি-খণ্ডিত হলো। বঙ্গবিচ্ছেদ আন্দোলনের সময় থেকে বিপ্লবীদের আবির্ভাব হয়।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কত খ্রীষ্টাব্দের কোন তারিখে বিলাতের পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল?
* ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল কে? ভারতশাসন আইনে তিনি কি নামে পরিচিত হলেন?

* ভারত সচিব পদে কে নিযুক্ত হলেন ?
* ইণ্ডিয়া কাউন্সিল কিভাবে গঠিত হয়েছিল ?
* মহারানীর ঘোষণাপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল ?
* লর্ড লিটনের ফরওয়ার্ড পলিসি কি ছিল ?
* ডুরাণ্ড লাইন কাকে বলে ?
* কত খ্রীষ্টাব্দে কে দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ?
* লর্ড কার্জন কত খ্রীষ্টাব্দে কার নেতৃত্বে তিব্বতে মিশন পাঠিয়েছিলেন ?
* কত খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ?
* সতীদাহ প্রথা কে রোধ করেছিলেন ?
* হিন্দুমেলার কাকে বলে ? এর উদ্বোধক কে ?
* ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কবে গঠিত হয় ? এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?
* জাতীয় কংগ্রেস কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?
* এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে ?
* লাল-বাল-পাল বলতে কাদের বুঝায় ?
* ডন সোসাইটি কে প্রতিষ্ঠা করেন ? এর উদ্দেশ্য কি ছিল ?
* মলি-মিণ্টো সংস্কার কি ?
* বিদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন কয়েকজন বিপ্লবীর নাম বল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। মহারানীর ঘোষণাপত্র অনুসারে কে প্রথম ভারতের ভাইসরয় নিযুক্ত হন ? মহারানীর ঘোষণাপত্রে কি কি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ?

২। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল নীতি কি ছিল ? এই নীতি কিভাবে কার্যকরী করা হয়েছিল ?

৩। অগ্রসর নীতি কার আমলে ও কোথায় প্রয়োগ করা হয় ? তার কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৪। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ কে ঘোষণা করেছিলেন ? এই যুদ্ধ ঘোষণার কারণ ও ফলাফল কি হয়েছিল ?

৫। ঊনবিংশ শতকে সমাজ সংস্কারে ও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ছিলেন ?

৬। জাতীয় আন্দোলনে সংবাদপত্রগুলির ও লেখকদের কি ভূমিকা ছিল ?

৭। স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৮। কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে দুটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়েছিল ? এই বিরোধী দল দুটির নাম কি ? এদের মধ্যে মতান্তরের কারণ কি দুই দলের উল্লেখযোগ্য নেতাদের নাম বল।

৯। বাঙলায় ও ভারতে বিপ্লববাদের জন্ম ও প্রসার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১০। ভারতের বাইরে কোথায় কোথায় বিপ্লবীরা তৎপর হয়েছিলেন। কয়েকজন বিপ্লবীর নাম বল।

১১। জাতীয় শিক্ষার নীতি কি ছিল? জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সম্পর্কে যা জান লেখ।

১২। এঁরা কে, কি জন্য খ্যাত?—রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক, অশ্বিনীকুমার দত্ত।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। মহারানী ভিক্টোরিয়া কখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন? মহারানীর ঘোষণাপত্র কাকে বলে?

২। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৩। ইংরেজ সরকার কেন আফগানিস্তান জয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল?

৪। ব্রহ্মদেশ অধিকার করতে ইংরেজ সরকার উদ্যোগী হয়েছিল কেন?

৫। ভারতে জাতীয়তা বোধের উন্মেষ কি ভাবে ঘটে?

৬। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়? প্রথমদিকে কংগ্রেসের লক্ষ্য কি ছিল?

৭। ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থী আন্দোলনের কর্মধারা বিবৃত কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

দুই এককথায় উত্তর দাও:

(ক) আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যে সীমারেখা কে নির্দিষ্ট করেন?

(খ) ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কার্জন কার নেতৃত্বে তিব্বতে একটি মিশন পাঠিয়েছিলেন?

(গ) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ঘ) ভারতসভা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

(ঙ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে?

(চ) কোন দু'জন ইংরেজের সমর্থনে ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

ব্যবহারিক অনুশীলন

[এক] নিচের ছকের চিত্রগুলি দেখ এবং ভারতের মুক্তি আন্দোলনে এদের অবদান সংক্ষেপে লেখ।

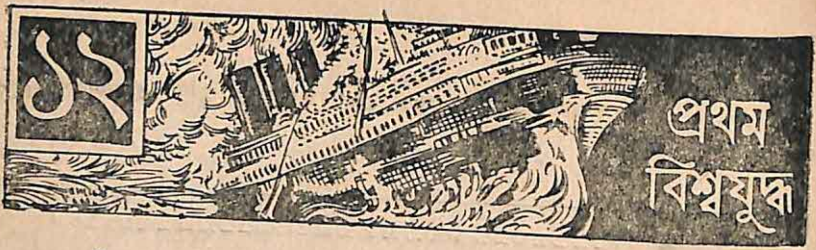

রবীন্দ্রনাথ


বিপিন পাল


অরবিন্দ ঘোষ


সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী


বালগঙ্গাধর তিলক



প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ ঃ ঃ সূচনা ঃ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি এবং তাই থেকে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। এরই মাঝখানে য়ুরোপে দুটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ নবম অধ্যায়ে করা হয়েছে। মধ্য য়ুরোপে ইটালি ও জার্মানির ঐক্য সাধন ও মুক্তি-আন্দোলন অনেক দিন ধরে চলে। একক স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তাদের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০-৭১ সালে। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য সাধন সম্পূর্ণ হয়। আধুনিক জার্মানির স্রষ্টা বিসমার্ক রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। শক্তি খাটিয়ে যুদ্ধ করে দেশকে তিনি স্বাধীন ও সবল করেন। কূটনীতিতেও বিসমার্ক সমান পারদর্শী ছিলেন। য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি বজায় রাখা এবং ফ্রান্সকে কোণঠাসা করার জন্য তিনি জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালিকে নিয়ে 'ত্রিশক্তি জোট' (Triple Alliance) সৃষ্টি করেন। এরই পালটা জবাবে ফ্রান্স প্রথমে রাশিয়া, পরে ইংলণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে। তখন রাশিয়া, ইংলণ্ড, ও ফ্রান্স মিলিত হল 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' বন্ধনে (ট্রিপল আঁতাত)। কিন্তু বিসমার্কের এই বৈদেশিক নীতিতে ত্রুটি ছিল। সে জন্য তাঁর তৈরি জোটের বিরুদ্ধে আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রজোট গড়ে উঠল। তাছাড়া, বিসমার্ক-রচিত জার্মান রাষ্ট্র উগ্র জাতীয়তার বশে অচিরেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হয়। সেই সূত্রে পৃথিবীর বাজার দখল এবং কয়েক জায়গায় বাণিজ্য-অধিকার ও স্বার্থ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ বেধে ওঠে। বিসমার্কের পতনের পর উদ্ধতস্বভাব নতুন সম্রাট কাইজার উইলিয়ম ইংলণ্ডের সঙ্গে রেষারেষি চালিয়ে যান, সেনাবাহিনী ও নৌশক্তি বাড়াতে থাকেন।

জাতীয়তাবাদ তীব্র হয়ে উঠলে অপর জাতিকে খর্ব করে নিজ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, ইটালি ও রাশিয়া—এই দেশগুলিতে জাতীয়তা বোধ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার ওপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও আর্থিক সমৃদ্ধি বিশেষ করে জার্মানির ঈর্ষা উদ্রেক করে। শিল্প-বিপ্লবের ফলে যখন জার্মানির দ্রুত শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক উন্নতি ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, তখন ইংরেজ ও ফরাসীদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। বিশ্ব-বাণিজ্য আর পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা, এটিই হল মহাযুদ্ধের মূল কারণ। অন্যান্য কারণও ছিল। কিন্তু এ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক শক্তিপরীক্ষা। সারাজেভো শহরে সার্বিয়ার এক ব্যক্তির হাতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ডের হত্যা হল উপলক্ষ মাত্র। প্রথমে যুদ্ধ বাধল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার। অস্ট্রিয়ার পিছনে দাঁড়াল জার্মানি স্বজাতি সার্বিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এল রাশিয়া ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে জড়িত থাকায় ফ্রান্স ও ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চলল যুদ্ধ, পুরো চার বছর, পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। মধ্য য়ুরোপের দুই রাষ্ট্র জার্মানি ও অস্ট্রিয়া ওদিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও প্রাচ্য থেকে জাপান মিলিত ভাবে যুদ্ধ করতে থাকে। অবশেষে মিত্রপক্ষের জয়লাভ হল; যুদ্ধের শেষ দিকে আমেরিকা তার সৈন্য ও উপকরণ নিয়ে যোগ দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে প্যারিস শহরে শান্তির বৈঠক বসে এবং **ভার্সাই** (Versailles) সন্ধি সাক্ষরিত হয় বিজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে।

যুদ্ধের গুরুত্ব ও প্রভাব ঃ এ যুদ্ধ কত ব্যাপক ও বিস্তৃত, তার ফলাফল কত গুরুত্বপূর্ণ বলছি। রণক্ষেত্র ছিল আটটি, য়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা, তিনটি মহাদেশে উভয়পক্ষের যুদ্ধ চলেছিল। অজস্র অর্থব্যয় ও লোকক্ষয়ের পর যুদ্ধ থামল। পৃথিবীতে হতাহতের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। নতুন ধরনের উড়ো জাহাজ ডুবো জাহাজ বিধ্বংসী কামান ও নিদারুণ বিষ-বাষ্পের ব্যবহারে ভয়াবহ তাণ্ডব লীলা চলে। পৃথিবীর সর্বত্রই মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রথম জনসংখ্যা হ্রাস, দেশগুলির অপূরণীয় ক্ষতি ও খাদ্যাভাব হল। তারপর এল ভীষণ আর্থিক মন্দা। প্রত্যক্ষ ফলভোগী হল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, যে দুটি দেশ প্রধান রণক্ষেত্র ছিল। তারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হলেও তার শিল্প ও বাণিজ্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল, তাই থেকে সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারে নি। মধ্য য়ুরোপ খাদ্যাভাব, অর্থাভাব ও ব্যাধির প্রকাশ দেখা দেয়। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যটি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গেল সম্রাট শাসকদল গদি ছেড়ে চলে যান। ওদিকে রাশিয়ায় রুশ বিপ্লবের ফলে 'জার তন্ত্রের অবসান হল এবং বলশেভিক দলের নেতৃত্বে এক নতুন সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। আর তুরস্ক সাম্রাজ্যের মধ্যে অবশিষ্ট দেশগুলি পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়ে গেল। মধ্য প্রাচ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ফলে সেখানে যে ভাগাভাগি হল তাতে রাজনৈতিক সমস্যা জটিল হয়ে উঠল। ইহুদি ও মুসলিম রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ চলতে লাগল যার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। অর্থনীতির দিক থেকে য়ুরোপের চরম দুর্দশা হল; যুদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয়, ঋণবৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্যের অবনতির ফলে করের বোঝা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সবচেয়ে ক্ষতি হল যুব সমাজের। বড় বড় আদর্শের বুলিতে ভ্রান্ত হয়ে তারা যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই সফল হয়নি। এই হতাশা ও ব্যর্থতার সুর তৎকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত ঃ এদিকে ভারতকে উপনিবেশ হিসাবে ব্রিটিশরাজকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে অনেক সাহায্য করতে হয়। প্রতিদানে ইংরেজদের যুদ্ধ মন্ত্রকে ভারতীয় সভ্য আসন পান এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু রাওলাট বিল এবং তার পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে আরম্ভ হল।

ইংলণ্ড যখন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, সেই সুযোগে বাঙলায় ও ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হয়ে নানা ভাবে টাকা কড়ি ও বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনবার উদ্যোগ করলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টায় যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁদের কথা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) আফগানিস্তান, এমন কি জার্মানি, রাশিয়া ও আমেরিকায় বিপ্লবীদের কাজ ছড়িয়ে পড়ে। বিদেশী সরকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সাহায্য লাভের জন্য যাঁরা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বীরেন চ্যাটার্জী, অবনী মুখার্জী, ভূপেন্দ্র দত্ত, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (এম, এন, রায়), হরদয়াল, মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতউল্লা এবং আরও অনেকে।

গান্ধীজি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করা সমর্থন করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তিনি দেখলেন ও বুঝলেন যে ইংরেজ শাসকদের মৌখিক প্রতিশ্রুতির কোন দাম নেই। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার (১৯১৯) চালু হলেও ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের প্রত্যাশা ব্যর্থ হল। তবে এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় যুব সমাজ সামরিক শিক্ষা লাভ করে এবং ভারতীয় পণ্টন বিদেশের যুদ্ধাঙ্গনে বীরত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করে। তবে যুদ্ধের খরচ বাবদ অনেক আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় ভারতীয়দের মনে এবং মুসলমানদের মধ্যেও অসন্তোষ জমতে থাকে। ১৯১৬ সালে **লক্ষ্ণৌচুক্তির** ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হল ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এবং সেই সূত্রে তাঁর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হল, তার কথা ষোড়শ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বলা হয়েছে।

একনজরে

* শিল্পবিপ্লবের মধ্যদিয়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতি এবং তা থেকে হয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।
* ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ১৯১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে এই যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।
* ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস শহরে শান্তি বৈঠক বসে এবং ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় মিত্রশক্তি ও কেন্দ্রীয় শক্তির মধ্যে। মিত্রশক্তির মধ্যে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ। আর কেন্দ্রীয় শক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ।

* এই যুদ্ধ ছিল যেমন ব্যাপক' তেমনি বিস্তৃত-রণক্ষেত্র ছিল আটটি। য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—তিনটি মহাদেশে উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলেছিল।
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। ভারতেয় স্বাধীনতা আন্দোলন গান্ধীর নেতৃত্বে নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে বেধেছিল ? এই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল ?
* কোন কোন দেশ ত্রিশক্তি মৈত্রী বন্ধনে মিলিত হয়েছিল ?
* অস্ট্রিয়ার যুবরাজ কে ছিলেন ? তিনি কি ভাবে নিহত হয়েছিলেন ?
* অস্টিয়ার যুবরাজ হত্যার ফল কি হয়েছিল ?
* কোন্ সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে ?
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কি কি নতুন অস্ত্র ব্যবহার করা হয় ?
* লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফল কি হয়েছিল ?
* আমেরিকা কোন পক্ষকে সাহায্য দেয় ?
* ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব কবে ঘটেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত খ্রীস্টাব্দে বাধে ? এই যুদ্ধ কিভাবে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল ?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নিরূপণ কর।

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারত ও বহির্ভারতে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দাও।

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

যেটি ঠিক তার উপর '√' চিহ্ন দাও।

(ক) সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড ঘটে—১৭১৪, ১৮১৪, ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে।

(খ) ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়—অস্টিয়ার সঙ্গে, জাপানের সঙ্গে, জার্মানীর সঙ্গে।

(গ) ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হয় ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে, ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে।



রুশ বিপ্লব :: ভূমিকা : বিখ্যাত **কমিউনিস্ট ইস্তাহারের** (Communists Manifesto) প্রণেতা কার্ল মার্কস ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, পৃথিবীতে একদিন সর্বাহারাদের একনায়কতন্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও তার পরিবর্তনই ইতিহাসের প্রকৃতি ও গতি নিয়ন্ত্রিত করে। মার্কসের এই দার্শনিক চিন্তা ও ব্যাখ্যা থেকে সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম ও তাঁরই মতবাদ ও বিশ্লেষণের উপর সাম্যবাদ (কমিউনিজম) গড়ে ওঠে। মার্কসের মতে, যাদের হাতে সম্পদ ও স্বত্বাধিকার আর যারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, মানব সমাজের এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের (Class War) মাধ্যমে শাসনক্ষমতা, আসবে সর্বহারাদের হাতে। তার আর একটি সিদ্ধান্ত হল শ্রমের ফলেই উৎপাদন হয় অতএব উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর সকল অধিকার শুধু শ্রমিকদের। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক। তিনি বলতেন সর্বহারাদের জাতি বা দেশ নাই। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা মজদুর, কর্মী। মার্কসের মৃত্যুর পর (১৮৮৩) বিভিন্ন দেশে গঠিত সাম্যবাদী দলগুলি জোরদার হয়। ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের আরও দুটি অধিবেশন হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সেখানে মিলিত হন। **'কমিণ্টার্ন'** (Comintern) নামে পরিচিত এই আন্তর্জাতিক সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিপ্লব (World Revolution) ঘটিয়ে দুনিয়ার শ্রমিকদের শৃঙ্খলমুক্তি ও তাদের সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। রুশ-বিপ্লবের ভূমিকা হিসাবে এই কথাগুলি বলা হল।

বিপ্লবের ইতিহাস : রাশিয়ার সম্রাট 'জার'-এর শাসনতন্ত্র ছিল কঠোর ও স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু দমননীতি অর্থাৎ নির্যাতন ও নির্বাসন সত্ত্বেও বিপ্লবী ভাবের প্রসার ও কার্যকলাপ বন্ধ করা যায় নি। জনগণের বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়তে থাকে, বিশেষ করে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয়ের পর। সমাজতন্ত্রীবাদী বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে, গণ-আন্দোলনও জোরদার হয়। এই অবস্থায় ১৯০৫ সালে যে বিপ্লব হয়, তা সফল হল না, প্রস্তুতি ও পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল। সৎসামান্য শাসন সংস্কারে নিয়মতন্ত্রী উদারপন্থীদের তুষ্ট করার চেষ্টা হল। কিন্তু রাশিয়ার ভূমিদাস (serf) নিঃস্বত্ব কৃষক প্রথা আর শহরের শ্রমিকরা চরম দুর্দশায় পড়ে রইল। 'জার'-তন্ত্র অব্যাহত ভাবে শাসন করতে থাকল। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে সাম্রাজ্যবাদীরা শক্তিশালী হয়ে উঠে

এবং দেশের নানা জায়গায় **সোভিয়েট** গঠন করে। এই 'সোভিয়েট' (শ্রমিকদের ছোট ছোট সমিতি) নিয়ন্ত্রণ করত সমাজতন্ত্রী দলগুলি। বিশ শতকের গোড়ায় এই 'সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট' পার্টির দলভেদ হওয়াতে এক দলের নাম হল **বলশেভিক** (সংখ্যাগরিষ্ঠ)। এই পার্টির কর্মীরা পুরোপুরি মার্কসের মতবাদ গ্রহণ করে এবং একমাত্র বিপ্লবের দ্বারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস স্থাপন করে। অপর দল **মেনশেভিক** (সংখ্যালঘু) নামে পরিচিত হল, এর সদস্যরা নিয়মবর্তী পদ্ধতিতে ক্রমশঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল।

মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষে রাশিয়া ক্রমাগত হারছিল। 'জার' শাসিত দেশের অক্ষমতা, দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং তার ওপর দারুণ খাদ্যাভাব এবং সেনাবাহিনীর পরাজয় বিপ্লবকে এগিয়ে আনল। ১৯১৭, মার্চ মাসে শুরু হল রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্ব। ধর্মঘটী শ্রমিক ও বিদ্রোহী সৈন্যদল রাজধানী পেট্রোগাদে ও অন্যান্য জায়গায় সোভিয়েট কেন্দ্র স্থাপন করে। একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী জারের পতন হল। কিন্তু নতুন সরকারের নিয়মতান্ত্রিক শাসন-সংস্কার ও অন্যান্য ব্যবস্থা বিপ্লবীরা অনুমোদন করল না। কেরেন্স্কির নেতৃত্ব ও মেনশেভিক দলের ব্যর্থতা প্রমাণিত হল কয় মাস পরে। নভেম্বর মাসে বলশেভিকরা লেনিন ও ট্রট্স্কির নেতৃত্বে দ্বিতীয় ও বৃহত্তর বিপ্লব সাধন করে।



ট্রট্স্কি

লেনিন: বলশেভিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ভিতরকার অরাজকতা দূর করতে সচেষ্ট হয় এবং সেইজন্য বাইরের গোলযোগ আগে মিটিয়ে নেয়, জার্মানির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানোভ, যিনি **লেনিন** নামে বিশ্ববিখ্যাত, এই মহৎ দায়িত্ব পালন করেন। জার্মান সাহায্যে গোপন বাস থেকে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে সর্বপ্রথম শান্তি স্থাপন করলেন। মার্কসের সাম্যবাদে গভীর বিশ্বাসী লেনিন আমূল সংস্কারের মাধ্যমে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল, কৃষকরা জমির মালিকানা স্বত্ব পেল। রাজ্যের কল-কারখানা সব রাষ্ট্রায়ত্ত করা হল, ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সাম্যবাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে লেনিন কঠিন সমস্যায় পড়লেন। মিত্রশক্তিদের বিপ্লবী বলশেভিকভীতি, পলাতক অভিজাতদের চক্রান্ত, মেনশেভিকদের বিরোধিতা, আর নতুন কৃষি ব্যবস্থায় বড় চাষীদের ('কুলাক') অসন্তোষ স্থানে স্থানে বিদ্রোহ মিলে প্রতিবিপ্লব সৃষ্টি করল। এর ওপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রতি দেশে বিপ্লব পাছে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সেই আশঙ্কায় সশস্ত্রভাবে এগিয়ে এসে হস্তক্ষেপ করল। এক দিকে গৃহযুদ্ধ, অপর দিকে বিদেশী সৈন্য

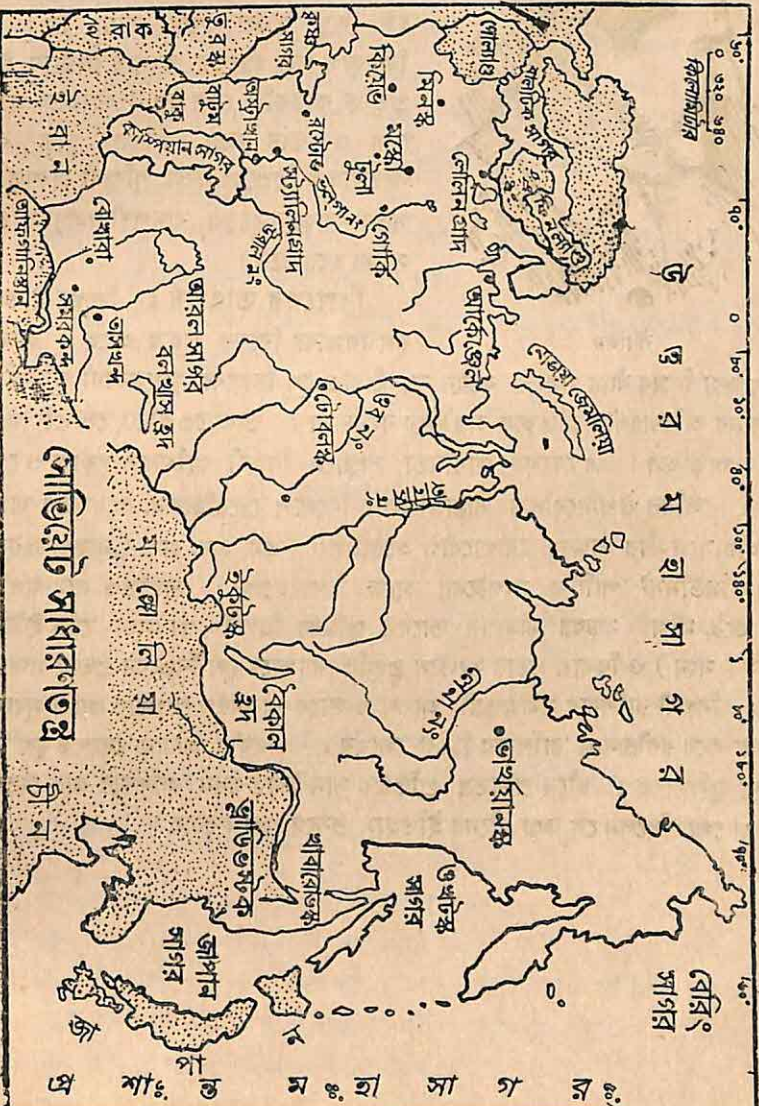
বিতাড়ন, এই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল কর্ণধার লেনিনকে। তাঁর প্রধান সহকর্মী ট্রট্স্কি **লালফৌজ** (Red Army) সংগঠন করে দেশের দারুন সঙ্কটে লেনিনকে নানাভাবে সাহায্য করেন যাতে বিপ্লব জয়ী হয়। ১৯২০ সালে শেষ বিদেশী সৈন্যদলকে মাতৃভূমি থেকে দূর করে, নির্মম হাতে বিরোধীদের ধ্বংস করে লেনিন ক্ষান্ত হলেন।



বক্তৃতারত লেনিন

এরপর লেনিন বেঁচে ছিলেন চার বছর। এই সময়ের মধ্যে দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা ও দৃঢ় ভিত্তি রচনা করাতেই তাঁর সকল শক্তি ও সময় ব্যয়িত হয়। আদর্শ বিপ্লবকে কাজে পরিণত করতে গিয়ে তিনি দেখলেন অনেক বাধা বিপত্তি। তাই এখন তিনি **এক নতুন অর্থনীতি** (New Economic Policy) অনুসরণ করলেন, সাময়িকভাবে সাম্যবাদী নীতি থেকে কিছুটা হটে এসে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অধিকার দেওয়া হয়। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন বুঝে তিনি কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি করলেন। দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার তাগিদে এবং নয়া রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ পাকা করার জন্যই লেনিন কিছুকালের জন্য সমাজস্য বিধান করে চলেন। ১৯২৪ সাল, জানুয়ারী মাসে তাঁর দেহান্ত হলে **ট্রট্স্কি ও স্টালিনের** মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত ট্রট্স্কি দেশান্তরী হয়ে

নিহত হন, স্টালিনের হাতে দেশের ও পার্টির কর্তৃত্ব চলে আসে। স্টালিনের আমলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ প্রলম্বিত হয়, লেনিনের আরদ্ধ বিপ্লব বিস্তার লাভ করে। য়ুরোপে রুশ বিপ্লবের প্রথম সংঘাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।



পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি (ইংলণ্ড, ফ্রান্স), বলশেভিক রীতি-নীতির চরম বিরোধী হয়ে ওঠে। তার প্রধান কারণ, ছিল, পাছে, সাম্যবাদের প্রসারে তাদের রাজ্যে বিপ্লব ঘটে এবং

প্রচলিত শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে দিয়ে শ্রেণীগত স্বার্থ বিঘ্নিত হয়। তাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে জোট সৃষ্টি করে। ১৯১৮ সালে জার্মানির পতন হলে সেখানে একটি বিপ্লবের চেষ্টা হয় কিন্তু সফল হতে পারে নি। তবে কিছুকাল পরে লাভের আশায় জার্মানি ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশ রুশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ও তার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে। বলশেভিক বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী রাজ্যগুলিতে সতর্ক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বামপন্থী দলগুলি ক্রমেই সক্রিয় হয়ে ওঠে।



স্টালিন

বিপ্লবের তাৎপর্য : বিশ্বের ইতিহাসে রুশ বিপ্লবের বিশেষ গুরুত্ব আছে। সাম্যবাদ ও রক্তক্ষরা বিপ্লব যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁরাও রুশ বিপ্লবের যুগান্তকারী ভূমিকা এবং লেনিনের অবিস্মরণীয় কৃতিত্বকে অস্বীকার করেন না। ভারতের ইতিহাসে এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী রাশিয়ার দৃষ্টান্ত ও প্রেরণা ছিল। লেনিন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ চেয়েছিলেন, কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয়েছিল। এম. এন. রায়, (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য) চীনে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের কাজে গিয়েছিলেন। ভারতেও সাম্যবাদী দল গড়ে ওঠে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাদের ভূমিকা ছিল। তা ছাড়া 'ট্রেড ইউনিয়ন' (শ্রমিক সংঘ) ও কিষাণ সভার সংগঠন প্রভৃতি ব্যাপারে রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবী রাশিয়ার সমাজতন্ত্রী আদর্শ ও তাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার কাজে সুব্যবস্থার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ 'রাশিয়ার চিঠি' লেখেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রুশ বিপ্লব প্রেরণা জুগিয়েছে। চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সান-ইয়াত-সেন রাশিয়ার কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলেন সে কথা চীনের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

এক নজরে

* রাশিয়ার সম্রাট জার-এর শাসনতন্ত্র ছিল কঠোর ও স্বেচ্ছাচারী। রাশিয়ার সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে জারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল।
* বিশ্বযুদ্ধের সময় জার-শাসিত দেশের অক্ষমতা, দুর্বলতা, দুর্নীতি এবং তার উপর দারুণ খাদ্যাভাব এবং সেনাবাহিনীর পরাজয় বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।
* ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে রুশ বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লবের মাধ্যমেই জারের শাসনের অবসান ঘটে এবং প্রজাতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব ঘটে।
* এরপর আবার লেনিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এক বিপ্লবে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে এবং সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার উদ্ভব হয়।
* লেনিনের মৃত্যুর পর স্ট্যালিনের শাসনকালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হয়।
* রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য বিশ্বের পরাধীন জাতিসমূহের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কমিউনিস্ট ইস্তাহারের প্রণেতা কে? * কমিণ্টার্ন কি? * রাশিয়ার সম্রাট কি নামে অভিহিত হতেন? * রাশিয়ার সম্রাটের শাসনতন্ত্র কি প্রকৃতির ছিল? * রাশিয়ায় কখন কারা সোভিয়েট গঠন করে? * বলশেভিক ও মনশেভিক কাকে বলে? * রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্ব কখন শুরু হয়? * লেনিন-এর প্রকৃত নাম কি? * লালফৌজ কাকে বলে? * স্ট্যালিন কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন

১। রুশ বিপ্লবের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২। রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা আলোচনা কর।
৩। লেনিনকে মহান নেতা বলা হয় কেন? তাঁর নতুন অর্থনীতি কি ছিল? তাঁর মৃত্যুর পর কাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়? তার ফলে কি হয়েছিল?
৪। রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। রুশ বিপ্লবের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

ব্যবহারিক অনুশীলনী

[এক] নিচের ছকের বাঁদিকের চিত্রগুলি দেখ। এবং ডানদিকের ছকের শূন্যস্থানে এঁদের সম্পর্কে লেখ ঃ

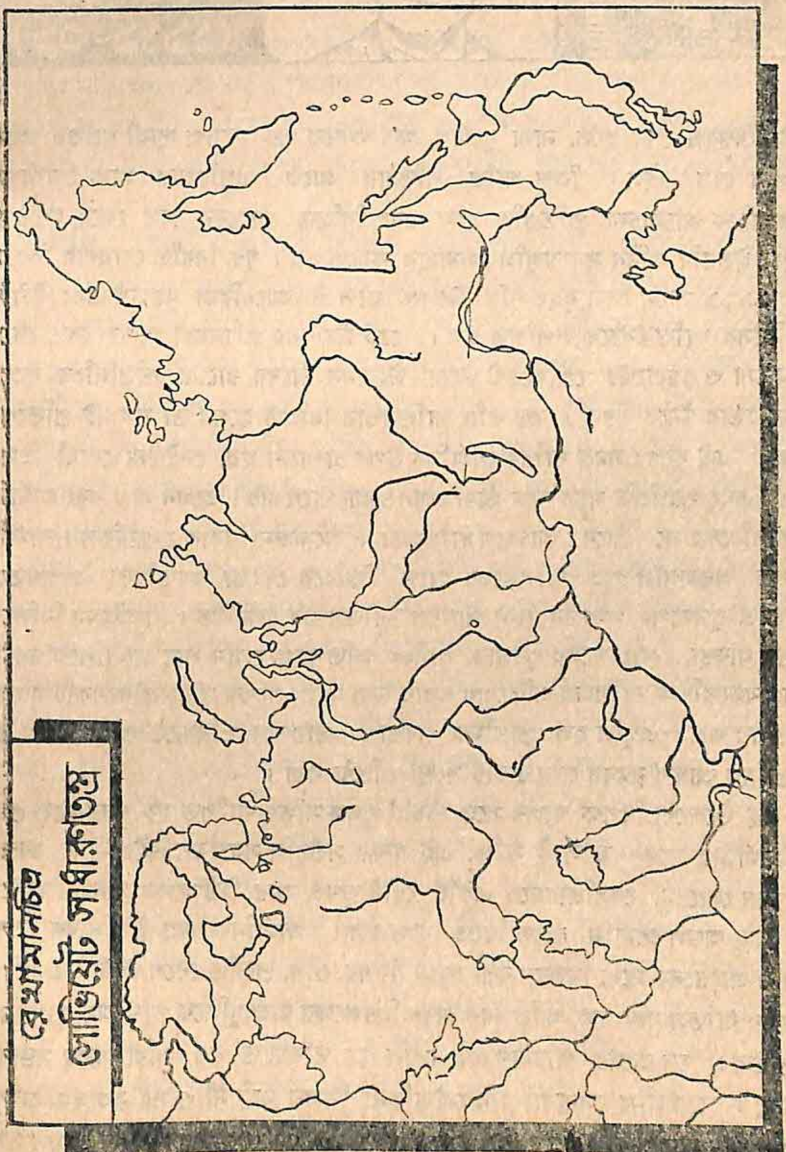






[দুই] তোমার পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের মানচিত্রটি দেখ এবং প্রদত্ত রেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত কর :

লেলিনগ্রাদ, মস্কো, গোর্কি, কিয়েভ, স্টালিনগ্রাদ, বাকু, বোখারা, তাসখন্দ, ভার্খয়ানস্ক, ইর্কুটস্ক সমরকন্দ।



১৪ য়ুরোপের পরিস্থিতি (১৯১৯-৩৯)



প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে, নানা দুর্যোগ, ক্ষয় ক্ষতির পর য়ুরোপ স্থায়ী শান্তির আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার আগে মিত্রশক্তিদের মধ্যে বোঝাপড়া, পারস্পরিক আলোচনা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং বিজিত শত্রুদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় ইত্যাদি কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার কিছুকাল পরে ১৯১৯ সালে তিন বৃহৎ শক্তি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ইটালিও প্যারিসের শান্তি বৈঠকে উপস্থিত হল। গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের ক্লেমেঁসো ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন তাঁদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। যে মনোভাব নিয়ে তিনটি বড় শক্তি শান্তিসভায় মিলিত হলেন তা সম্পূর্ণই প্রতিশোধ-মূলক। এই যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব জার্মানির উপর চাপানো হয়, সেইজন্য দোষী হিসাবে সাব্যস্ত এবং পরাজিত শত্রুর সঙ্গে তাঁরা কোনও আপোষে রাজী ছিলেন না। বরং জার্মানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁদের আচরণে দাম্ভিকতা ও অসৌজন্য প্রকাশ পেয়েছিল। জার্মানির বিজিত অঞ্চলগুলি পূর্ব মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে য়ুরোপের পুনর্গঠন ছিল প্যারিস শান্তিসভার মূলনীতি। সেইজন্য বিজিতের শাস্তির ব্যবস্থা, বিজয়ীদলের পুরস্কার, আর্থিক ক্ষতিপূরণ, প্রধান শত্রু জার্মানিকে গণ্ডীবদ্ধ রাখা, বলশেভিক রাশিয়ার গতিরোধ করার জন্য তার পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি রাজ্যকে জোরদার করা—এগুলি হল প্রাথমিক ব্যবস্থা। তারপরে ভবিষ্যতে স্থায়ী শান্তি এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

এই উদ্দেশ্যে বিপক্ষ দলের সঙ্গে পাঁচটি পৃথক সন্ধির স্থাপিত হয়, তার মধ্যে প্রধান হল জার্মানির সঙ্গে—**ভার্সাই সন্ধি**, এই সন্ধির সর্তগুলি সংক্ষেপে এইরকম। ফ্রান্সকে আলসেস লোরেন, বেলজিয়ামকে একটি ছোট ভূখণ্ড আর মিত্রপক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রদের কিছু কিছু অঞ্চল জার্মানি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে বিতরণ করা হল। মিশর, চীন, প্রভৃতি দেশে জার্মানির বাণিজ্য অধিকার বাতিল করা হল, ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রপক্ষের রাজ্যগুলিকে প্রচুর অর্থ জার্মানিকে দিতে হল। সে অর্থের পরিমাণ এত বেশি যে ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা রইল না। জার্মানির সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বিমান বাহিনী ও সব রকমের অস্ত্রশস্ত্র এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া হল যে জার্মানির সামরিক শক্তি একেবারে সীমিত হয়ে গেল। জার্মানি এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করল এবং তার জন্য সম্রাট ও তাঁর অনুচরদের

বিচারের নির্দেশ দেওয়া হল। পূর্ব য়ুরোপের রুমানিয়া, গ্রীস, পোল্যাণ্ডকে কিছু অঞ্চল দেওয়া হল শত্রুপক্ষের অধিকার থেকে। সার্বিয়াকে একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করা হল, যুগোস্লাভিয়া নাম দিয়ে। ইটালি কয়েকটি জায়গা পেল কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে অপর স্থানগুলি পেল না। চেকোস্লাভাকিয়া একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে স্বীকৃত হল, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর আয়তন খুব সংকুচিত হয়ে গেল। রাশিয়াকে কোণঠাসা করার জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ড, লাতভিয়া প্রভৃতি চারটি দেশকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হল।

সর্তগুলি বিচার করে দেখলে বোঝা যাবে জার্মানির প্রতি মোটেই সুবিচার হয় নি। ভার্সাই-এর সন্ধি ওপর থেকেই চাপানো হয়েছিল, জার্মানিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ দেওয়া হয় নি। য়ুরোপের পুনর্গঠনে একাধিক ত্রুটি ছিল। প্রধান গলদ হল য়ুরোপে ছোট ছোট রাষ্ট্র স্থাপন, যাদের গণতান্ত্রিক শাসনের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না।

জার্মানি : সম্রাট (কাইজার) দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, 'ভাইমার রিপাবলিক' নামে প্রজাতন্ত্র সরকার স্থাপিত হল, কিন্তু এই নতুন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল পনেরো বছর। সমাজে ও রাজনীতিতে কোনও প্রগতি বা পরিবর্তন দেখা গেল না। জমিদারবর্গ, সামরিক দলের বড় কর্মচারীরা দেশের পরাজয়ের অপমান মেনে নিতে পারে নি। এদিকে বামপন্থী সমাজবাদী দলগুলির মধ্যে একতা না থাকায় গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। চার পাঁচ বছরের মধ্যেই মুদ্রাসঙ্কট ও আর্থিক মন্দায় জার্মানির দুরবস্থা বাড়তে থাকে। এর ওপর দেশের উৎপাদন প্রায় থেমে গেলে, শিল্প ব্যবসাও বন্ধ হবার জোগাড়। আর বেকার সৈনিক ও শ্রমিকদের অসন্তোষ তো ছিলই।

ফ্রান্স : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের অবস্থা ইংলণ্ডের চেয়ে আরও শোচনীয় হয়েছিল। জার্মান আক্রমণের দাপট ফ্রান্সকেই বেশি বহন করতে হয়েছিল। নানাভাবে ফ্রান্সের দারুণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে ওঠে নিরাপত্তা। তার প্রধান ভয়ের কারণ ছিল জার্মানির পুনরুত্থান, সেই কারণেই জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া, জার্মানিকে পশ্চিমে ও পূর্বে গণ্ডীবদ্ধ রাখাই ছিল ফ্রান্সের প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স রুর লৌহখনি অঞ্চল দখল, 'সার' (Saar) অধিকার এবং রাইন নদীর তীরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। যদিও ফ্রান্স বৃহৎ ত্রি-শক্তির মধ্যে একজন তবু ইংলণ্ডকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করত না, সেইজন্য নিজের নিরাপত্তার সন্ধানে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যাণ্ড চেকোস্লাভাকিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক মৈত্রী চুক্তি করে। এইভাবে জার্মানিকে কোণঠাসা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের এই ঘেরাও নীতি কিন্তু কার্যকালে সফল হয় নি। ফ্যাসিস্ট জার্মানির নেতা হিটলার এবং তারপর সোভিয়েট রাশিয়া ঐ রাষ্ট্রগুলির অখণ্ডতা বিঘ্নিত করে। ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও স্থিতিশীল ছিল না। তার অর্থনৈতিক অবনতির কথা আগেই বলেছি। তার ওপর ফ্রান্সে নানা দলের মধ্যে জোটবদ্ধ মন্ত্রিসভাগুলির ঘন ঘন উত্থান ও পতন হত। ১৯৩৬ সালে দক্ষিণপন্থী জোটের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলগুলি একত্র হয়ে সরকার গঠন করে। এর নাম 'পপুলার ফ্রন্ট' বা জনগণের

ফ্রন্ট। এই মন্ত্রিসভা অল্পদিন স্থায়ী হয় কিন্তু তারই মধ্যে ফরাসী ব্যাঙ্ক ও কয়েকটি কারখানার জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের স্বার্থ কল্যাণে কয়েকটি আইনও পাশ করা হয়।

ইটালি ঃ ইটালিতেও ব্যর্থতার ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়াচ্ছিল। উত্তর ইটালিতে সাম্যবাদীদের প্রভাবে নানা জায়গায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল, শিল্প-কারখানাগুলিতে ক্রমাগত ধর্মঘট চলতে লাগল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে ইটালি জার্মানিকে ছেড়ে জমি-জায়গা লাভের আশায় মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে ইটালির প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। বঞ্চনায় হতাশায় দেশ ক্ষুব্ধ হয়ে রইল। দেখা যাচ্ছে ইটালি ও জার্মানিতে ভিতরকার অবস্থা ছিল বিপ্লবের অনুকূল। তাই হল। কিন্তু জনগণের দাবিতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, কেবল এক-নায়কের কর্তৃত্বে একটি দলের ক্ষমতা দখল। যুদ্ধের পর রাষ্ট্রনেতারা চেয়েছিলেন পৃথিবীতে শান্তি ও গণতন্ত্রের অস্তিত্ব যেন আর বিপন্ন না হয়। কিন্তু যা ঘটতে লাগল তাকে প্রতি বিপ্লব বলা যায়, অর্থাৎ একনেতৃত্বে (ডিক্টেটরশিপ) ও একদলীয় প্রাধান্য, যা প্রজাতন্ত্রের স্বাধীন মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই পরিস্থিতিতে ইটালি ও জার্মানিতে দুই নেতার আবির্ভাব হয়—**মুসোলিনী** ও **হিটলার**। এঁরা অবস্থার পূর্ণ-সুযোগ নিয়ে দেশের সামনে মিথ্যা আশা ও শক্তির মোহ সৃষ্টি করলেন, জনগণকে বিভ্রান্ত করলেন জাতীয়তার নামে, সমাজতন্ত্রের মৌখিক বুলি দিয়ে। উভয়েই জোর দিলেন তীব্র জাতীয়তা বোধ এবং বলপ্রয়োগের ওপর। বললেন, বঞ্চিত ও পরাস্ত রাষ্ট্র ঐক্য ও শক্তিবদ্ধ হলে আবার মর্যাদা অধিকার ফিরে পাবে, রাজ্যবিস্তার ও আর্থিক সম্পদ বাড়িয়ে। তার জন্য চাই কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দল সংগঠন, নেতার চরম কর্তৃত্ব স্বীকার।



বক্তৃতারত হিটলার

মুসোলিনির প্রচারিত ফ্যাসী-বাদ (Fascism) এবং হিটলারের নাৎসি (Nazism) মতবাদ এদের মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য প্রায় একই ধরনের, রকমফের মাত্র। এই মতবাদে একটি মাত্র দলের নেতৃত্ব-অধিকার, রাষ্ট্রের তথা পার্টির ওপরে বা বাইরে কারুর অস্তিত্ব নেই। সব কিছু রাষ্ট্রের আয়ত্ত ও অধীন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বরবাদ করে রাষ্ট্রের নামে একনায়কের চরম কর্তৃত্ব স্বীকার, শক্তিমত্তার গুণকীর্তন আর যুদ্ধের জয়গৌরব—এইগুলি হল ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের মূলনীতি যা স্পষ্টই শান্তি ও স্বাধীনতার বিপরীত। দুটি দেশেই দলগঠন ও কার্যক্রম ছিল প্রায় সামরিক। সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি

নিখুঁত শৃঙ্খলা, সুদক্ষ পুলিসবাহিনী ও গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ, সন্দেহমাত্রই বিপক্ষ-দলন—এই ভাবে মুসোলিনী ও হিটলার স্বদেশের শক্তি ও মর্যাদা বাড়ানোর আছিলায় আত্মকর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে চলেন। হিটলারের জাতীয়তাবাদ ছিল বেশি উগ্র। তাঁর মতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক হল শ্বেতকায় নর্ডিক (উত্তর য়ুরোপ) সংস্কৃতি আর সভ্যতার ধ্বংসকারী হল ইহুদী ও কৃষ্ণকায় জাতি। ইহুদীদের সমূলে বিনাশ ও কমিউনিস্টদের বিতাড়নের জন্য তিনি চরম অত্যাচার চালিয়ে যান। ফ্যাসিস্ট দলের পরনে কালো কুর্তা, মাথার টুপিতে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতীক ঈগল পাখি। নাৎসি পার্টির অঙ্গসজ্জা বাদামী রঙের কুর্তা, হাতে আর্য জাতির মঙ্গল-প্রতীক 'স্বস্তিকা' চিহ্ন। এ সবই আগামী দিনের অশুভ ইঙ্গিত. আর একটি ভয়াবহ যুদ্ধের সংকেত। জওহরলাল য়ুরোপ সফরে গিয়ে এই ডিক্টেটরী শাসন ও স্পেনের গৃহযুদ্ধে তার অযথা হস্তক্ষেপ চাক্ষুষ করে আসেন ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাতীয়তার উগ্ররূপ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনায় 'সভ্যতার সঙ্কট' নিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

লীগ অব নেশন্স (জাতি-সংঘ) ঃ ভয়াবহ মহাযুদ্ধের অবসানে চিন্তাশীল নেতারা বিশ্বের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অনুভব করেন ও সেই কাজ তদারক করার জন্য একটি সংস্থা গঠনের প্রয়োজন বোধ করেন। সেই উদ্দেশ্যে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি উইলসন তাঁর Fourteen Point বা চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের মধ্যে জাতি-সংঘ গঠনের প্রস্তাব রাখেন। তারই ফলে ভার্সাই সন্ধিপত্রের মধ্যে জাতি-সংঘের সংগঠন অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি এই রকম ঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা স্থাপন, যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা, যুদ্ধের সম্ভাবনা বন্ধ করা শান্তি ও সম্মিলিত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আন্তর্জাতিক সালিশী বা মধ্যস্থতায় বিরোধের নিষ্পত্তি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যদি কোনও রাষ্ট্র জাতি-সংঘের নিয়মপত্র না মেনে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তা হলে আক্রমণকারীর সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্র সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং দরকার হলে সামরিক শক্তি খাটাবে।

এই সংঘের তিনটি অঙ্গ—একটি অ্যাসেমব্লি (সাধারণ সভা), একটি কাউন্সিল (কার্য-সমিতি) ও একটি সেক্রেটারিয়েট (মহাকরণ)। জেনিভায় ছিল জাতি-সংঘের বসতি, স্থায়ী সদস্য ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বড় রাষ্ট্রগুলি। বিরোধ শুনানী ও মীমাংসার জন্য হল্যাণ্ডের মধ্যে হেগ্ শহরে এক স্থায়ী বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও মিত্রপক্ষের সকল রাজ্য ও অন্যান্য নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সংঘের সদস্য হন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সদস্য ছিল না। পরাজিত জার্মানি ও সোভিয়েট রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

জাতি-সংঘ কয়েকটি সালিশী ব্যাপারে মধ্যস্থ হয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি করে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি সংস্থা গঠন, দুর্নীতির ব্যবসা রহিত করা, বিশ্ব-স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধান এবং বিজিতরাজ্য ও উপনিবেশগুলিতে অছি-প্রথার প্রবর্তন, এই রকম কয়েকটি কাজে সংঘ সফল হয়েছিল।

কিন্তু মূল দুর্বলতার জন্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা যেত না। ইটালি অ্যাবিসিনিয়া গ্রাস করলে (১৯৩৫), জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে (১৯৩১), জাতিসংঘ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। তার ওপর ইটালি, জার্মানি ও জাপান লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে। নিরস্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার বড় কারণ, কোন রাষ্ট্রই অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে দুর্বল হতে রাজী ছিল না। পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাসে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়। একদিকে সকল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অপর দিকে সশস্ত্র শক্তির জোট। এই দুটি পরস্পর বিরোধী প্রচেষ্টার মধ্যে মিল করা অসম্ভব। ভারতের উপর জাতি-সংঘের প্রভাব সামান্যই। কয়েকটি সংস্থায় ব্রিটিশ-অধীন ভারত অংশগ্রহণ করেছিল, এই মাত্র। জাতি-সংঘের প্রতি আস্থা স্বভাবতই কমে যায় যখন জার্মানিতে হিটলার ও ইটালিতে মুসোলিনী আর সুদূর প্রাচ্যে জাপান স্বেচ্ছামত আক্রমণ চালিয়ে অপর রাষ্ট্রকে গ্রাস করতে যায় এবং জাতিসংঘ তার কোনই প্রতিকার করতে পারল না। আসল কথা, জাতি-সংঘের হাতে নিজস্ব সৈন্যদল ও সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল না আর সদস্যরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চায় নি।

এক নজরে

* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর পাঁচটি সন্ধির দ্বারা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছিল। এই প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেসোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী অর্লেণ্ডো এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে মুসোলিনী ইতালিতে এবং হিটলার জার্মানিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতালিতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানিতে নাৎসীবাদ-উভয়ই একনায়কতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।
* মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালির আর্থিক অবস্থার উন্নতি, শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হিটলারের নাৎসী দলের তিনটি প্রধান লক্ষ্য ছিল ভার্সাই সন্ধি অগ্রাহ্য করা, জার্মানি থেকে ইহুদী বিতাড়িত করা এবং জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা।
* প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই-এর শান্তি সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের উৎপত্তি হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য দিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। ১৯৩৯ সালে জার্মানি পলিশ করিডর আক্রমণ করলে জাতিসঙ্ঘ ভেঙে যায়।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* প্যারিস সম্মেলন কাকে বলে ?
* প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পরিচালনার ভার কাদের উপর ন্যস্ত ছিল ?
* ভার্সাই সন্ধি কাকে বলে ?
* ভার্সাই সন্ধি কি স্থায়ী শান্তি এনেছিল ?
* ভার্সাই সন্ধির মধ্যে কি কি ত্রুটি দেখা যায় ?
* মুসোলিনী কে ছিলেন ?
* ফ্যাসিস্ট কাদের বলে ?
* ফ্যাসিবাদ কি ?
* ফ্যাসিস্ট দলের অঙ্গসজ্জা কেমন ছিল ?
* ফ্যাসিস্ট দল কি ভাবে ইটালির শাসনভার গ্রহণ করে ?
* হিটলার কে ছিলেন ?
* নাৎসীবাদ কাকে বলে ?
* নাৎসী দলের অঙ্গসজ্জা কিরূপ ছিল ?
* হিটলার কিভাবে জার্মানির শাসনভার গ্রহণ করেন ?
* হিটলার ও মুসোলিনীর আদর্শে ও কার্যকলাপে কি সাদৃশ্য দেখা যায় ?
* চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের রচয়িতা কে ছিলেন ?
* কবে জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ? এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি বর্ণনা কর।

১। কোন পরিস্থিতির মধ্যে জার্মানিতে নাৎসী দলের উদ্ভব হয়েছিল ? এই দলের নেতা কে ছিলেন ?

৩। লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা কে ছিলেন ? এই সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কি ছিল ?

৪। লীগ অব নেশন্স-এর কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা আলোচনা কর।

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন

১। প্যারিস বৈঠক ও য়ুরোপের পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর।

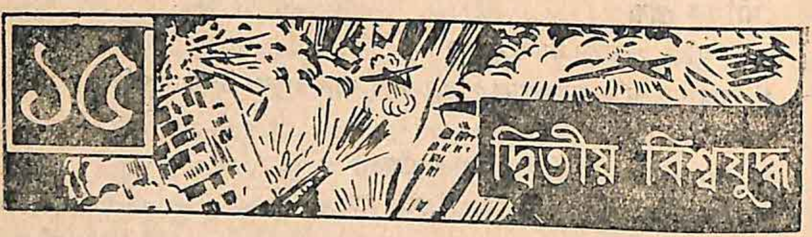
২। প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের প্রথম চারজন কে ছিলেন ? এই সম্মেলনের সামনে কি সমস্যা ছিল ? বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে উড্রো উইলসনের আদর্শ কি ছিল ?

৩। মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালিতে ফ্যাসিস্টদের কার্যকলাপ কিরূপ ছিল ?

৪। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে কিভাবে নাৎসী দলের উত্থান ঘটে ?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) ভার্সাই সন্ধি (খ) ফ্যাসিবাদ (গ) জাতিসঙ্ঘ।



দ্বিতীয় মহাসমর ঃঃ উৎপত্তি ও পটভূমি : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বৃহৎ ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমগ্র কাহিনী অল্প পরিসরে বলা যায় না। এখানে শুধু তার পটভূমি, ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া বলা হচ্ছে। প্যারিসের শান্তি বৈঠক যুদ্ধের অবসান ঘটাল, কিন্তু ভার্সাই সন্ধি স্থায়ী শান্তি আনতে পারল না। চুক্তিপত্রে এমন সর্ত থাকে যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ সুপ্ত থাকে। ১৯১৯ সালে মিত্রশক্তিরা যে সন্ধি ব্যবস্থা তৈরি করলেন, তার মধ্যে স্থায়ী অসন্তোষ ও বিরোধের আশঙ্কা রয়ে গেল। বিজিত জার্মানদের নৌবাহিনী নষ্ট করে, সামরিক শক্তি খর্ব করে শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলে সৈন্য বসিয়ে আগামীকালে জার্মানির প্রতিশোধ তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা হল। যুদ্ধের খেসারত বাবদ ক্ষতি পূরণের দাবির অঙ্কের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। সন্ধির সর্তে এমন এক দারুণ ঋণভার চাপানো হল জার্মানির ওপর যে পরিশোধ করার সম্ভাবনা রইল না। ভার্সাই সন্ধির অবিচার ছাড়া জার্মানি ও ইটালিতে যে উগ্র জাতীয়তাবোধ ও আগ্রাসী মনোভাব জন্মায় তার ব্যাখ্যাও আগের অধ্যায়ে করা হয়েছে। অতিমাত্রায় জাতীয়তাবাদ ও শক্তিপূজা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্য কারণও ছিল। ইটালি, জার্মানি ও জাপান যে এতটা বাড়তে পেরেছিল তার কারণ জাতি-সংঘের দুর্বলতা, উদাসীন অক্ষমতা। বড় রাষ্ট্রের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনো সদস্য রাজ্য মৌখিক আপত্তি ছাড়া আর কিছু করে নি। তা ছাড়া পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস, আপন আপন স্বার্থরক্ষার চেষ্টার ফলে স্পেনের গৃহযুদ্ধে যখন গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছিল, তখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্স নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে, ফ্যাসিস্ট ও নাৎসিরা স্পেনের রণনায়ক জেনেরাল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করছে দেখেও তারা বুঝতে পারেনি যে হিটলার-মুসোলিনি আসন্ন এক ভয়াবহ যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছেন। সমস্ত উপনিবেশ ছেড়ে দিয়ে, শক্তিহীন হয়ে অপরিশোধ্য ঋণের ভার মাথায় নিয়ে জার্মান যে বেশি দিন নিচু হয়ে থাকবে না, আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে—হিটলারের অভ্যুদয় তারই প্রমাণ। কয়েক বছরের মধ্যে হিটলার গোয়েরিং, গোয়েবেল্‌স্ প্রভৃতি বশ্য সহকর্মীদের নিয়ে নতুন মদমত্ত জার্মান রাষ্ট্র গড়ে তুললেন এবং মিত্রপক্ষের কাছে ঋণ বাতিল করে দিলেন। অস্ট্রিয়াকে নিজ রাষ্ট্রভুক্ত করে (আন্‌শ্লুস) তিনি চেকোস্লাভাকিয়ার এক অংশ সুডেটেন অঞ্চল কুক্ষিগত করলেন (১৯৩৮)। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করল না। লোক দেখানো একটা ব্যবস্থায় হিটলারের সঙ্গে বৈঠক করে শেষে **মিউনিখ-এর চুক্তিতে** (Munich Pact)

হিটলারের আগ্রাসী বিস্তারকে স্বীকার করে নিল। আর প্রচার করল, শান্তি সম্মান বজায় রাখতে পেরেছি। আসলে এ কাজ গণতন্ত্রের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

ওদিকে মুসোলিনি দু বছর আগেই অ্যাবিসিনিয়া আক্রমণ করেন, তার পরে আলবেনিয়া। হিটলারের সমর্থনে ও জাতিসংঘের নিশ্চেষ্টতায় এ কাজ সম্পন্ন হল। দুই নেতার একই নীতি ও পদ্ধতি। 'আদেশ মান্য করো, যুদ্ধ করো নেতার ওপর বিশ্বাস রাখো'—এই ছিল জিগির। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে বলা হয় হিটলারের যুদ্ধ মুসোলিনির অনুসরণ। কিন্তু বুঝে দেখো ফ্যাসিবাদের উত্থান ও জয়যাত্রা কিসে সম্ভব হল। মিত্রপক্ষের তোষণ-নীতি,—হিটলারের একের পর এক দাবিগুলি মেনে নিয়ে তাকে ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা। ফ্রান্স জার্মানির ভয়ে নিজের নিরাপত্তার খোঁজে শক্তিজোট তৈরি করতে ব্যস্ত, ইংলণ্ড আপন ব্যবসার স্বার্থে হিটলারকে উড়ো-জাহাজ আর যুদ্ধের উপকরণ জোগাচ্ছে। ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির কথা কেউ ভাবছে না। মিত্রশক্তিদের এই মনোভাব সোভিয়েট রাশিয়া জানত। বুঝেছিল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আসল শত্রু জার্মানি নয় সাম্যবাদী রাশিয়া। তারাই হিটলারকে বাড়তে দিচ্ছে এবং সঙ্কটকালে জার্মানির সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া করে জার্মান সৈন্য ও কামানের মুখ সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে দেবে। তাই প্রস্তুত হওয়ার জন্য, সময় হাতে নিয়ে স্ট্যালিন হিটলারের সঙ্গে শেষ কালে 'অনাক্রমণ চুক্তি' করেন। সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় মহাসমর শুরু হয় ১লা সেপ্টেম্বর, যখন হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানির সপক্ষে যোগদান করল তার মিত্রবর্গ। ১৯৪১, জুন মাসে হিটলার চুক্তিভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করেন, যেটি হল তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল। ওদিকে ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে দূর প্রাচ্যে জাপান আমেরিকার নৌঘাঁটি পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রমণ করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র এই বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত হয়। প্রধান রণভূমি ছিল সোভিয়েট রাশিয়া ও সমগ্র য়ুরোপ, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ। নতুন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরি জঙ্গী বিমান, বোমারু বিমান ডুবোজাহাজ ; ট্যাঙ্ক, বিধ্বংসী কামান, নানা রকম ভয়ঙ্কর মরণাস্ত্র এবং সব শেষে পারমাণবিক বোমা যে কি পরিমাণ অর্থক্ষয় প্রাণনাশ ও ধ্বংস সাধন করে তা বর্ণনা করা যায় না।

এখানে যুদ্ধের কয়েকটি মুখ্য ঘটনার শুধু উল্লেখ করি। প্রথমে উত্তর য়ুরোপে ডেনমার্ক, নরওয়ে, তারপর পশ্চিমে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ জার্মানি দখল করে নেয়। তারপর হিটলার বাহিনী ডানকার্ক বন্দরে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে সমগ্র উত্তর ফ্রান্স অধিকার করে। ইটালিও এই সুযোগে সংলগ্ন এক ফরাসী অঞ্চল দখল করে নেয়। এর পর এল ইংলণ্ডের পালা জীবন-মরণের সমস্যা। ক্রমাগত বোমারু বিমান

আক্রমণে সারা দেশ কণ্টকিত হয়ে উঠল। এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নেতৃত্বে ইংলণ্ড কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আফ্রিকায় বৃটিশ উপনিবেশ এসিয়ায় ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশ ও ভারতসীমান্ত জার্মানি, ইটালি ও জাপানের আক্রমণে বিপন্ন হল। এদিকে রাশিয়া দুবছর ধরে অসীম সাহসে ও কৌশলে হিটলারকে প্রতিরোধ



চার্চিল



রুজভেল্ট

করতে সক্ষম হয় এবং বিখ্যাত স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করে। যুদ্ধের গতি ক্রমেই মিত্রশক্তিদের অনুকূলে আসতে লাগল। চার্চিল, স্টালিন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, তিন নেতার পরামর্শ ও পরিকল্পনায় জার্মান ইটালিয় ও জাপানী সেনাবাহিনী য়ুরোপ আফ্রিকায় ও এসিয়ায় হটে যেতে লাগল। জাপানের কবল থেকে ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী বিজিত অঞ্চলগুলি ছিনিয়ে নিল। অবশেষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় সৈন্যদল পশ্চিম ও দক্ষিণ য়ুরোপ আর সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব য়ুরোপ থেকে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল। ইটালির পতন হল, জার্মানি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল (১৯৪৫)। এর কয়েক মাস পরে আমেরিকা হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করায়।

ফলাফল ঃ ভারতের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় দুটি ক্ষেত্রে, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। মহাযুদ্ধের সময় ভারতে শেষ মুক্তি সংগ্রাম, দেশবিভাগ ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ঘটে। সাম্যবাদী দল এই যুদ্ধকে ফ্যাসী বিরোধী 'জনযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতের তহবিল দরিদ্র হয়ে যায়, ভারতের নামে জাতীয় ঋণ বাড়ে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোক মারা পড়ে, জিনিসপত্রের দাম চড়ে যায়, এবং আর্থিক কাঠামো এমন নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে বিশ পঁচিশ বছর ধরে স্বাধীন ভারতকে তার জের টানতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মোটামুটি এই ফলাফল। পৃথিবীর অন্যত্রও এই যুদ্ধের ফলে যে সব পরিবর্তন ঘটে, তা সপ্তদশ অধ্যায় চীন, দক্ষিণ পূর্ব এসিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-প্রসঙ্গে বুঝিয়ে বলা হয়েছে।

এক নজরে

* প্যারিসের শান্তি বৈঠক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল কিন্তু ভার্সাই সন্ধি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। চুক্তিপত্রে এমন শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের বীজ সুপ্ত অবস্থায় ছিল।
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জাতিসংঘের দুর্বলতা উদাসীন ক্ষমতা ; ইটালি, জার্মানি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপকেও অতিমাত্রায় দায়ী করা হয়।
* ১৯৩৯ সালে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সালে ইটালির পতনে, জার্মানি ও জাপানের আত্মসমর্পণ।
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল ইটালি, জার্মানি ও জাপান এ 'অক্ষশক্তি' আর অপর পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি 'মিত্রশক্তিবর্গ'।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

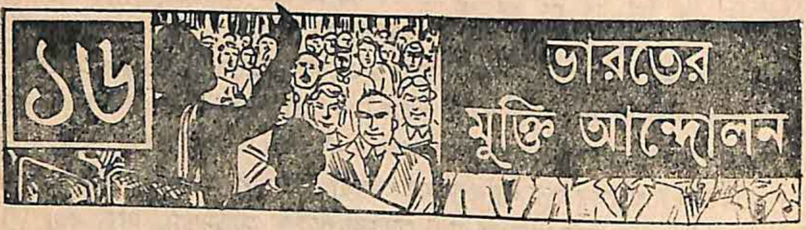
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কখন শুরু হয়েছিল ? * ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ? * হিটলার কখন রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। * জাপান আমেরিকার নৌঘাঁটি পার্লবন্দর কখন আক্রমণ করেছিল ? * দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল ? * কোন যুদ্ধে জার্মান বাহিনী রাশিয়ার কাছে পরাস্ত হয় ?
* পারমাণবিক বোমা জাপানের কোন কোন শহরের উপর নিক্ষেপ করা হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল?
২। ভার্সাই সন্ধি (১৯১৯) য়ুরোপে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় নি কেন ?
৩। 'ভার্সাই সন্ধি সর্তের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল'—এই উক্তির অর্থ কি ?
৫। হিটলারের কার্যকলাপ ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আর কি কি কারণ ছিল ?
৬। পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কি প্রভাব দেখা যায় ?
৭। যুদ্ধকালে হিটলার পশ্চিম ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশ অধিকার করেন ?
৮। চার্চিল, স্ট্যালিন ও রুজভেল্ট কিভাবে সংঘবদ্ধ আক্রমণ করেছিলেন।
১০। **সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ** মিউনিখ চুক্তি, রোম-বার্লিন—টোকিও মৈত্রী, পার্ল হারবার বা হিরোশিমা ও নাগাসাকি।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণগুলি আলোচনা কর।
২। য়ুরোপীয় দেশগুলি হিটলারের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেনি কেন ?



১৬ ভারতের মুক্তি আন্দোলন

প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি ইংরেজ সরকার ভারতীয় সাহায্য পাওয়ার আশায় একটি নতুন শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ঐ সংস্কার-আইন চালু হওয়ার আগেই কুখ্যাত **রাওলাট আইন** পাশ হল। এর জোরে সন্দেহ হলে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করে দণ্ড দেওয়া যায়। জাতীয় কংগ্রেস স্পষ্টই বুঝল, নতুন শাসন-সংস্কারে যতটুকু ক্ষমতাই দেওয়া হোক, ভারতবাসীরা তা নিয়ে কোনো বিক্ষোভ আন্দোলন করতে পারবে না। রাওলাট আইনের বলে তাদের জেলে আবদ্ধ করা চলবে। ইতিমধ্যে ভারতপ্রেমিক মিসেস্ অ্যানি বেসান্তের প্রচেষ্টায় 'হোম রুল লীগ' স্থাপিত হয়েছিল এবং তিলকের উদ্যমেও পুণায় আর একটি 'হোম রুল লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ভারতের স্বায়ত্ত শাসন দাবি জানিয়ে। সুতরাং দেশময় স্বরাজের আদর্শ প্রচারিত হতে লাগল। ১৯১৯ সালে ভারতসচিব মণ্টেগু আর বড় লাট চেম্‌সফোর্ড মিলে যে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করলেন, চরমপন্থীরা তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করলেন না। তাঁদের দলই সংখ্যায় ভারী হওয়ায়, কংগ্রেসে তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল।

গান্ধীজির নেতৃত্ব (১৯১৯-৩৫): এই যুগে বিশ্ব-ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হয়। তার মধ্যে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব, তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ও খলিফার পদলোপ, আয়ারল্যাণ্ড, মিশরে ও চীনদেশে জাতীয় বিক্ষোভ ও মুক্তি-আন্দোলন, এই আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আর ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা হল গান্ধীজির নেতৃত্ব গ্রহণ। এখন থেকে স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত (১৯১৯-১৯৪৭) মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন দেশের সর্ব-বরেণ্য নেতা যাঁর নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা আন্দোলন সুদীর্ঘকাল চালিত হয়েছে। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি প্রথম গণ-আন্দোলনের পথ দেখালেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর 'সত্যাগ্রহ' নীতির পরীক্ষা হয়েছিল। এখন ভারতে সেই নীতি অনুসরণ করে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামতে দেশবাসীকে তিনি আহ্বান জানালেন। ফলে দেশব্যাপী ধর্মঘট ও তুমুল উত্তেজনার মধ্যে এক ভয়াবহ কাণ্ড ঘটে গেল। দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি জায়গায় ইংরেজদের দমননীতির প্রতিবাদ জানাবার জন্য জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা হয়। প্রকাশ্য সভা নিষিদ্ধ থাকলেও **জালিয়ানওয়ালাবাগে** সমবেত নিরস্ত্র মানুষদের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে জেনারেল ডায়ার যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড করলেন, তার তুলনা নেই। প্রতিবাদে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইংরেজের

দেওয়া 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করে পরাধীন জাতির অক্ষম মর্মবেদনাকে যে তেজস্বী ভাষায় ব্যক্ত করলেন, তা চিরস্মরণীয়।

অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন : সত্যাগ্রহ ও অহিংসা, এই দুই নীতির ভিত্তিতে গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯২০ সালে আরম্ভ হল খিলাফৎ আন্দোলন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও মিত্রশক্তিরা তুর্কী সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড করে সুলতান-খলিফার পদ লোপ করতে গেলে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। সম্প্রীতির জন্য গান্ধীজি তাকে সমর্থন ও সহানুভূতি জানালেন। এর পর, একতাবদ্ধ জন-আন্দোলন গড়ে তুলতে গান্ধীজি তাঁর '**অহিংস অসহযোগ**' নীতি ঘোষণা করলেন। ১৯২০ সালে ১লা আগস্ট এই ঐতিহাসিক আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল—পাঞ্জাবের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও অন্যত্র পুলিসী জুলুমের জন্য দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি দান, 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকার, সমস্ত সরকারী সম্মান ও খেতাব বর্জন, সরকার পরিচালিত শিক্ষায়তন থেকে ছেলে-মেয়েদের সরিয়ে আনা এবং আইন-আদালত বর্জন। তাছাড়া জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিদেশী দ্রব্য পরিহার ও স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার, হাতে সুতো-কাটা ও বোনা, এই রকম কর্মসূচী নিয়ে জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজি নামলেন। **চরকা ও খাদির** ওপর বিশেষ জোর দিয়ে গান্ধীজি দেশবাসীকে আত্মত্যাগী ও স্বনির্ভর হতে আহ্বান জানালেন।



গান্ধীজি

সারা দেশ অভূতপূর্ব আগ্রহে এই ডাকে সাড়া দিল। ছাত্ররা দলে দলে 'গোলামখানা' ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দিল এবং পুলিসের অত্যাচার নীরবে সহ্য করল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু, রাজাগোপালাচারী, গোপবন্ধু দাস, বিঠলভাই ও বল্লভভাই প্যাটেল, আজমল খাঁ, সরোজিনী নাইডু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, লাজপৎ রায়, জওহরলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন নেতারা আন্দোলনে যোগ দিলেন। এরই মধ্যে লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হল এবং যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত-সফর 'বয়কট' করা হল। ১৯২১ সালে কংগ্রেস আর একটি আন্দোলনের প্রস্তাব নেয়। সেটি হল ব্যক্তির ও জনগণের আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজির ইচ্ছায় পশ্চিম ভারতে **বরদোলিতে** গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হল। কিন্তু আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগেই উত্তর প্রদেশে **চৌরি চৌরায়** অসংযত জনতা পুলিস-ফাঁড়ি আক্রমণ করে এবং তার ফলে কয়েকজন পুলিস প্রাণ হারায়। এই হিংসাত্মক কার্য দেখে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। গান্ধীজির সিদ্ধান্তে দেশে হতাশা নেমে এল। কিছুদিন পরে গান্ধীজি 'ছয় বছরের জন্য

গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। আদালতে বিচারের সময় তিনি অসহযোগী হয়ে যে বিবৃতি দেন তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

স্বরাজ্য দল ও চিত্তরঞ্জন : 'অহিংস অসহযোগ' ব্যর্থ হওয়াতে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতারা ভেবে ঠিক করলেন, আইন সভাগুলিকে বর্জন না করে নির্বাচনে দাঁড়ানো উচিত। নির্বাচিত হয়ে আইনসভার ভিতর থেকে অনবরত বাধা সৃষ্টি করে শাসনতন্ত্রকে বানচাল করা দরকার। অনেকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। অপর পক্ষে মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য' দল গঠিত হল। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে স্বরাজ্য প্রার্থীরা ১৯২৩ সালে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। কিন্তু আইনসভায় প্রবেশ করে তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতে হবে। কলকাতা, ঢাকা, কানপুর প্রভৃতি শহরে ইংরেজের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে। দ্বিতীয় বড় ঘটনা, **ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস** প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমিকদের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে দেশে যুবশক্তির উত্থান, প্রগতিশীল মতের প্রতিনিধি স্বরূপ জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং **কিষাণ সভা** গঠন ও কৃষক-আন্দোলনের সূত্রপাত।

'পূর্ণ স্বরাজ' : ভারতের আর এক দফা শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিলাত থেকে যে সাইমন কমিশন পাঠানো হয় তাতে কোনো ভারতীয় সদস্যের স্থান ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস এই কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২৮) স্থির করা হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ছিন্ন হওয়া ভারতের প্রয়োজন ও লক্ষ্য। পরের বছর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ এবং ২৬ জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের দিন বলে ধার্য হয়। ব্রিটিশ শাসনে ও তার প্রতিশ্রুতিতে দেশের আস্থা ছিল না। চারদিকে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকল ; সন্ত্রাসবাদ কর্ম-তৎপর হয়ে উঠল।

১৯২৮ সাল থেকে যে পর্ব শুরু হয় তার ঐতিহাসিক পরিণতি ১৯৪২ সালের **আগষ্ট বিপ্লব** এবং **'কুইট ইণ্ডিয়া'** বা **'ভারত ছাড়ো'** আন্দোলন। গান্ধীজির জীবন কালেই তাঁর নীতি ও কর্ম-পদ্ধতির সমালোচনা হয়। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত, পশ্চিম ভারতে মিল-শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করার পরামর্শ, এই সবের ফলে জাতীয় আন্দোলনের প্রগতি ব্যাহত হয়। তাঁর বিবেকপরায়ণতা ও অহিংস নীতির সার্থকতায় সন্দেহ প্রশ্ন জেগেছিল। মতবিরোধ সত্ত্বেও কোন নেতাই তাঁর নেতৃত্ব অস্বীকার করেন নি।

লবণ আইন আন্দোলন : ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত সময়ে জাতীয় আন্দোলনে অনেক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। কৃষক শ্রমিক যুব সমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, সকল শ্রেণীর মানুষ দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। শ্রমিক ও কৃষকরা সংঘবদ্ধ হতে শেখে, গুজরাটে বল্লভভাই প্যাটেল বরদোলিতে খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষক-আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ওদিকে লাহোর কংগ্রেসে গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সাইমন রিপোর্ট দাখিল হলে তা আগ্রাহ্য করা হয়। এই অবস্থায় গান্ধীজির নেতৃত্বে দেশ ব্যাপী 'লবণ আইন' অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হল। সরকারের

একচেটিয়া অধিকার এই লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা-মূলক একটি চ্যালেঞ্জ। ৬ই এপ্রিল ১৯৩০ সেই প্রসিদ্ধ ডাণ্ডি অভিযানের দিন। গান্ধীজি তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনায় নামলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নেতা **আবদুল গফর খাঁ** রাজনীতির অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন। এই পাঠান বীর নেতা সংগঠন করেন খোদা-ই-খিদমৎকার নামে স্বদেশ সমাজ-সেবায় ব্রতী এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। পরনে লাল কুর্তা এই সীমান্ত পাঠান দল পরে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হয়। গান্ধীজির পরম অনুগত শিষ্য গফর খাঁ হলেন সম্পূর্ণ অহিংস-পন্থী, যেমন তেজস্বী দেশপ্রেমিক তেমনি সাধুচরিত্র। জনগণ তাঁকে 'সীমান্ত গান্ধী' আখ্যা দেন। 'লবণ আইন' আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি ব্যর্থ হল দেখে আপোসের কথা উত্থাপিত হল। **গান্ধী আরউইন চুক্তি** স্বাক্ষরিত হলে আন্দোলন সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হয়। এই সময়ে বিলাতে 'গোল টেবিল বৈঠক' বসে। বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেনি। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করলেন। কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ সরকারের কূটনীতির চালে ভারতের তরফ থেকে হিন্দু-মুসলমানের কোন মিলিত যৌথ দাবি উপস্থাপিত করা গেল না। গান্ধীজি বিফল হয়ে দেশে ফিরলেন।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এই সুযোগে এক 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সিদ্ধান্ত করলেন যাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ চিরস্থায়ী হয়। আইনসভায় মুসলমান ও হিন্দু তপশীল সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকল, পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হল এবং সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি কায়েম হয়ে গেল। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন ডাঃ আম্বেদকর। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সঙ্গে 'পুণা চুক্তি' সম্পাদন করে সাময়িক ভাবে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে চেষ্টা করলেন এবং রাজনীতি থেকে সরে এলেন। ১৯৩২-৩৫, এই কয় বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট মুসলীম লীগের অভ্যুত্থান, কংগ্রেস দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত এবং ভারত আইন, ১৯৩৫। মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি কয়েক বছর আগেও কংগ্রেসের সহযোগিতা করেছিলেন, তিনিই এখন ঘোষণা করলেন, হিন্দু মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। এই সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবিও পেশ করা হল।

বিপ্লবী আন্দোলন ঃ গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ ব্যর্থ হল দেখে বিপ্লবীরা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। লক্ষ্ণৌতে এই রকম একটি সংস্থা গঠিত হয় এবং সেই দলের কয়েক ব্যক্তি কাকোরির কাছে ট্রেনে ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়েন (১৯২৫)। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাকে **কাকোরি ষড়যন্ত্রের মামলা** বলা হয়। এর পরে বিখ্যাত **মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা**। এর মধ্যে যাঁরা জড়িত ছিলেন, তাঁরা বামপন্থী। ১৯২৮ সাল থেকে কৃষক শ্রমিকদের অসন্তোষ বাড়তে থাকলে বামপন্থী বিপ্লবীরা সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করেন। ১৯২৯ সালে বামপন্থী নেতাদের ধর-পাকড় করা হয় এবং দীর্ঘ চার বছর বিচারের পর তাঁদের বেশির ভাগ দণ্ডিত হন।

আর একটি বিপ্লবী দল ভারতে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠনের চেষ্টায় বিপ্লবের পথে নামে। এই দলের ভগৎ সিং লাহোরের এক পুলিস সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেন এবং কয়েক মাস পরে তিনি ও তাঁর সঙ্গী বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর আইনসভাকক্ষে দুটি বোমা ফেলেন কিন্তু পালাবার চেষ্টা করেন নি। এটি **লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা** নামে খ্যাত। অনেক বিপ্লবীকে ধরা হয় এবং বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর খুব দুর্ব্যবহার করা হয়। তারই প্রতিবাদে যতীন দাস অনশন করেন এবং দীর্ঘ ৬৪ দিন পরে মৃত্যু বরণ করেন। ভগৎ সিং-এর সঙ্গে আরও দু জনকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হয়। আর এক বিশিষ্ট বিপ্লবী ছিলেন **চন্দ্রশেখর আজাদ**। ১৯৩১ সালে এলাহাবাদের কাছে পুলিস সংঘর্ষে তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রশেখর ছিলেন উত্তর ভারতে বিপ্লবী কাজকর্মের কর্ণধার।

বাঙলায় বিপ্লবীদের কথা ঃ বাঙলায় বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বড় দুঃসাহসিক ঘটনা **চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন** (১৯৩০, ১৮ এপ্রিল)। **সূর্য সেন** বা মাস্টারদার পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুঠ করে বিপ্লবীরা সেই সব হাতিয়ার ছড়িয়ে দেবে। ১৯৩০ সালে সূর্য সেন টিলার উপর অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন, সঙ্গে ছিলেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ। চারদিন ধরে অস্ত্রাগার দখল করে বিপ্লবী সৈন্যরা যে সাহসে ও বিক্রমে লড়াই করেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে। সূর্য সেন তিন বছর পালিয়ে বেড়ান, শেষ কালে ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়। এই দলে বিপ্লবী নারী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন **প্রীতিলতা ওয়াদেদার**। তিনি গ্রেপ্তার হবার আগেই আত্মহত্যা করেন। আরও দুই বাঙালী মেয়ের নাম করতে হবে—**কল্পনা দত্ত** ও **বীণা দাস**, যিনি বাঙলার গভর্নরকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন।

এই ভাবে ঢাকায় মেদিনীপুরে ও কলকতায় ১৯৩০-৩৩ সালের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ রাজকর্মচারী বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। ঢাকার পুলিস কর্তা লোমান সাহেব বিনয় বসুর হাতে প্রাণ হারালেন (১৯৩০)। এর কয়েক মাস পরে **বিনয়** ও তাঁর দুই বন্ধু **বাদল** এবং **দীনেশ গুপ্ত** একত্রে কলকাতায় চলে আসেন এবং রাইটার্স বিল্ডিং এ প্রবেশ করে জেলবিভাগের কর্তা সিম্পসনকে হত্যা করেন। তিনজনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, বাদলের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পরে বিনয় হাসপাতালে মারা যান, দীনেশ সেরে উঠলে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এর পর মেদিনীপুরে পর পর তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট পেডি ডগলাস ও বার্জ সাহেবকে হত্যা করা হল। কলকাতার ধুরন্ধর পুলিস কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে একাধিকবার মারবার চেষ্টা হয় কিন্তু সফল হয় নি। বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় অনেক ইংরেজ আহত বা নিহত হন।

শেষ সংগ্রাম ঃ 'ভারত আইন' পাশ হলে ১৯৩৬-৩৭ সালে নতুন নির্বাচন হয়। তাতে পাঞ্জাব ও বাঙলা ছাড়া আর সব কটি প্রদেশে কংগ্রেস জয়লাভ করে মন্ত্রিত্ব গঠন করে। মুসলিম লীগ কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়ী হতে পারে নি। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল ও নৈরাশ্যজনক হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ১৯৩৯

সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী অনেককে সশস্ত্র আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, তারপর কংগ্রেসের নেতৃত্বে শেষ বারের মত মুক্তি-সংগ্রামে নামলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার তখন পশ্চিম জার্মানি আর পূর্বে জাপানকে রুখতে যথেষ্ট বিব্রত। তাই তাঁদের কাছে ভারতের অর্থ ও সৈন্য সাহায্য খুব জরুরী হয়ে পড়ে। অথচ ভারতের শাসন-অধিকার দিতে তাঁরা নারাজ। তিন তিন বার তাঁরা শাসন-আইন আনেন কিন্তু কোন বারই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গ্রাহ্য হয় নি। তাঁদের এক কথা—ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন কার হাতে। ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে চলে গেলে হিন্দুদের কর্তৃত্বে মুসলমানদের স্বার্থ অধিকার বজায় থাকবে না এবং দেশীয় রাজা-মহারাজাদের সঙ্গে সরকারের যে সব বিশেষ সন্ধি চুক্তি আছে সেগুলি স্বাধীন ভারত সরকার মানতে চাইবে না।

সাইমন থেকে ক্রিপ্‌স সাহেব পর্যন্ত অনেকেই বিলাতের দূত হয়ে এলেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার ও কংগ্রেস, উভয় পক্ষের কোন প্রস্তাবই মনঃপূত হল না। ইংরেজ সরকারের প্রশ্রয়ে এবং হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর অবিশ্বাসে 'মুসলিম লীগ' ইতিমধ্যে জোরদার হয়ে উঠেছিল এবং তার নেতা ও মুখপাত্র জিন্না সাহেবের জেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস, বিশেষ করে গান্ধীজি মুসলমান সম্প্রদায়কে তুষ্ট করার জন্য অনেক আপসের চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু ব্যর্থ হন। জিন্নার বক্তব্য ও যুক্তি হল: হিন্দু ও মুসলমান এক নয়, দুই পৃথক জাতি। তাদের ধর্ম কর্ম সমাজ আচার ও শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় কংগ্রেসে সংখ্যায় ভারী হিন্দুদের সর্বময় প্রাধান্য। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, পাঞ্জাব সিন্ধু-বেলুচিস্তান ও বাঙলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি। এতএব জিন্না সাহেব চাইলেন, ঐ সব প্রদেশ একত্র ভাবে **'পাকিস্তান'** নাম নিয়ে মুসলমানদের নিরাপদ ও স্বাধীন বাসস্থান বলে নির্দিষ্ট হোক। অর্থাৎ ভারত ছেড়ে, পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হোক।

ভারতীয় নেতারা অবশ্য জিন্নার এই দাবি মানেন নি, বার বার প্রতিবাদ করেছেন। ভারতকে ভেঙ্গে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র করার বিপক্ষে শুধু গান্ধীজি নন, বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারাও ছিলেন যেমন সীমান্ত গান্ধী ও আবুল কালাম আজাদ।

এদিকে গান্ধীজির বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা দক্ষিণপন্থী আর ইংরেজ বিতাড়নের সপক্ষে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থী দলের মধ্যে মতান্তর প্রকট হতে থাকল। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী অধিবেশনে গান্ধীজির মনোনীত ডাঃ পট্টভিকে হারিয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে পদত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতে সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে এক স্বতন্ত্র দল গঠন করলেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ আর কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি, এই অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ। সেই উপযুক্ত লগ্নে সকল দলের মিলিত চেষ্টায় ব্রিটিশকে শেষ আঘাত হানার পরম সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান দক্ষিণপূর্ব এসিয়ায় রণক্ষেত্রে ক্রমাগত

জয়লাভ করতে থাকে, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন বুঝে ইংরেজ সরকার ভারতের বন্ধুত্ব ও সাহায্যলাভের চেষ্টা করেন। সেই উদ্দেশ্যে একটি নতুন শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা দিয়ে বিলাত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে পাঠানো হয়। এই দৌত্যই **ক্রিপস মিশন** নামে খ্যাত। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, কারণ অবিলম্বে স্বাধীনতা দানের কোন উল্লেখ ছিল না। এই ঘটনার কয়েকমাস পরেই ১৯৪২ সালে আবার প্রবল আন্দোলন সুরু হল। গান্ধীজি দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ভারত সরকারকে বললেন আগে ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাক। ভিতরকার বোঝাপড়া ভারতবাসীরা নিজেরাই



করবে। দেশ এক, স্বাধীনতার পর ভারতই ভারতের সমস্যা সমাধান করবে। একেই বলা হয় **'ভারত ছাড়ো'** (Quit India) আন্দোলন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব **'আগস্ট বিপ্লব'** এর নেতারা আগেই আটক হলেন, কয়েদ হলেন অসংখ্য কর্মী। এই বিপ্লবে ইংরেজদের হটানোর জন্য সারা দেশে তুমুল

উত্তেজনা ও প্রচেষ্টা চলে। যাঁদের ধরা যায়নি, তাঁরা তলে তলে ও আড়াল থেকে বিপ্লব চালাতে থাকেন। সশস্ত্র ব্রিটিশ বাহিনী তাঁদের দমন করতে পারল না। অনেক রেল সেতু ভেঙে দেওয়া হল, স্থানে স্থানে রেল লাইন তুলে ফেলে সৈন্য চলাচল বন্ধ করা হল। ডাকঘর, টেলিগ্রাফ লাইন, থানা ও সরকারী অফিসে হানা দিয়ে সেগুলি দখল বা নষ্ট করা হল। মেদিনীপুর তমলুক অঞ্চলে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও এই রকম ঘটনা ঘটে। কয়েক জায়গায় স্বাধীন সরকার চালু করা হয়। বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখন বাঙলা দেশে মানুষের তৈরি এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। একেই বলা হয় **পঞ্চাশের মন্বন্তর**, অবশেষে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং জার্মানি ও জাপান উভয়েই পরাস্ত হল। তখন চেষ্টা চলতে লাগল যাতে ভারতের রাজনীতিতে অচল অবস্থার অবসান হয়। গান্ধীজি কারামুক্ত হয়ে কয়েক বার জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন কিন্তু কথাবার্তায় কোনো ফল হল না। জিন্না উদ্ধত মনোভাব নিয়ে কঠিন পণ ধরে থাকলেন। তখন বড়লাট ওয়াভেলের উদ্যোগে দুই পক্ষ **সিমলা বৈঠকে** মিলিত হলেন কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না।

এদিকে সুভাষচন্দ্রকে তখন তাঁর বাড়িতে আটক রাখা হয়েছে। তাঁর কার্যকলাপের উপর সরকার কড়া নজর রেখেছেন। কিন্তু তারই মধ্যেই ১৯৪১ সালে তিনি অদৃশ্য হলেন তারপর ভারত সীমানা পার হয়ে তিনি প্রথমে গেলেন জার্মানিতে সেখান থেকে পূর্ব এসিয়ায়। এইখানে তিনি জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে **আজাদ হিন্দ বাহিনী** ও সরকার গঠন করেন। প্রথমটা জাপানের সাহায্য লাভ করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধনে দৃঢ় সংকল্প করেন। 'দিল্লী চলো' এই ধ্বনি তুলে সুভাষচন্দ্র সসৈন্যে মণিপুরের পথে ভারত সীমান্তে প্রবেশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিফল হয়ে ফিরে যান। পূর্ব এসিয়া অঞ্চলে তিনি নেতাজী নামে খ্যাত। সেই নেতাজীর সাহস ও বীরত্ব, সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্ব এবং অবশেষে বিমান-দুর্ঘটনা সকলেই জানো। তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের রাজদ্রোহী অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও রশীদ আলির কারাদণ্ড নিয়ে কলকাতায় বিশাল মিছিল বার করা হল। সেই প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে বোম্বাইয়ে বাধল নৌ-বিদ্রোহ। সরকার বুঝতে পারলেন, এ ভাবে বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতীয়দের শাসনাধীন রাখা যাবে না। ভারতীয় সমস্যার নিষ্পত্তির জন্য তখনকার প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে একটি দৌত্য পাঠালেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, এ. ভি. আলেকজাণ্ডার ও ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে নিয়ে এই **ক্যাবিনেট মিশন** গঠিত হয়। মিশনের সভ্যরা সরাসরি 'পাকিস্তান' প্রস্তাব সমর্থন করলেন না কিন্তু বললেন, ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

হবে তার মধ্যে থাকবে (১) ব্রিটিশ ভারতভুক্ত হিন্দু প্রধান প্রদেশ, (২) মুসলিম প্রধান প্রদেশ এবং (৩) আসাম ও বাঙলা যেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা জায়গায় জায়গায় কমবেশি। এই তিন শ্রেণী আর দেশীয় রাজ্যগুলি একত্র হয়ে ভবিষ্যং যুক্ত রাষ্ট্রের একটা খসড়া তৈরি করবে। ইতিমধ্যে প্রধান দলগুলির প্রতিনিধিরা একটি **অন্তবর্তী সরকার** (Interiem Government) গঠন করবেন। বাঙলা ও আসামকে আলাদা শ্রেণীতে রাখার অর্থ পরিষ্কার। পাকিস্তানকে খোলাখুলি স্বীকার না করে বাঙলাকে দু'ভাগ করার অভিসন্ধি বোঝা যায়।

ক্যাবিনেট মিশরের সর্তগুলির মধ্যে অনেক জট ছিল, বৃটিশ কূটনীতির চাল। মুসলীম লীগ বলল, ভারত ছাড়ো কিন্তু দেশ ভাগ করে দিতে হবে। জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার চালু হল বটে কিন্তু মুসলীম লীগের ক্রমাগত বাধা দানে তা এমন বিফল হয়ে পড়ল যে ভারত বিভাগ ছাড়া দ্বিতীয় পথ রইল না। মহাত্মা গান্ধী, সীমান্ত গান্ধী, প্রমুখ দেশনেতারা ভারতের এই নির্মম ব্যবচ্ছেদের ঘোরতর আপত্তি করেন কিন্তু জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগের কার্যকলাপের চাপে সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু এবং অন্য নেতারা বাধ্য হয়ে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

অতঃপর **ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেডেন্স অ্যাক্ট** অনুসারে ১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুটি 'ডোমিনিয়ন' বা অধিরাজ্য রূপে জন্ম নিল। ভারত ডোমিনিয়নের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হলেন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন ও তার পরে শ্রীরাজাগোপালাচারী। প্রথম প্রধান মন্ত্রী হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। আর জনাব মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে কার্য-ভার গ্রহণ করলেন। ভারতের নতুন সংবিধানে গভর্ণর-জেনারেলের পদ উঠিয়ে দিয়ে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে প্রথম প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্র-পতির পদে বসানো হয়। স্বাধীন ভারত একটি সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হল ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি। ভারতে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হল কিন্তু ইংরেজের আনুগত্য ছেড়ে দিয়েও ভারত কমনওয়েলথের সদস্য রইল। পাকিস্তানও পরে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পরিণতি ও ইতিহাস।


জওহরলাল নেহরু

এক নজরে

* ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন দেশের সর্ববরেণ্য নেতা। তারই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা আন্দোলন সুদীর্ঘকাল চালিত হয়েছে।
* ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট গান্ধীজি তাঁর অহিংস অসহযোগ নীতি ঘোষণা করেন এবং ঐ দিন থেকে ভারতব্যাপী ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শুরু হয়।
* ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেস ব্যক্তির ও জনগণের আইন অমান্য আন্দোলনেয় প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজির ইচ্ছাক্রমে পশ্চিম ভারতে বরদোলিতে গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু হিংসাত্মক কাজের জন্য গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন।
* অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গঠিত হয়।
* ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাই শহরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হয়। এর ফলে শ্রমিকরাও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়।
* ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে স্থির হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন ও লক্ষ্য।
* ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজ এবং ২৬শে জানুয়ারি পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণের দিন ধার্য হয়।
* ১৯৪২ সালে শুরু হয় অগস্ট বিপ্লব ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
* ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু অদৃশ্য হলেন। তারপর ভারত সীমানা পার হয়ে গেলেন জার্মানিতে, সেখান থেকে পূর্ব এসিয়ায়। তিনি জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও স্বেচ্ছাবাহিনী নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী সরকার গঠন করে ভারতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।
* ইংরেজ সরকার বিব্রত হয়ে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। এবং এই উদ্দেশ্যে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় হিসেবে এদেশে প্রেরণ করে।
* অতঃপর ভারতের স্বাধীনতা আইন অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়ন বা অধিরাজ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কত খ্রীস্টাব্দে রাওলাট আইন পাশ হয় ? * মণ্টেগু কে ছিলেন ? * চেমসফোর্ড কে ছিলেন ? * মণ্টেগু ও চেমসফোর্ড মিলে যে শাসন সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করেন তাকে কি বলে ? * মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কত দিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিত হয়েছে ? * জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর কে গুলি চালিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন ? * রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেছিলেন ? * গান্ধীজি কোন নীতির উপর ভিত্তি করে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ? * খিলাফৎ আন্দোলন কত খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয়েছিল ? * গান্ধীজির গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন কোথায় শুরু হয়েছিল ? * চৌরিচৌরা কোথায় ? এখানে কি ঘটনা ঘটেছিল ? * কাদের নেতৃত্বে স্বরাজ্যদল গঠিত হয়েছিল ? * লাহোর কংগ্রেসে কি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ? * কত সালে আগস্ট বিপ্লব ও ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়েছিল ? * গান্ধীজি কত খ্রীস্টাব্দের কোন তারিখে লবণ আইন ভঙ্গ করেন ? * আব্দুল গফর খাঁ কে ছিলেন ? * খোদা-ই-খিদমৎকার কি ? * সীমান্ত গান্ধী বলতে কাকে বোঝায় ? * গান্ধী-আরউইন চুক্তি কত খ্রীস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? * ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ছিল ? * ডঃ আম্বেদকর কে ছিলেন ? * পুনা চুক্তি কি ? কাদের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ? * কাকোরি ষড়যন্ত্রের মামলা কি ? * লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা কাকে বলে ? * চন্দ্রশেখর আজাদ কে ছিলেন ? তার কি ভাবে মৃত্যু হয় ? * কত খ্রীস্টাব্দের কত তারিখে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছিল ? * চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক কে ছিলেন ? * বিপ্লবী নারীকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম বল ? * মহম্মদ আলি জিন্না কে ছিলেন ? তাঁর পাকিস্তান দাবীর যুক্তি কি ? * ক্রিপস্ মিশন কাকে বলে ? * ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অর্থ কি ? * পঞ্চাশের মন্বন্তর কাকে বলে ? * সুভাষ বসু কখন দেশত্যাগী হয়েছিল ? * সুভাষ বসু কি ভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন ? * ক্যাবিনেট মিশন কাকে বলে ? কোন কোন সদস্য নিয়ে এই মিশন গঠিত হয়েছিল ? * ভারতবর্ষ কবে কি ভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল ? * স্বাধীন ভারত কবে প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান নেতা কে ? তাঁর কর্মনীতি আলোচনা কর।

২। রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতীয়দের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ?

৩। খিলাফৎ আন্দোলন কি তা বুঝিয়ে বল ? গান্ধীজি কিভাবে এই আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন ?

৪। গান্ধীজি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কখন শুরু করেছিলেন? এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

৫। মহাত্মা গান্ধী আকস্মিক ভাবে অসহযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন কেন?

৬। স্বরাজ্য দল কারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? এই দলের উদ্দেশ্য কি ছিল?

৭। গান্ধীজির লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।

৮। গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে আব্দুল গফর খাঁর ভূমিকা কি ছিল?

৯। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্ডোল্যাণ্ড-এর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার' সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা কর।

১০। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে জিন্নার ভূমিকা আলোচনা কর।

১১। কি পরিস্থিতিতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ভারতে ক্রিপসমিশন প্রেরণ করেছিলেন? এই মিশনের উদ্দেশ্য কি ছিল? এই মিশন কি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল?

১২। ভারত ছাড়ো প্রস্তাবটি কি? ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৩। আগস্ট বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

১৪। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভূমিকা আলোচনা কর।

১৫। ১৯৪৭ সালে কোন আইন পাশ হয়? ঐ-আইন দ্বারা ভারতে কি শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়? ১৯৫০ সালে ভারত কি রাষ্ট্রে পরিণত হলো?

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। আইন অমান্য আন্দোলনের কারণ কি? এই আন্দোলনের বিবরণ দাও।

২। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা কি ভাবে হয়? দিল্লী চলো—এ আহ্বান কে দেন? আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের জনমনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল?

৪। কি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং কি ভাবে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

দুই-এক কথায় উত্তর দাও:

(ক) গান্ধীজি কত খ্রীস্টাব্দে ভারতের রাজনীতিতে যোগদান করেন?

(খ) অসহযোগ আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(গ) সাইমন কমিশন কবে গঠিত হয়?

(ঘ) আইন অমান্য আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(ঙ) ফরওয়ার্ড ব্লক কবে গঠিত হয়েছিল?

(চ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন কবে শুরু হয়েছিল?

(ছ) সীমান্ত গান্ধী কাকে বলে?

(জ) আজাদহিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?

(ঝ) ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে?

ব্যবহারিক অনুশীলন

[এক]

নিচের ছবির বাঁদিকের ছকে ভারতের মুক্তি যুদ্ধের প্রধান তিন সৈনিকের চিত্র-পরিচিতি দেখ এবং ডান পাশের শূন্যস্থানে স্বাধীনতা আন্দোলনে এঁদের প্রধান প্রধান ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ ঃ









এখানে চীন বিপ্লবের পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে বলছি। ১৯১১ সালে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয় তা সফল হয়নি। ১৯১৬ সালে সামরিক নায়কদের (War Lords) হাতে ক্ষমতা এসে গেলে ভিতরকার গোলযোগ বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় চীনের প্রসিদ্ধ নেতা **সান-ইয়াত-সেন** জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল 'কুয়োমিন্‌টাঙ' (Kuomintang) দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে (১৯১৭)। সান-ইয়াত-সেনের আশা ও আদর্শ সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু জাতীয় ঐক্য গঠনে তাঁর মহৎ প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন জার্মানির বিপক্ষে ছিল, কিন্তু যুদ্ধ শেষে শান্তি বৈঠকে চীনের ন্যায্য দাবীগুলি যখন গ্রাহ্য হল না তখন বোঝা গেল মিত্রপক্ষ চীন-আক্রমণকারী জাপানের সমর্থক। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করার জন্য সান-ইয়াত-সেনের প্রজাতন্ত্রী সরকার পশ্চিমী রাষ্ট্রদের কাছে কোনও সহানুভূতি ও সুবিচার পেল না। ব্যর্থতা ও হতাশায় সমগ্র চীনে বিক্ষোভ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় (**৪ঠা মে আন্দোলন**)। চীনের অক্ষম কেন্দ্রীয় সরকার এই অরাজকতা থামাতে পারে নি।

চীনের জাতীয় গণ-আন্দোলনে রুশ বিপ্লবের প্রভাব সুস্পষ্ট। সান-ইয়াত-সেন নিজে ঐ বিপ্লব থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সোভিয়েত দূতের আলাপ আলোচনার ফলে ঘোষণা করা হয় যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সোভিয়েট রাশিয়া চীনকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে। এর পর বোরোদিন (Borodin) নামে এক বিচক্ষণ সাম্যবাদী প্রতিনিধি চীনে আসেন এবং কুয়োমিনটাঙ দলটিকে পুনর্গঠনে সাহায্য করেন। এখন চীনের সাম্য-বাদীরা এই দলের সদস্য হয়। সান-ইয়াত-সেনের তিনটি মূল নীতি—**জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের জীবিকার উন্নতি**, কুয়োমিনটাঙ দল গ্রহণ করে এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে। জাতীয় মর্যাদা ও অধিকার পুনরুদ্ধার করার জন্যে এই আন্দোলনে চীনের ছাত্র সমাজের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বিদেশীদের চীনে অতি রাষ্ট্রিক অধিকার ও অসমান সন্ধি-চুক্তিগুলি নাকচ করা ছিল আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। এখন সাংহাই শহরে জাপানের একটি মিল-এ যখন ধর্মঘট হয় (১৯২৫) তখন ছাত্ররা শ্রমিকদের পক্ষ সমর্থন করে এগিয়ে এলে ইংরেজ পুলিস কর্মচারী তাদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ফলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় এবং পাশ্চাত্য বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ক্যাণ্টন পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় চীনের এই জাতীয় চেতনার পিছনে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং স্ত্রীলোকের সামাজিক মুক্তি কাজ করেছিল। কিন্তু ১৯২৫ সাল

শুরু হয়। ক্রমে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করে এবং অনেক বছর স্থায়ী হয়। একদিকে কুয়োমিনটাঙ-কমিউনিস্টদের মধ্যে এই ক্ষমতা লড়াই অপর দিকে ১৯৩৬-৩৭ থেকে জাপানের চীন আক্রমণ চলছিল। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ। এই সময়ে লিয়ান-ফোতে চিয়াংকে গ্রেপ্তার করে তাঁর দলের লোক। বুঝিয়ে দেয়, জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে গৃহযুদ্ধ থামিয়ে চীনকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

সাম্যবাদী বিপ্লব (১৯৪৯)ঃ পূর্বেই বলেছি কুয়োমিনটাঙ ও কমিউনিস্ট দল গণতন্ত্রী সমাজ গঠনের জন্য কিছুকাল একসঙ্গে কাজ করে, কিন্তু ১৯২৭-২৮ সাল থেকে দলবিভেদ সৃষ্টি হয়। চিয়াং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিলেন। সাংহাইতে তাদের নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে তিনি নানকিংএ সরে এলেন এবং একটি ইস্তাহারে সাম্যবাদীদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করার জন্য তাঁর দলকে নির্দেশ দিলেন। চিয়াং এখন বিপক্ষ দলকে সমূলে বিনষ্ট করতে প্রস্তুত হলেন। কমিউনিস্টদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের হত্যা করতে লাগলেন। এইভাবে চিয়াং কাই-শেক সাম্যবাদীদের উপর নির্মম অত্যাচার করে তাদের হটিয়ে দিতে নিজের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়াতে থাকেন। চিয়াং পিকিং দখল করে উত্তর-চীনে কমিউনিস্টদের সরকার বাতিল করলেন এবং মাঞ্চুরিয়াকে চীনের সঙ্গে যুক্ত করে দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন। চীন সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হল। কিন্তু কমিউনিস্ট দলের সংগ্রাম বন্ধ হয় নি। চিয়াং সরকারও তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যান। চারবার আক্রমণ ব্যর্থ হলে চিয়াং কমিউনিস্ট অধিকৃত অঞ্চলগুলি দখল করার জন্য পঞ্চম অভিযানে সফল হলেন। এখন সাম্যবাদীরা তাদের ঘাঁটি ছেড়ে চীনের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে কমিউনিস্ট সেনা বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। মাও এবং সেনাপতি চু-তের নেতৃত্বে লালফৌজ অবশেষে গন্তব্যস্থল পৌঁছাল (১৯৩৩-৩৪)।

এই দুই দুস্তর অভিযান (**লঙ মার্চ**) এক ঐতিহাসিক কীর্তি। পথে ২৪টি নদী, ১৮টি পর্বতমালা অতিক্রম করে আর শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বহু কষ্ট ও বাধার মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছিল। চীনের মত বিশাল দেশে ৬০০০ মাইল পদযাত্রা যেন এক মহাকাব্যের কাহিনী।

কমিউনিস্ট দল ইতিমধ্যে বিতাড়িত হয়ে কিয়াংসি প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানেই ভবিষ্যতের বিপ্লবী নেতা মাও সে-তুং তাঁর মতবাদ প্রচার করেন ও সাম্যবাদের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক গঠন-পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দক্ষিণ প্রদেশে মাওসে-তুং ও চু-তে কৃষকদের পূর্ণ সমর্থন পান এবং তাদের সংঘবদ্ধ করে তাদের স্বার্থকল্যাণে ১৯৪৪ সালে ইয়েনান প্রদেশে ভূমি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। তিনি বলেন, কল-কারখানার শ্রমিক শ্রেণীর বদলে কৃষক-সমাজের দ্বারাই চীনে সাম্যবাদের সফলতা ও প্রতিষ্ঠা হতে পারে। চীন হল কৃষিপ্রধান দেশ, সেখানে সংঘবদ্ধ শক্তিশালী শ্রমিকদল ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনের সাম্যবাদী বিপ্লবকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা চলে। যুদ্ধ থামলে চীন পরাজিত জাপানের কাছ থেকে অধিকৃত অঞ্চলগুলি

ফিরে পায় কিন্তু শীঘ্রই আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়ের সমর্থিত চিয়াং কাই-শেকের সরকারের কঠোর দমনে জনসাধারণের দৈন্য দুরবস্থার অন্ত ছিল না। চিয়াং কাই-শেক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদ পেয়েও কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন পেয়ে অবশেষে কমিউনিস্ট দলই জয়লাভ করতে থাকে। তখন চিয়াং কাই-শেক দেশ ছেড়ে ফরমোসা দ্বীপে (তাইওয়ান) পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং আমেরিকার আশ্রয়ে সেখানে জাতীয় চীন সরকার নামে মাত্র বজায় রাখেন। ১৯৪৯ সালে ১লা অক্টোবর চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লব বহু বছর প্রস্তুতির পর সফল হল। দেশে সাম্যবাদী দল People's Republic of China বা চীনের প্রজাতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠা করল, এবং কয়েক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল। মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে পাঁচবছর নিয়ত সংগ্রামের পর চীনের সর্ববিধ দাসত্ব মোচন ও পুনরুজ্জীবন সম্ভব হল। ১৯৫৩ সালে জনগণের প্রজাতন্ত্রে সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত একটি আইনসভা ('জনগণের কংগ্রেস') গঠিত হয়। জমিদারী প্রথা ও ব্যক্তিগত স্বত্ব লোপ পেল, শিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হল। পুরনো দিনের সমাজ গঠন ও অর্থ-ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫৩-৫৭) অনুসারে নতুন যুগের সূত্রপাত করে।



বক্তৃতারত মাওসে-তুং

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব :: ইন্দোচীন : দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে তিনটি পাশ্চাত্ত্য শক্তি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড তাদের সাম্রাজ্য পেতেছিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডটির মধ্যে ছিল ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীন, হল্যাণ্ড-অধিকৃত ইস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ (যার আধুনিক নাম ইন্দোনেশিয়া) এবং ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশ মালয় অঞ্চল ও সিঙ্গাপুর। ইন্দোচীনে ফরাসীরা প্রথমে কোচিন-চীনে উপনিবেশ স্থাপন ও শাসন করে। ক্রমে তারা আনাম, টংকিং, কাম্বোডিয়া ও লাওস এই চারটি রাজ্যকে কোচিন-চীনের সঙ্গে যুক্ত করে সমগ্র অঞ্চলটি তাদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। এদের মধ্যে আনামের অধিবাসীরাই ছিল সবচেয়ে শক্ত সমর্থ, এবং তাদের জাতীয়তাবোধ ছিল তীব্র। রুশ-জাপানের যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে চীনের বিপ্লব তাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের কাছ থেকে কোনো রাজনৈতিক সুবিধা পেল না দেখে আনামে একটি কমিউনিস্ট প্রভাবিত জাতীয় দল গঠন করা হয়। ১৯৩০ সালে বিপ্লবী সাম্যবাদের প্রথম আবির্ভাব হল। এই জাতীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন **হো-চি-মিন**। মস্কোতে পড়াশুনো করতে গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট মত ও আদর্শে দীক্ষিত হন। বিদ্রোহ দমন করা হলে **হো-চি-মিন**

হংকং-এ পালিয়ে যান, সেখানে গ্রেপ্তার হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এরপর ১৯৩৯ সালে তিনি ভিয়েতনাম ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগ' (স্বাধীনতা সংঘ) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোচীনের রাজনীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে যখন জার্মানির হাতে ফ্রান্সের পতন হল তখন জাপান ইন্দোচীন অধিকারের মস্ত সুযোগ পেয়ে গেল। জাপান অবশ্য ফরাসীদের অধিকার স্বীকার করে নি, তবে ফরাসী কর্তৃপক্ষ জাপানের নির্দেশ মেনে চলতেন। এদিকে **হো-চি-মিন** সুনির্দিষ্ট পথে কমিউনিষ্ট পার্টিকে সুগঠিত করে তুলছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী ও জাপানী উভয়কেই পরাস্ত করে সেখানে আনামীদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৪৫ সালে জাপানের পতন হলে **হো-চি-মিন** টংকিং-এর রাজধানী হ্যানয় অধিকার করলেন এবং আনাম ও কোচিন-চীনে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন জাপানীদের হাতের পুতুল সম্রাট **বাও দাই** পালিয়ে গেলেন। টংকিং, আনাম ও কোচিন-চীন এই তিনটি দেশ নিয়ে **হো-চি-মিন** ভিয়েতনাম রিপাবলিক নামে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইন্দোচীন থেকে ফ্রান্সের সরে আসার কোন মতলব ছিল না। জাপান আত্মসমর্পণ করলে ফরাসীরা যখন আবার ইন্দোচীনে ফিরে এল তখন দেখল যে এই নতুন বিপ্লবী সরকার সমস্ত দেশটিকে তাদের করায়ত্ত করেছে। অবস্থা সঙ্গীন বুঝে তারা ১৯৪৬ সালে **হো-চি-মিন**-এর সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত হল। কিন্তু ফরাসীদের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে **হো-চি-মিন** তাদের সর্তগুলি মেনে নিলেন না। তখন পালটা চাল হিসাবে ফরাসীরা সেই **বাও দাই** কে নামেমাত্র শাসকরূপে ফিরিয়ে আনল। বৃটেন ও আমেরিকা তৎক্ষণাৎ **বাও দাই** সরকারকে স্বীকৃতি দিল আর ওদিক থেকে কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়া ভিয়েতনামকে দিল পূর্ণ স্বীকৃতি। নিরুপায় হয়ে ফরাসীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করল আর **হো-চি-মিনও** চীনের কাছ থেকে নিয়মিত সামরিক সাহায্য পেতে থাকলেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে যে সংঘর্ষ বাধল সেটি প্রায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সামিল হল। ভিয়েতনামী সৈন্যরা গেরিলা রণ-নীতিতে সুদক্ষ ছিল তাই তারা একটির পর একটি ফরাসী সেনা নিবাস দখল করে অগ্রগতি বজায় রাখল। **দিয়েন বিয়েন ফ্যু** নামক দুর্গ নগরটি অধিকার করার জন্য দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালে **হো-চি-মিন**-এর বাহিনী জয়ী হওয়াতে সমগ্র অঞ্চলে তার প্রতিপত্তি অসম্ভব বেড়ে গেল এবং সংগঠনে কমিউনিজম্-এর প্রভাব ও শক্তি স্বীকৃত হল। এরপর **জেনেভা সম্মেলনে** ভিয়েতনাম প্রশ্নের সমাধান করা হল। ভিয়েতনামকে মোটামুটি ভাবে সপ্তদশ অক্ষরেখা ধরে বিভক্ত করে উত্তর ভাগ এল হো-চি-মিন-এর কমিউনিস্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণে আর স্থির হল দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাগ্য নির্ধারিত হবে দু বছর পর নির্বাচনের মাধ্যমে। এই ব্যবস্থায় ফ্রান্সের পুনরাধিকারের আশা ব্যর্থ হল। কাম্বোডিয়া আগেই স্বাধীন হয়েছিল। এখন লাওস ও কাম্বোডিয়া উভয়েই নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হল। কিন্তু এখানেই ভিয়েতনামের স্বাধীনতার ইতিহাস সমাপ্ত হল না। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিনদের অনুপ্রবেশ শুরু হল ঐ রাষ্ট্রের অভিভাবক রূপে। মার্কিনদের অস্ত্র সাহায্যে

দক্ষিণ ভিয়েতনাম **হো-চি-মিন** সরকারের সঙ্গে অনেক বছর সংঘর্ষে লিপ্ত হল। এই সময়ে উত্তর ভিয়েতনামে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মার্কিন সেনাবাহিনীর অত্যাচার চরমে উঠেছিল। কিন্তু দুঃসহ কষ্টের মধ্যে দিয়ে নানা নিপীড়ন, লোকক্ষয় ও অর্থনাশ সহ্য করে কমিউনিস্ট বাহিনী লড়াই করে চলল। অবশেষে পৃথিবীর জনমতের চাপে মানবিকতার জয় হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সৈন্য অপসারণ করতে হল। অতঃপর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম সংযুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড রাজ্যে পরিণত হল। এই দীর্ঘ সংগ্রামে ভিয়েতনাম-এর সৈন্যদল জনসাধারণ স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। আর কঠোর পরিশ্রমী, সাম্যবাদে একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা **হো-চি-মিন**-এর ভূমিকা ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

ব্রহ্মদেশ ঃ ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৬ সালে ব্রহ্ম রাজ্য অধিকার করে নিলে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশ হিসাবে দেশ শাসিত হতে থাকে। ভারত সীমান্ত রক্ষার জন্য ইংরেজ ব্রহ্মদেশ দখল করেছিল কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমে ভারত, উত্তরে মণিপুর ও আসাম সংলগ্ন পূর্বে চীন আর দক্ষিণে থাইল্যাণ্ড মালয় প্রভৃতি অঞ্চল, কাজেই এ রাজ্য আয়ত্ত করা দরকার হয়েছিল। ইংরেজদের শাসন শুরু হলে তাদের পিছু পিছু অনেক ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বাণিজ্য কোম্পানি ইত্যাদি প্রবেশ করল। এ ছাড়া অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী, এমন কি সাধারণ লোকও ভাগ্য সন্ধানে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে গুজরাট, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বাঙলা দেশের অনেক লোক ছিল। এরা কেউ সরকারী চাকরিজীবী, কেউ বা শিক্ষক। সুতরাং বর্মার অধিবাসীরা দেখল এদেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বেশি। মাদ্রাজের চেট্টিয়ার সম্প্রদায় টাকা লেন-দেন করে প্রচুর পয়সা কামায়, অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বর্মা থেকে অনেক টাকা রোজগার করে নিয়ে যায়। ইংরেজরা শাসকশ্রেণী, তাদের বর্ণ বৈষম্য নীতি ও অসদ্ ব্যবহার তো ছিলই। কিন্তু বর্মীদের ইংরেজ বিদ্বেষের চেয়ে ভারতীয় বিদ্বেষই ছিল বেশি কারণ অর্থনৈতিক শোষণ। এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে পেগুতে প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় (১৯৩০) এবং ক্রমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ দমন করা হল, কিন্তু বিক্ষোভ থেকে গেল।

১৯৩৫ সালে ভারত আইন দ্বারা বর্মাকে পৃথক করা হল ভারত থেকে, (১৯৩৭)। তার শাসনব্যবস্থা আলাদা করা হল ভারত বর্মার শিক্ষিত জনমত এই পৃথকীকরণের বিপক্ষে ছিল। কারণ সন্দেহ হল, ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, বর্মাকে পৃথক করে তাকে সেই রকম রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। এর কিছু পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কিন্তু সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এতে সন্দেহ বাড়ল এবং জাপান যখন বর্মা আক্রমণ করল তখন আগেকার বিপ্লবী 'তকিন' পার্টি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করল। জাপান তখন বর্মাকে স্বাধীন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি সপক্ষীয় মন্ত্রিসভা খাড়া করে ডকটর **'বা ম'কে'** নামেই প্রধান মন্ত্রী রূপে বসিয়ে দিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই বর্মীরা বুঝতে পারল জাপানীরা বর্মা

থেকে সুযোগ সুবিধাই আদায় করছে, তাদের প্রতিশ্রুতির দাম নাই। তার ফলে দেশের নানা জায়গায় জাপান-বিরোধী দল সৃষ্টি হল। এই দলগুলিকে একত্র করে জেনারেল আউং সান 'ফ্যাসি বিরোধী গণ স্বাধীনতার সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে জাপানীদের হটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। ১৯৪৫ সালে জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পন করলে ব্রিটিশ সরকার বর্মায় শাসন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল এবং স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিতে স্বীকৃত হল। কিন্তু আউং সান এই প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হলেন না। ১৯৪৭ সালে তিনি প্রতিনিধি দল নিয়ে বিলেত গেলেন। আলাপ আলোচনায় স্থির হল, ব্রহ্মদেশে সংবিধান রচনার জন্য একটি নির্বাচিত সভা দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। ১৯৪৮ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশ 'ইউনিয়ন অব বর্মা' নামে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হল। তবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর মধ্যে নয়। ইউনিয়নের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হল আসল ব্রহ্মদেশ এবং সান কারেন ও কাচিন উপজাতির রাজ্যগুলি। কিন্তু অন্তবর্তী সরকারের প্রধান আউং সান এবং ছয়জন সহকর্মীকে হত্যা করা হয় মন্ত্রীসভার এক বৈঠকে। বিপক্ষ দলের নেতা উ স'য় ষড়যন্ত্রে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে তাঁকে ও তাঁর সাতজন অনুচরকে মেরে ফেলা হয়।

এবার প্রধানমন্ত্রী হলেন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি, গণ-দলের নেতা উ নু। কিন্তু শাসনে দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা আনতে তাঁর যথেষ্ট সময় লাগল। কারণ দেশের উত্তর অঞ্চলে বিদ্রোহী কমিউনিস্টরা প্রবল হয়ে ওঠে। এর ওপর সংখ্যালঘু 'কারেন' রা নানাভাবে স্বতন্ত্রতার দাবি তুলে নতুন সরকারকে বিব্রত করে তুলল। উ নু এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করলেন। বর্মা কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল এবং 'কারেন' দের দাবি মেনে নিয়ে সংযুক্ত বর্মার মধ্যেই তাদের একটি স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া হল। উ নু-র সমর্থকরা ছিল সংখ্যায় বেশি কিন্তু ১৯৫৮ সালে অন্তর্ভেদী দলাদলি রোধ করার জন্য তিনি সেনানায়ক নে উইনকে শাসনভার দিলেন। এই সামরিক শাসনে সুফল দেখা গেল। ১৯৬০ সালে খোলাখুলি নির্বাচনের ফলে উ নুর দল জয়ী হলে নে উইন স্বেচ্ছায় তাঁর শাসন দায়িত্ব ফিরিয়ে দিলেন উ নু'র হাতে। ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতার কামনা ভারত ও চীনের জাতীয় আন্দোলন থেকে প্রেরণা পেয়েছিল ; তবে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয় নি। পঞ্চাশ ষাট বছরে ইংরেজ তার যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তেল ও খনিজাত দ্রব্য লুঠেছিল, ভারতীয়রা অনেক দিন অর্থনৈতিক শোষণ করেছিল আর দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় জাপানীরা অত্যাচার চালিয়েছিল। এই গুলিই বিক্ষোভের আসল কারণ।

মালয়েশিয়া : মালয় অঞ্চলে ছিল ব্রিটিশ আধিপত্য। এর মধ্যে ছিল সমগ্র মালয় উপদ্বীপ, কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ ও সিঙ্গাপুরে জোট এ যাবৎ সারা পূর্বাঞ্চলে বৃটিশদের শ্রেষ্ঠ নৌ-ঘাঁটি ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যখন দ্রুত গতিতে দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার ইংরেজদের এক একটি উপনিবেশ জয় করছিল তখন মালয় অঞ্চলও তার দখলে আসে। আর সিঙ্গাপুরের মত একটি সুদৃঢ় সুরক্ষিত বন্দর ও নৌবাহিনীকে জাপান অনায়াসে অধিকার করে নিল। জাপানের পরাজয়ে বৃটিশ সরকার ফিরে এলেন কিন্তু কর্তৃত্ব টিকল না। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীরা প্রবল হয়ে ওঠে এবং কমিউনিস্টরা অনেক জায়গা

করায়ও করে নেয়। যুদ্ধের পর মালয় স্বাধীন হল এবং সিঙ্গাপুর তার ক্ষুদ্র আয়তন সত্ত্বেও একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পেল। কিন্তু দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা শক্ত হল। সাম্যবাদী দলের প্রভাব বাড়তে লাগল এবং বিদ্রোহীরা জঙ্গলের আশ্রয় থেকে গেরিলা যুদ্ধ কৌশলে সরকারকে উৎখাত করল। তখন পাশ্চাত্য ঘেঁষা প্রধান মন্ত্রী টুংকু রহমান ইংরেজদের সাহায্য চাইলেন কমিউনিস্ট দমনের উদ্দেশ্যে। বার বার তিনি ব্যর্থ হন এবং এই নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ও সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সুকর্ণ এর নাম দিয়েছিলেন 'কনফ্রনতাসি' অর্থাৎ মুখোমুখি বিরোধ। যাই হোক, মালয়েশিয়া ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল। এবং সেখানে সাম্যবাদী বিদ্রোহীদের গেরিলা যুদ্ধ নীতি সফল হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়া ঃ সুমাত্রা, জাভা (যবদ্বীপ) বালি (বলিদ্বীপ) সেলিবিস ও শত শত দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রটি ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে প্রায় ৩,০০০ মাইল জুড়ে অবস্থিত। তিন শো বছরেরও আগে পোর্তুগীজ ও ইংরাজদের হটিয়ে ওলন্দাজ (ডাচ) বণিকরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। দীর্ঘকাল ডাচদের শাসনে থেকে এই দ্বীপ-সমষ্টি স্বাধীনতা পেল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইন্দোনেশিয়া এই নতুন নামে। এখানে ইসলাম ধর্মেরই প্রাধান্য, কেবল বলি দ্বীপে হিন্দুর সংখ্যা বেশি। ধর্মে মুসলিম হলেও হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ আজও বিদ্যমান। ডাচদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা মোটের উপর খারাপ ছিল না তবে এই অঞ্চলের বিচিত্র সম্পদ (চা. কফি, তেল, টিন প্রভৃতি) তারা চিরকাল শোষণ করেছে। অধিবাসীরা কোনও দিন স্বায়ত্ব শাসনের সুযোগ পায় নি। এদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ পেল ১৯০৮-২৬ সাল পর্যন্ত। একটি ইসলামী সংস্থা শ্রমিক সংঘের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করত। তারপর ডক্টর সুকর্ণর নেতৃত্বে একটি জাতীয় দল (ন্যাশনলিস্ট পার্টি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাচ সরকার অবশ্য এর কার্যকলাপ কমিউনিস্ট বলে কঠোর ভাবে দমন করে। সুকর্ণ ছাড়া ডক্টর হাত্তা ও অন্যান্য নেতাদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে হিটলারের আক্রমণে হল্যাণ্ড রাজ্য তার উপনিবেশগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইন্দোনেশিয়া ফ্যাসী-বিরোধী হিসাবে সাহায্যের প্রস্তাব দেয় কিন্তু ডাচ সরকার তা গ্রহণ করল না। ১৯৪১-এর শেষে জাপানীরা অতি দ্রুত গতিতে সমগ্র অঞ্চলটি অধিকার, করে নিল। সুকর্ণেরই নেতৃত্বে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে জাপান যেমন সহযোগিতা পেল, জাতীয় নেতারাও তেমনি শাসনব্যবস্থার পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও মজবুত করে নিল।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে জাপান যে ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র করে দেবে সে আশা নির্মূল হল। কারণ জাপান স্থানীয় লোকেদের বাধ্যতামূলক ভাবে খাটাত, জোর করে তাদের সৈন্যদলে ভর্তি করত এবং নানাভাবে অর্থনৈতিক শোষণ করত। তাই জাতীয় নেতাদের মধ্যে অনেকেই গা ঢাকা দিয়ে গোপনে প্রতিরোধ গঠনের কাজে লাগলেন এবং সফলও হলেন। জাপান পরাস্ত হয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দোনেশিয়া নিজ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র (ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিক) স্থাপন করে।

অচিরেই জাভা, মাদুরা, সুমাত্রা দ্বীপে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু গোলযোগ থামল না, কারণ য়ুরোপে যুদ্ধ শেষে হল্যাণ্ড জার্মানির কবল থেকে মুক্ত হলেও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তার একটা পাকা বন্দোবস্ত করা সম্ভব ছিল না। শেষে ডাচরা ফিরে এসে কর্তৃত্ব অধিকার করতে গিয়ে দেখল জাতীয় প্রতিরোধ অত্যন্ত প্রবল এবং তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুকাল সংঘর্ষ চলার পর ডাচ কর্তৃপক্ষ আইনতঃ স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল। 'লিঙ্গজাতি' চুক্তি অনুসারে (১৯৪৭) একটি বৃহৎ ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা সাব্যস্ত হল। তবু এই চুক্তি কার্যকর হল না। সুকর্ণ, হাত্তা প্রভৃতি নেতারা কারাগারে আবদ্ধ রইলেন। পণ্ডিত নেহরু সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৯ সালে দিল্লীতে একটি সম্মেলন ডাকলেন। প্রস্তাব করা হল রিপাবলিকান নেতাদের মুক্তি দিতে হবে। আর ডাচরা ইন্দোনেশিয়াকে যে অর্থনৈতিক অবরোধে সকল প্রকার আমদানী রপ্তানি বন্ধ করে রেখেছিল তা অবিলম্বে তুলে নিতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপে ইন্দোনেশিয়ায় সুদীর্ঘকালের বিদেশী শাসনের অবসান হল। ডক্টর সুকর্ণ হলেন নতুন স্বাধীন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং ডক্টর হাত্তা প্রথম প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু দলবিভেদ, স্থানীয় বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের ফলে ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি শৃংখলা ও স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা কঠিন হয়েছিল।

ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঐসব দেশে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ অনেক বছর ধরে জমে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির শাসননীতির রাজনীতির ক্ষেত্রে কঠোর দমন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্মম শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং উপনিবেশ জাতিগুলির মধ্যে মুক্তি কামনা জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে তীব্র হয়ে ওঠে। শুধু উপনিবেশই নয়, অন্যান্য পরাধীন জাতিও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবে নেমেছিল। চীনের মুক্তি-সংগ্রাম ছিল প্রথমে মাঞ্চু শাসনের বিরুদ্ধে, তারপর আক্রমণকারী জাপান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। য়ুরোপে স্বৈরতন্ত্র শাসিত রাজ্যগুলিতে, আফ্রিকা মহাদেশে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের অধীন উপনিবেশগুলিতে এবং অন্যান্য স্থানেও শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা ও চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই সব বিদ্রোহের সুযোগ করে দেয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি যখন যুদ্ধে লিপ্ত ও আত্মরক্ষার ব্যস্ত তখন পরাধীন দেশগুলির মধ্যে প্রবল উত্তেজনা জেগে উঠে এবং বিদ্রোহীরা সংঘবদ্ধ হয়ে জাতীয় আন্দোলন শুরু করে। তাই দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরেই ঐসব উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয় এবং কার্যত সফল হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই এক পরোক্ষ-সুফল।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান তো হল, এখন বড় সমস্যা হল কিভাবে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'র ভয়াবহ পরিণাম দেখে মানুষের মনে যুদ্ধ-বিতৃষ্ণা জাগে, জন্মায় স্থায়ী শান্তির কামনা। সুতরাং দ্বিতীয় মহাসমরের পরে যে স্থায়ী শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয় তার পরিকল্পনা নতুন নয়। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের পর য়ুরোপ শান্তির জন্য 'কনসার্ট অব য়ুরোপ'

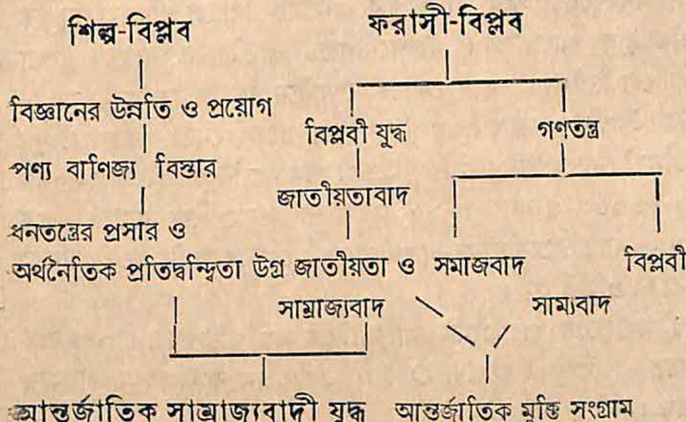
সৃষ্টি হয়, যদিও তা কার্যকর হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে লীগ অব নেশন্স প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ১৯৩৯ সালে তার অসারতা প্রতিপন্ন হল। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ হল যা ভবিষ্যতে সত্যই শান্তিরক্ষা করতে পারে এবং যুদ্ধ নিবারণের ব্যবস্থা নিতে পারে। পৃথিবীর সকল মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছা আর রাষ্ট্রনেতাদের সক্রিয় চেষ্টায় যে বিশ্বসংস্থা স্থাপিত হল (১৯৪৫), তারই নাম **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ**, (U. N. O.) ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চার্চিল বিখ্যাত 'আটলাণ্টিক চার্টার নামে যে সনদ ঘোষণা করেন, তাঁর মধ্যে আটটি সর্তে বিশ্বশান্তির উপায় নির্দিষ্ট করা হয়; পরাধীন রাজ্যগুলি স্বাধীনতা পাবে, অধিবাসীদের সম্মতি ছাড়া কোনও রাষ্ট্রের সীমানা বদল করা যাবে না, কোনও শক্তি রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হবে না, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল রাষ্ট্রের সম-অধিকার স্বীকৃত হবে এবং সামাজিক কল্যাণের জন্য জীবনযাত্রার মান ও শ্রমিকদের অবস্থা উন্নত করার জন্য রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হবে ইত্যাদি। সবসুদ্ধ ৪৫টি দেশ আটলাণ্টিক চার্টার মেনে নেয় ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করে।

আমেরিকায় সান ফ্রান্সিসকো শহরে এক সাধারণ সভায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার আরও কয়েকটি রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ঐ সনদে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বিস্তারিত ভাবে বলা আছে, যথা বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা গুলি মীমাংসা করে সকলের মৌলিক স্বাধীনতা স্বীকার, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার সমাধান, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে পৃথিবীর ছোট বড় সব জাতির প্রাপ্য মর্যাদা দান, আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি সন্ধি, আইন নিয়ম অনুসরণ সীমানা অলঙ্ঘন, পশ্চাৎপদ অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্য সমবেত দায়িত্ব পালন ও সাহায্য দান। বিশ্বশান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, জাতিপুঞ্জের আসল কাজ সেই চেষ্টা। কোনও কোনও স্থলে প্রচেষ্টা সফল, কোথাও বা বিফল হয়েছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্য নির্ভর করে যদি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি আন্তরিক ভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং শক্তিবৃদ্ধিকেই পরম লক্ষ্য করে পরস্পর ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়। পৃথিবীতে যেমন উন্নত দেশ আছে, তেমনি এখনও অনুন্নত দেশ আছে আর আছে উন্নতিকামী বা উন্নয়নশীল দেশ। সহনশীল ভাবে একত্র অবস্থান আর সহযোগিতার উপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করছে। আধুনিক যুগের যে ইতিহাস পড়লে তার মধ্যে ঐ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের কাহিনী অনেক পাবে। সতেরো আঠার শতক থেকে যে উপনিবেশ সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বাণিজ্যতন্ত্রের প্রসার তারই পরিণাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পরাধীন দেশের দাসত্ব মোচন, উপনিবেশ রাজ্যগুলির বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে সেই সব দেশবাসীর সংঘবদ্ধ চেষ্টায়, বিদ্রোহ সংগ্রামে। দেখা যাবে, গণ-অভ্যুত্থানের ফলেই স্বাধীনতা এসেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে সাম্রাজ্যবাদ এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ধুলিস্যাৎ হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ও

ও সমাজতন্ত্রের প্রভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের আদর্শ সামনে রেখে পীড়িত ও শোষিত দেশের মানুষরা বৃহত্তর সাম্রাজ্য শক্তির বিনাশ করেছে, য়ুরোপের বড় রাষ্ট্রগুলি তাদের পরাধীন উপনিবেশগুলিকে যে দমন ও শোষণ নীতির সাহায্যে গত এক শো' বছর ধরে শাসন করেছে, সে ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার নীতি এখন অচল। অবশ্য এখনও কোন কোনও দেশে, এমন কি স্বাধীন দেশেও সে নীতি ছদ্মবেশে কাজ করছে।

স্বাধীনতা যেমন পেতে হয়, তেমনি রক্ষা করতে হয়। তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকা দরকার। গণতন্ত্রের দেশেও দলগত স্বার্থ ও গোষ্ঠী শাসনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যাই হোক, সমাজের ভিতরকার চাপে অর্থাৎ অভাব দৈন্য, ন্যায্য অধিকার বঞ্চনা ইত্যাদি সমাজ শক্তির চাপেই বিপ্লব সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিক যে সব গণ উত্থান হয়েছে ও চলছে, আফ্রিকায় ও মধ্য প্রাচ্যে, তার মূলে আছে হয় গঠনমূলক সমাজতন্ত্র, নয় সংগ্রামশীল বিপ্লবী সাম্যবাদের প্রভাব। সম-অধিকার ও সম বণ্টন, এই দুটি আদর্শ জয়ী হয়েছে ঔপনিবেশিক নীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে। বর্তমানে সব আন্দোলনেই দেখা যায় সমাজতন্ত্রী গণ-শক্তির দাবি কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন উনিশ-বিশ শতকে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের ফলে যে সব আন্দোলন ও মতবাদের উৎপত্তি ও প্রসার হয় তাদের গতি প্রকৃতি বোঝার জন্য এই ছকটি দেওয়া হল :



এক নজরে

* ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে সামরিক নায়কদের হাতে শাসন ক্ষমতা এলে আভ্যন্তরীন যোগাযোগ বাড়তে থাকে।
* ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল কুয়োমিনটাঙ দক্ষিণ-চীনে ক্যান্টান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে।
* ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সাংহাইতে আনুষ্ঠানিক ভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। কুয়োমিনটাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টি উভয়েই মিলিতভাবে সমর নেতাদের কবল থেকে চীনদেশকে মুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিল।
* চিয়াং কাইশেকের আমলে এই সমঝোতা ভেঙে যায় এবং তিনি কমিউনিস্ট দলন নীতি গ্রহণ করেন।
* কুয়োমিনটাঙ-কমিউনিস্ট বিরোধে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টরা জয়ী হয়েছিল। কমিউনিস্টরা চীনদেশের মূল ভূ-খণ্ডের সবটা দখল করে নিয়েছিল।
* ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা হয়। জমিদারী প্রথা ও ব্যক্তিগত স্বত্ব লোপ পেল। শিল্প ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হলো।
* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয় আন্দোলনের নেতা ছিলেন হো-চি-মিন। তার নেতৃত্বে ইন্দোচীনে ভিয়েতনাম নামে স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রহ্মদেশে গণ দলের নেতা ছিলেন উ নু। কমিউনিস্ট নেতৃত্বে মালয়বাসীরা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। জাতীয়তাবাদী নেতা সোয়েকর্ণের নেতৃত্বে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।
* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ গঠিত হয়। এর নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O.)। এর প্রধান কার্যালয় আমেরিকায় অবস্থিত।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন

* কুয়োমিনটাঙ কি ? * বোরোদিন কে ছিলেন ? তিনি চীনে এসেছিলেন কেন ? * সান ইয়াৎ সেনের তিনটি মূল নীতি কি কি ? * লঙ মার্চ কাকে বলে ? * সান ইয়াৎ সেনের পর কে নেতা হন ? * চিয়াং কাইশেক কে ? * হো-চি-মিন কে ছিলেন ? * ভিয়েৎনামের প্রতিষ্ঠা কি ভাবে হয়েছিল ? * উ নু কে ? * ব্রহ্মদেশ কবে স্বাধীনতা লাভ করে ? * ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১। ১৯১৬ সালে চীনে কি পরিবর্তন হয়? কর্তৃত্ব কাদের হাতে চলে যায়?
২। সান ইয়াৎ সেন কি আদর্শ অনুসরণ করে দেশের ঐক্য সাধনে সচেষ্ট হন?
৩। চীনে কুয়োমিনটাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর?
৪। চীনা কমিউনিস্টরা দীর্ঘ পদযাত্রা করেছিল কেন? এই দীর্ঘ পদাযাত্রার গুরুত্ব কি ছিল?
৫। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।
৬। চিয়াং কাইশেক কিভাবে চীনের মূল ভূখণ্ড হতে বিতাড়িত হয়েছিলেন?
৭। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে কি রকম শাসন ব্যবস্থা চলছিল? সেখানে কোন কোন পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্য ছিল?
৮। হো-চি-মিন কে ছিলেন? স্বাধীন ভিয়েৎনাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান আলোচনা কর।
৯। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। মালয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।
১১। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র গঠনে সুকর্ণের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
১২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়? এই সংস্থার মূল নীতিগুলি কি কি?
১৩। আটলাণ্টিক চার্টার কারা কখন ঘোষণা করেন? এই সনদের কয়েকটি শর্ত উল্লেখ কর।

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। কুয়োমিনটাঙ এর অর্থ কি? এদলের নেতা কে ছিলেন? এই দলের নীতিগুলি বিশ্লেষণ কর।
২। চীনে ৪ঠা মে-র আন্দোলন সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩। চিয়াং কাইশেক কিভাবে কমিউনিস্টদের দমন করেছিলেন।
৪। এসিয় দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শুদ্ধ উত্তরের উপর ✓ চিহ্ন দাও ঃ

(ক) ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে (সান ইয়াৎ সেন / চিয়াং কাইশেক) চীনের স্থায়ী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলেন।
(খ) ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর (মাও সে তুং / চু এন লাই) চীনে জনসাধারণের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করলেন।
(গ) চিয়াং কাইশেক (তাইওয়ান দ্বীপ / ক্যাণ্টনে) আশ্রয় গ্রহণ করলে মূল চীন দেশের ঐক্য সম্পন্ন হলো।
(ঘ) (হো চি মিন / বাও দাই)-এর নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

মানচিত্র অনুশীলন

[এক] প্রদত্ত রেখা মানচিত্রে চীন সাধারণতন্ত্রের নিম্নলিখিত স্থানগুলি বসাও ঃ উরুমচি, সচৌ, কাশগড়, খোটান, তিব্বত, লাসা, চুংকিং, নানকিং, পিকিং, মাঞ্চুরিয়া, ক্যান্টন, মিকিয়াং, ল্যাংচো]

